সুকান্তের জীবন ও কাব্য

ডঃ সরোজমোহন মিত্র



ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
মে ১৯৯০

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

ছোটগল্পের বিচিত্র কথা (৩য় পরিমার্জিত সংস্করণ)
মানিক ব্যন্দাপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ)
শরৎ সাহিত্যে সমাজসচেতনা (২য় সংস্করণ)
একাঙ্ক নাঠকের রূপরীতি
বাংলা থিয়েটারে শিশিরকুমার
চলমান চীন (২য় সংস্করণ)
রবীন্দ্রনাথ ও চীন
Manik Bandyopadhay (সাহিত্য আকাদমী প্রকাশিত)
(ভারতীয় প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত)
হিমালয়ের পথে প্রান্তে

অনূদিত গ্রন্থ

ছয় নম্বর ওয়ার্ড (চেকফ)

ছোটদের জন্য

অমব জীবন
জীবনের জয়গান

ভূমিকা

বাংলার বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। তারপর চার বছরের মাথায় আরেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি সংস্করণই প্রকাশ করেছিল গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ। এবার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে সুকান্তের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর উপলক্ষে। বর্তমানে প্রকাশনার শিরোনামে যে দে'জ প্রতিষ্ঠান তারা এই নতুন প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন।

সুকান্ত সম্পর্কে সকলেরই আগ্রহ। এই বিপ্লবী কবি বাংলায় খুবই জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের পরেই তাঁর স্থান। বাংলায় অনেক বড়ো বড়ো বিদগ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। এখনো অনেক খ্যাতিমান কবি আছেন। সুকান্তের খ্যাতি অন্যত্র। তিনি একজন বিপ্লবী কবি, একটা যুগের প্রতিভূ। প্রাক্‌-স্বাধীনতা চল্লিশের দশককে যদি ঠিকভাবে জানতে হয় তাহলে সুকান্তের জীবন ও কাব্যকে জানতেই হবে।

সাহিত্য যে ইতিহাসের কত বড় উপাদান তার পরিচয় আমরা পাই মধ্যযুগের বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবৎ কিংবা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল থেকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাদ দিয়ে আদি এবং মধ্যযুগের বাংলার পরিচয় জানা সম্ভব নয়। তেমনি কুড়ির দশকে বিদ্রোহী কবি নজরুলের কাব্য এবং চল্লিশের দশকে সুকান্তের কাব্য ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান।

সেজন্য সুকান্ত কেবলমাত্র একজন কবি নন। অবশ্য কবি হিসেবে সুকান্তকে নিয়ে একসময়ে খুব বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কের উৎসে ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "কবি হবার জন্যই জন্মেছিল সুকান্ত, কবি হতে পারার আগে তার মৃত্যু হলো।" এই আক্ষেপের কারণ সুকান্ত 'রাজনৈতিক পদ্য' নিয়ে শক্তির অপচয় করেছে। তিনি লিখেছেন, "তার কবিতা পড়ে মোটের ওপর এ কথাই মনে হয় যে তার কিশোর হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে-পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ।" বুদ্ধদেববাবুর হয়তো সুকান্তর কিছু কবিতার সঙ্গে পরিচয় ছিল। সুকান্তের জীবনকে তিনি সামগ্রিকভাবে জানতেন না। জানলে হয়ত এইরকম উক্তি তিনি করতেন না।

এই গ্রন্থ যারা পড়েছেন এবং পড়বেন তারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে সময়ে যে পরিবেশে তার কিশোর হৃদয়ের উন্মোচন হয়েছিল তাতে তার ব্যক্তিজীবনে কোন 'দাঙ্গা' বাধেনি। বরং সেই যুগ এবং পরিবেশ তার কিশোর হৃদয়কে উন্মোচিত করতে, অনুপ্রাণিত

করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। মাছ যেমন জলেব মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে সুকান্তও তেমনি সেই যুগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছিল। সেজন্য তার কবিতায় আছে সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ।

দ্বিতীয়ত বুদ্ধদেব বসু যাকে "সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ" বলেছেন তার নাম মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদ হল আমাদের এই পৃথিবী এবং পৃথিবীরই এক অংশ মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস অনেক অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতো সামাজিক পরিবর্তনও কতগুলো নিয়ম অনুসারে ঘটে থাকে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এই তত্ত্ব ধর্মবিশ্বাস, জাতি, বীরপূজা, ব্যক্তি বিশেষের অভিরুচি বা আকাশকুসুমের স্বপ্ন ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের মধ্যে যে-সব অস্পষ্ট ধাবণা প্রচলিত আছে তার বিরোধী। এই তত্ত্বের ভিত্তি হল ইতিহাসের ঘটনা এবং আমাদের চতুর্দিকের এই পৃথিবীর তথ্যের উপাদান। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যত বাড়তে থাকে ততই মার্ক্সবাদের ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হয়। নতুন যে সব তথ্য জ্ঞানের গোচরে আসে মার্ক্সবাদের আলোকে সেই তথ্য বিচার করা হয়। মার্ক্সবাদ কোন আপ্তবাক্য নয়, এটা একটা বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তার দ্বারা আমরা বাইরের পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে পারি। তেমনি সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে আমরা যে-জ্ঞান লাভ করি তার সাহায্যে সমাজকে ভেঙে নতুনভাবে গড়তে পারা যায়। মানুষ ও জড় পদার্থ সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সাধারণ নিয়মগুলোর সমষ্টি নিয়েই মার্ক্সবাদী দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। মার্ক্স বলেছেন, "দার্শনিকেরা এ পর্যন্ত শুধু বিভিন্নভাবে বিশ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে, কিন্তু আসলে দরকার বিশ্বকে পরিবর্তিত করা।" মার্ক্সের কাছে এটাই তাঁর বিশ্বদৃষ্টির গোড়ার কথা। মার্ক্সবাদ কোন পুঁথিগত বিজ্ঞান নয়, বিশ্বকে পরিবর্তিত করার কাজে মানুষের হাতে বড় অস্ত্র। (এমিল বার্ণসের 'মার্ক্সবাদ' গ্রন্থ অনুসরণে)।

মার্ক্সবাদের এই বৈজ্ঞানিক মতবাদকে বুদ্ধদেব বসু 'তথাকথিত' বলে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন এবং তাকে 'সংকীর্ণ' মতবাদ বলে অভিহিত করে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর সীমাবদ্ধ জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন। এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর ভিত্তি করেই সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মেহনতী মানুষ বিশ্বকে পরিবর্তন করে এক শোষণমুক্ত সমাজগড়ার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে আছেন। সুকান্ত এই মতবাদকে শুধু স্বীকার করেনি, তাকে আত্মস্থ করে এক নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে ও সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেছেন।

সুকান্তের কাছে এই বিপ্লবী সত্তাই প্রধান। তাকে উপলব্ধি করতে না পারলে সুকান্তের কাব্যকৃতিকেও ঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন, "সাহিত্য গড়িয়া উঠে যুগধর্মে।" সুকান্তের যুগকে বাদ দিয়ে সুকান্তকে যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রামের মধ্যে জড়িয়ে না পড়লে সেই সংগ্রামের সমস্যা নিয়ে লেখা কঠিন। একথা সকলেই জানেন যে, জীবনের গভীরতম আবেগের মধ্য দিয়েই মানুষ অত্যন্ত

দ্রুত পদক্ষেপে রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে যায়। "লেনিন বলেছেন মানুষ তাদের নিজেদের রক্তমাংসেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যে বিপ্লবী কর্মী নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকে সুস্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হবার জন্যেও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই জীবনের মধ্যে সক্রিয়, তাঁর কাছে রাজনীতির মূল সমস্যাগুলো কোনক্রমেই নীরস আর শিল্প রচনার বিরোধী হিসেবে উপস্থিত হতে পারে না।" তিনি নিজে জীবনের সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যেও পৃথিবীর ঘটমান বিরাট বিরাট ঘটনার ঘনীভূত প্রতিচ্ছবির আবেগকে অনুভব করেন।

সুকান্তের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলো সত্য। তিনি তাঁর জীবনের গভীরতম আবেগের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর সংগ্রামের অগ্রগামী মানুষদের দৈনন্দিন সান্নিধ্যে এসে তিনি এমন সব বিশেষত্ব এবং লেখার উপকরণ পেলেন যেগুলো নিয়ে অনুশীলন করার ফলে তিনি তার সৃষ্টির কাজে তীব্র প্রেরণা পেয়েছিলেন। মাও সে তুঙ বলেছিলেন, "বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের লক্ষ্য হবে শুধু পরদেশ আক্রমণকারীদের, শোষক ও উৎপীড়নকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা, জনসাধারণের নয়। জনসাধারণের নিজস্ব ত্রুটি বিচ্যুতি আছে খুব স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু এ ত্রুটি প্রধানত তাদের অত্যাচারীদের শাসনেরই ফল স্বরূপ।" এই বিচারে সুকান্ত যথার্থই ছিলেন বিপ্লবী কবি।

বুদ্ধদেব বসু আরেকটি কথা লিখেছিলেন, "কবি হবার জন্যই জন্মেছিল সুকান্ত, কবি হতে পারার আগেই তার মৃত্যু হলো।" সুকান্ত কবি হতে পেরেছে কি না কিংবা কতটা কবি হয়েছে এই বিতর্কের কোন শেষ নেই। বুদ্ধদেব বসুরই সমকালীন কবি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন, "সুকান্তর কবিতা চার-পাঁচ বছর আগে হাতে আসে, হাতে-লেখা তিনটি কবিতা, পরিষ্কার পরিণত হাতের লেখা। আশ্চর্য হয়েছিলুম সুকান্তর কবি প্রতিভা প্রকাশিত হলো প্রতিশ্রুতিতে নয়। একেবারে পরিণতিতে ; তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার কবিতা পড়েছি। অক্লান্ত কর্মীর আত্মত্যাগের অবসরহীন মানস কিন্তু সুলিখিত কবিতা। একাধারে তার এই পরিণত কবিত্ব এবং মার্ক্সসিস্ট তত্ত্বের জনগাম্ভীর্য বারবার বিস্মিত করেছে – ভেবেছি এ ছেলেটি প্রৌঢ়ত্বে আর কি লিখবে, এর বিস্ময়কর প্রতিভার কি বিকাশ সম্ভব?" (স্বাধীনতা ১৮ মে, ১৯৪৭) বিষ্ণু দে সুকান্তকে অভিহিত করেছেন 'অসামান্য কবি' বলে। বিষ্ণু দে'র মন্তব্যের পরে সুকান্তের কবিত্ব সম্পর্কে আর কোন অভিমত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

অনেকের কাছে কবির রচনাগুণের বিচার হয় তার আঙ্গিক বা রূপরীতি দিয়ে। কোন মার্ক্সবাদী কেবলমাত্র রূপরীতি দিয়ে কোন শিল্পকর্মের বিচার করেন না। তারা জানেন, "রচনাগুণ জিনিসটা শুধু রূপরীতির (ফর্ম) ব্যাপার নয়, প্রথমত সেটা বিষয়বস্তুরই (কনটেন্ট) ব্যাপার ; এবং ফর্মের গুণটা শুধু কারুকুশলতার ব্যাপার নয়, বিষয়বস্তু আর তার প্রতি শিল্পীর প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল।" সুকান্তের কাব্যে বিষয়বস্তুই প্রধান কথা। কী লিখতে চাই এবং কেন লিখবো সেটাই ছিল মূল লক্ষ্য তারপর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে কেমন করে লিখব। কেমন করে লিখলে জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগানো যায় তেমন করেই সুকান্ত লিখেছেন। নিজের কবি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুকান্ত বলেছেন, "কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা

ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।" এই কারণেই সুকান্ত লিখতে পেরেছিলেন, "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।"

সুকান্তের জীবন ও কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে এই সত্যকেই বড় বলে গণ্য করা হয়েছে। কুড়ি বছর আগে প্রথম রচিত এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক সাধারণের কাছে আদৃত হয়েছে। সুকান্ত সম্পর্কে পরে আবও কিছু গ্রন্থ এবং কিছু স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে। সেগুলোও মূল্যবান। তবে সামগ্রিকভাবে সুকান্তের জীবন ও কাব্য সম্পর্কে পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থের সমাদর আমাকে আরও উৎসাহিত করেছে। সেজন্য প্রতি সংস্করণেই চেষ্টা করেছি গ্রন্থটিকে আরো পরিমার্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত করতে। যাতে এই গ্রন্থটি সুকান্তের কাব্য পাঠের আকর গ্রন্থ হিসেবে উপযুক্ততা লাভ করতে পারে সেদিকে বিশেষ যত্নবান হয়েছি। এ কাজে সুকান্ত সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তদগতভাবে আলোচনা করে গ্রন্থটিকে যতটা সম্ভব বস্তুনিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টার ক্রটি করিনি। তা সত্ত্বেও যদি কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকে তার দায় নিঃসন্দেহে লেখকের।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যে কথা বলা হয়েছে এতদিন পরেও সেই কথা নিবেদন কবে উপসংহার করছি। "বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতি তাকে আরো সংকটজনক করে তুলেছে। সকলেই উপলব্ধি করছেন যে, প্রচলিত সমাজ-কাঠামো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল হযে পড়েছে। চারদিকে বিক্ষোভ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এই সংকটে সুকান্তের কবিতাই বিক্ষুব্ধ মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে।" 'সুকান্তের জীবন ও কাব্যে'র এই নতুন সংস্করণ বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী মানুষের সংগ্রামে সাথী হোক এটাই একান্ত কামনা।

এই সংস্করণ প্রকাশে প্রকাশক, মুদ্রক এবং অনেক শুভার্থীর সহযোগিতা লাভ করেছি। তাঁদের সকলেব প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ইতি—
সরোজমোহন মিত্র

প্রথম অধ্যায়
সুকান্তের যুগ ও জীবন

কবিকে পাওয়া যায় তার কাব্যের মধ্যেই। কিন্তু কবি-মানসকে উপলব্ধি করতে তার যুগকেই স্মরণ করতে হয়। কারণ মাটির রস নিঙড়ে গাছ যেমন আকাশমুখী হয়ে ওঠে তেমনি শিল্পসৃষ্টিও যুগের হয়েও যুগাতিশায়ী হয়। মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য বর্তমানে দুটি প্রতিষ্ঠিত নাম। উপন্যাসে ও কাব্যে কেবল রীতিবদল নয় যুগান্তকারী সৃষ্টির জন্য আজ যারা দিগদর্শক তাদের সামগ্রিক উপলব্ধির জন্য তাদের যুগকে উপলব্ধি করতেই হবে।

বর্তমান প্রসঙ্গ সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে। ছোট্ট একটু জীবন পরিধি, একুশের পূর্ণতাও যার হয়নি সেই সুকান্ত ভট্টাচার্যকে আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না। বাঙলা সাহিত্যসৃষ্টির নবদিগন্তের যারা পথিক তাদের কাছে এ কম গৌরবের নয়।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৩৩ সালের ৩০ শে শ্রাবণ। ১৯২৬ সালের ১৬ই আগষ্ট। "মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কালীঘাট অঞ্চলের ৪২ নং মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুকান্ত।"

'সুকান্ত' নামকরণেরও একটু ইতিহাস আছে। বিশ দশকে বাংলাদেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক 'রমলা'-রচনাকার মনীন্দ্রলাল বসুর 'সুকান্ত' নামক গল্পটি ছিল তরুণদের কাছে খুব প্রিয়। এই গল্পের নায়কের নামানুসারেই জ্যাঠতুতো দিদি রানী খুল্লতাত শিশুটির নাম রেখেছিলেন 'সুকান্ত'।

কলকাতার বুকে সে বছর এপ্রিল মাস থেকে যে ধিকি ধিকি হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছিল তা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আহ্বান তখন সারা বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল:

"দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।"

প্রথম মহাযুদ্ধের রাত্রির তপস্যা দিকে দিকে উষার অরুণোদয় ছড়িয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ চারবছর ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী এই ধ্বংসকাণ্ডের পর পৃথিবীর বহু দেশে শোষণ-মুক্তির তীব্র সংগ্রাম সাফল্যলাভ করেছিল। ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই সংগ্রামে প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকার কাজ করেছিল। যুদ্ধশেষে ইওরোপের বহুদেশে ওলটপালট ঘটল। যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান গণঅভ্যুত্থান সমসাময়িক পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ আলোড়নের এক প্রতিচ্ছবি। অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনে যা তুঙ্গসীমায় উপনীত হয়েছিল। দীর্ঘলালিত এক সামগ্রিক প্রচেষ্টার হঠাৎ যবনিকা ঘটলে তার নানা প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য।

চৌরীচৌরার এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন উদ্বেলিত মানুষের সুদীর্ঘ লালিত সেই শোষণমুক্তির স্বপ্ন হঠাৎ ব্যর্থ হয়ে গেল তখন আশাভঙ্গের যন্ত্রণা নানা অন্ধকার পথে চালিত হোল।

ধর্মীয় আবরণেও বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।" সে কথাই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হোল অসহযোগের পরের বছরগুলোতে। গান্ধীজি কারারুদ্ধ হলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হোল। চারিদিকে হাতাশা নেমে এল। প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় যুবমনে সন্ত্রাসবাদ নতুন করে চাড়া দিল। কংগ্রেসের শক্তি সভ্যসংখ্যার দিক দিয়ে অসম্ভব হ্রাস পেল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সুকৌশলে এই সুযোগে একটা বিপ্লবী জনতাকে আত্মঘাতী কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও একটা আশার আলো দেখা দিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদেব ঢেউ এদেশের মেহনতী মানুষের বুকেও আলোড়ন তুলল। সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারিত হোল। ভীত সন্ত্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে এদেশে সোভিয়েত তথা সমাজতন্ত্রবিরোধী নানা কুৎসা ছড়াতে লাগল। অন্যদিকে কানপুর এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করল। কিন্তু জনতাকে কোন মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে বেশিদিন ধোঁকা দেওয়া যায় না। এদেশের মানুষ আবার জেগে উঠল। ১৯২৯ সালের লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হোল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ-বত্রিশ সালের ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল। গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারল না। তার পূর্বেই বিখ্যাত চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়ে সেখানে স্বাধীন পতাকা উড্ডীন হোল (১৮ই এপ্রিল,১৯৩০)। বোম্বাইযের শোলাপুরের শ্রমিকরা কিছুদিন শহর দখল করে নিল(মে, ১৯৩০)। সীমান্তের পেশাওয়ারে গাড়োওয়াল রাইফেলসের হিন্দু সিপাহিরা নিরস্ত্র মুসলমান জনতার ওপর গুলি চালাবার হুকুম অমান্য করে (২৫ এপ্রিল, ১৯৩০) নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল।

সময়টা ছিল খুবই অনুকূল। কারণ তখন বিশ্বব্যাপী চলেছিল এক বিরাট মন্দা। সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদ তখন অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তবু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এলো না। গান্ধী-আরউইন চুক্তি, গোল-টেবিল বৈঠক করেও যখন সংগ্রামী মানুষের মেজাজকে ঠাণ্ডা করা গেল না তখন মরীয়া হয়ে ইংরেজ সরকার মারণযন্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। লক্ষাধিক লোক গ্রেপ্তার হোল। এবারও আন্দোলন যখন একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন গান্ধীজি হঠাৎ রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন। কাণ্ডারী মাঝপথে হাল ছেড়ে দিলে তরণীর নিমজ্জন প্রতিরোধ করবে কে?

অন্যদিকে বিশ্বমঞ্চে চরম অর্থনৈতিক সংকটের আর্বত থেকে আত্মরক্ষা করতে পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে ঝুঁকে পড়ল অনিবার্য ফ্যাসিবাদের দিকে। শুরু হয়ে গেল চীনের উপর জাপানের নির্লজ্জ যুদ্ধঘোষণা এবং জার্মানীতে হিটলারের মতলববাজি। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখক— আইনস্টাইন, টমাসম্যান, আর্নেস্টজিগ, বার্টলট ব্রেখট প্রমুখরা দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। জার্মানীর রাস্তায় রাস্তায় চলল নানা গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব। দীর্ঘদিনের সভ্যতার অবদান ভস্ম হয়ে গেল; রইল কেবল উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা।

মহিম হালদার স্ট্রীটের শিশুটি ততদিনে কিছুটা বড় হয়েছে।

বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র চেষ্টা কোনোমতে টিকে থাকা। এই আত্মরক্ষার সংগ্রামে সুকান্তের জ্যাঠামশাই পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ নিজ চেষ্টায় ফরিদপুরের একটি গ্রামীণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারকে কলকাতা মহানগীরতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উপাধিতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে সুকান্তের জ্যাঠামশাই ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত। সুকান্তের পিতা নিবারণ চন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন হয়ে গ্রামে মায়ের কাছে মানুষ হয়ে যজমান পণ্ডিতের বেশি শিক্ষাদীক্ষা করতে পারেন নি। যজনযাজন এবং পুজোর ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মানুষ। স্বল্পভাষী অথচ পরিশ্রমী এবং সাহসী ছিলেন। সঙ্গীত নাটকে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তার মন ছিল কোমল ও স্নেহশীল কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ছিলেন খুব দৃঢ়। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি মহিম হালদার স্ট্রীটের সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের তৃতীয় কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। সুনীতি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। আত্মাভিমানী এবং তেজী। লেখাপড়ায় তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত গল্প উপন্যাস পড়তেন। অগ্রজের চেষ্টায় নিবারণচন্দ্র কলকাতায় এসে পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

"সুকান্তর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বাবা ও জেঠামশায়ের একান্নবর্তী পরিবারটির অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। এ সময় বই-এর প্রকাশনীটির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, তাছাড়া জেঠামশাই ও বাবার যজমানী আর পণ্ডিতবিদায় তখনকার দিনে নগণ্য ছিল না।

"সে সময় তাঁরা বাগবাজারে নিবেদিতা লেনের একটি দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। বিরাট বাড়িতে লোকজন ছিল যথেষ্ট। কেননা দেশের চেনাজানা মানুষের শহরে প্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে এসে এখানেই উঠতেন প্রথমে। আর সামাজিকতায় উৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র ও নিবারণচন্দ্র তাঁদের সর্বদাই সাদরে গ্রহণ করতেন। তাই বাড়িটা থাকতো সরগরম। এই বাড়িতে শিশু সুকান্তের দিন কেটেছে কখনও ঠাকুমার ঘরে কখনও বা রানীদির কোলে। রানীদি ছিলেন সুকান্তর জেঠতুত বোন আর বাড়ির একমাত্র কিশোরী। তাঁর কাছেই মনে হয় কবিতার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন শিশু সুকান্ত। রানীদির কণ্ঠস্থ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি। শিশু সুকান্তকে কোলে করে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করার ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। তখন হয়তো এসব কবিতা শিশুমনে কাব্যের বীজ বুনেছিল। তাছাড়া সুকান্তর মা সুনীতিদেবীও রামায়ণ মহাভারত পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। অবসর সময় কাশীরাম আর কৃত্তিবাস ছিল তাঁর সঙ্গী। তাই বাংলার প্রায় সকল কবির প্রেরণা সেই রামায়ণ মহাভারত কবি সুকান্তরও কাব্য প্রতিভার উৎস হওয়া অসম্ভব নয়।" (সুকান্তর শুরু— অশোক ভট্টাচার্য)।

সুকান্ত-ভ্রাতার এই বিবরণী প্রায় সকল নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। চেহারার মধ্যেও এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যা আর দশজনের থেকে আলাদা কিছু দাবী করতে পারে। "শ্যামবর্ণের দোহারা গড়নের মাঝারি সাইজের মানুষ। মাথায় ছিল একরাশ ঘন চুল— যেন তারই ভারে মাথাটা ঝুঁকে পড়তো সামনের দিকে। পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট—তার আবার হাত দুটো থাকতো কনুই পর্যন্ত গোটানো। কাপড়ের কোঁচাটা বাঁ হাতে ধরে, অথবা মালকোঁচা দিয়ে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে হেঁটে চলা ছিল তাঁর অভ্যাস।"

সুকান্তর যখন শৈশবকাল, তখন তার বাবা আর জ্যাঠামশাই একসঙ্গে বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনে একটি দু'তলা মাঠকোঠায় বাস করতেন। ওঁদের একটি টোল আর একটি বইয়ের দোকান ছিলো। সুকান্তর জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ওই টোলটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর বইয়ের দোকানটি দেখাশোনা করার ভার ছিলো ওর বাবা নিবারণচন্দ্রের ওপর।

সুকান্ত ছিল তার পিতামাতাব দ্বিতীয় সন্তান। সুকান্তরা ছিল ছয় ভাই : সুশীল, সুকান্ত, প্রশান্ত, বিভাস, অশোক এবং অমিয়। সুকান্তর বয়স যখন মাত্র ছ'বছর তখন বাংলা ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে সুকান্তর একমাত্র বৈমাত্রেয় বড় দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের বিবাহ হয়। সুকান্ত তখন ছিল খুব কালো আর রোগা। তবু বাড়ির সকলের আদরের ছিল সে। মনোমোহন বাবুর স্ত্রী সরযূ দেবীও তাকে খুব আদর করতেন। তিনি বলেন সুকান্তর সেই শৈশবকালে পড়াশোনায় সুকান্তকে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই সুকান্তকে অক্ষর পরিচয় করান। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বইটা আনিয়ে তিনি সুকান্তকে ছড়া পড়াতেন আর সুকান্ত সেই সব ছড়া শুনে শুনেই মুখস্ত করে নিতো। তারপর তা শোনাতো বাড়ির সকলকে।

এমনি করে সুকান্ত মানুষ হয়ে উঠলো এক যৌথ পরিবারে যেখানে একদিকে ছিল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চা অন্যদিকে অতি স্বাভাবিকভাবে যুগের হাওয়ায় নবযুগেব সাড়া। রানীদির মাধ্যমে রবীন্দ্রকাব্যশ্রুতি আর দূর সম্পর্কের কাকা সরোজ ভট্টাচার্য এবং জেঠতুত দাদা গোপালচন্দ্র ও রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মাধ্যমে আধুনিকতার নাড়া। বাংলা সাহিত্যে তখন কল্লোল-কালিকলম প্রগতির যুগ। সে এক প্রচণ্ড আধুনিকতা। তার মধ্যে ভাঙনের নেশাটাই বড়। ফলে বাস্তবতার নামে সৃষ্টি হোল এক ধরনের মধ্যবিত্ত ভাববিলাস।

এমনি এক অত্যন্ত পরিচিত পরিবেশে সাধারণ দু-পাঁচটা মধ্যবিত্ত ছেলেরই মতো হয়ে উঠেছিলেন সুকান্ত। তারপর সেই স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন পাড়াব মাস্টারমশাই অহীনবাবু সুকান্ত আর তার ছোট ভাইটিকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন স্থানীয় কমলা বিদ্যামন্দিরে। সহপাঠী শৈলেন সরকারের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় প্রথম থেকেই সুকান্ত ছিল ভালো ছাত্র, মনোযোগী এবং মেধাবী। লাজুক, আপাত-স্বল্পবাক ছেলেটিকে সহজেই নজরে পড়তো তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার জন্য। বাংলা ভালো জানত এবং লিখত বলে স্কুলেও তার সুখ্যাতি ছিল। বয়সের তুলনায় তার লেখাপড়া ছিল অনেক বেশী। এই স্কুলেই প্রথম 'সঞ্চয়' নামে একটা হাতে লেখা পত্রিকা সুকান্ত বের করেছিলেন। যার প্রথম রচনাটি ছিল সুকান্তর লেখা একটি সুন্দর হাসির গল্প। তাছাড়া এই স্কুলেই 'ধ্রুব' নাটকে নাম ভূমিকায় সুকান্ত অভিনয় করেছিলেন।

সুকান্তের বৌদি সরযূদেবী অবশ্য লিখেছেন, "শৈশবকাল থেকেই স্কুলের প্রতি সুকান্তর একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠে ছিলো। বিশেষ করে স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা আর মাস্টারদের অত্যধিক শাসনের ওপর। টিফিনের পর বাড়ি এলে প্রায়ই সে আর স্কুলে যেতো না।" সুকান্ত ইতিহাসে বড্ড কাঁচা ছিলো। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যও লিখেছেন "আর পাঁচজনের মত স্কুলের পড়ায় ওর তেমন মন ছিল না। স্বাভাবতই অভিভাবকরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।" (সুকান্ত বিচিত্রা)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই সুকান্তর জীবনে এবং তাদের পরিবারেও একটা বড় আঘাত এল। সুকান্তর যখন সাত-আট বছর বয়স তখন তার রানীদির অকস্মাৎ মৃত্যু হোল।

এই আঘাত সুকান্তর কৈশোর মনে প্রচণ্ডভাবেই লাগা স্বাভাবিক। তাদের বাড়ির স্বাভাবিক পরিবেশও নষ্ট হয়ে গেল। সুকান্তর জ্যাঠামশায়রা চলে গেলেন উত্তরপাড়ায় আর সুকান্তর বাবা তাঁর পরিবার নিয়ে গিয়ে উঠলেন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এক ভাড়া বাড়িতে। মাস ছয় পরে সকলে আবার বেলাঘাটায় ফিরে এলেও তাদের যৌথ পরিবার আর জোড়া লাগল না।

১৯৩৫ সালে সুকান্তর বাড়ির সকলে গেল সাঁওতাল পরগণার জসিডিতে হাওয়া বদল করতে। সুকান্তও গেল তাদের সঙ্গে। এই ভ্রমণ সুকান্তর জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এখানেই জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য আবিষ্কার করলেন সুকান্তর প্রথম কবিতা— সুকান্তর খাতার পাতায় লেখা : যা সুকান্তকে বড়দের মহলে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তবে এটি তার প্রথম কবিতা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রমা রাণী দুই বোন, পরীর মতন,
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।
দুই বোন রমা রাণী—
সবে করে কানাকানি,
দুই বোন হবে ভালো,
করিবে যে ঘর আলো,
সীতার মতন।

রমা মনোজবাবুর মামাতো বোন আর রানী তারই দিদি যিনি তিন-চার বছর পূর্বে মারা গিয়েছেন। এই কবিতার মধ্যেই সুকান্তর স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি, শব্দচয়ন এবং ছন্দোজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সুকান্ত মুগ্ধ। তার বর্ণনায় সুকান্তর যে লিপিকুশলতা, কল্পনার বিস্তার এবং প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তা সুকান্তের বয়সের তুলনায় অনেক বেশী :

"সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, ধারোয়ার বুকে তারই কালো ছায়া। নিমন্ত্রিতের মতো নিঃশব্দে প্রতিটি নক্ষত্র জড়ো হল আকাশের আসরে। কোন্ এক অদৃশ্য কোণ থেকে বকেরা উড়ে এল, মিলিয়ে গেল পিছনে, কিছুক্ষণ আকাশকে আলোড়িত করে। তৃতীয়ার তন্বী চাঁদের আলো নদীর ধারের বালিতে লুটিয়ে পড়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রতিটি বালুকণাকে। সেই চাঁদের আলো নিজের দেহে কুড়িয়ে নিয়ে অনেকে বসে গল্প করছে ; তাদের কথালাপে, উন্মুক্ত হাসিতে ধারোয়া-তীর গুঞ্জনে মুখরিত। কিন্তু নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি কথার ফাঁকে-ফাঁকে। কারো হঠাৎ-গাওয়া গানের কলিতে চমকে ওঠে না সেখানকার সমাধি গম্ভীর নিসর্গ, দূর থেকে ভেসে-আসা তরুণীর কলহাস্যে সাড়া দেয় না এই তপস্যামগ্ন পারিপার্শ্ব।"

রানীদির মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই আরেকটা কঠিন আঘাত এল সুকান্তর জীবনে। সুকান্তর মাতা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রাথমিকভাবে তার দাদামশায় মা ও ছেলেদের নিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত তার মাকে মধুপুর নিয়ে যেতে হোল হাওয়া বদল করাতে। প্রথম দফায় একটু সুস্থ হয়ে ওঠায় ফিরে এলেও আবার কিছুদিনের জন্য তাকে মধুপুর নিয়ে যেতে হোল। সেখানেই তিনি দুরন্ত ক্যানসার রোগে মারা গেলেন (১৯৩৭)। সুকান্ত তখন ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত বলে মায়ের মৃত্যু দেখাও তার হোল না। অতি অল্প বয়সেই শেষ হয়ে

গেল স্নেহ মমতার দুটি আশ্রয়। মায়ের মৃত্যুর এক বছর পরেই সুকান্তর সবচেয়ে বড় জ্যাঠতুতো দাদা গোপাল ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়। একের পর এক মৃত্যুতে হতাশা, বিষাদ আর পুরানো দিনের স্মৃতি তখন কিশোরের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

সুকান্ত-অনুজ অশোক ভট্টাচার্য সেই সময়কার সুকান্তর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, "ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরবর্তী দিনগুলির নির্জন অবসরে সুকান্তর মন হঠাৎই যেন দ্রুত পরিণতির দিকে ছুটে চললো। সে মনের যথাযথ প্রকাশ ঘটতে থাকলো তাঁর রচনায় ; দিনে দিনে গদ্যে-পদ্যে ভরে উঠলো একটা বাঁধানো খাতার পাতা। বেদনা আর বিধুরতায় দ্রব হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে তাঁরা লেখা শৈশব থেকে উত্তীর্ণ হল কৈশোরের স্বভাব সুলভ বিষাদে। মৃত্যুর বিস্তীর্ণ প্রভাবে কবিতা অকালেই হল জীবনের প্রতি হতাশ ঔদাস্যে আচ্ছন্ন।...

"সুকান্তের মন ছিল স্বভাবতই অন্তর্মুখী। দশ এগারো বছর বয়সে ছেলেরা যখন দল বেঁধে হল্লা করে, কিংবা ফুটবলের পিছনে ছুটে শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠে, তখন তাঁর বিচ্ছেদবিধুর নিঃসঙ্গ হৃদয় বাঁধানো খাতাটির পাতায় মুক্তি খুঁজছিল। ভাষা দিয়ে বাঁধতে চাইছিল মনের গভীরতম কেন্দ্রে সদ্যোজাত অর্ধস্ফুট ভাবকে, রূপ দিতে চেষ্টা করছিল সূক্ষ্ম অনুভূতির। সুকান্তর তখনকার মানসিক অবস্থার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে 'রাখালছেলে' নামক একটি রূপক গীতিচিত্রে।" এতে আছে সহজ সরল একটি রাখাল বালকের কাহিনী যার পরিণতিতে আছে মৃত্যু আর বিষাদময়তা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সুকান্ত গিয়ে ভর্তি হলেন বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে। বেদনা বিষাদে আচ্ছন্ন অন্তর্মুখী মন যখন খাতার পাতায় ভাবাবেগ প্রকাশে ব্যস্ত ছিল সেই সময় হাইস্কুলের সাহিত্যপ্রেমিক শিক্ষক এবং সাহিত্য পাগল সহপাঠিদের পেয়ে প্রকাশ্য প্রকাশে মুখর হয়ে উঠল। সুকান্ত তখন "বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে সপ্তমমানের ছাত্র। ক্লাসে বন্ধু পেয়েছেন সাহিত্য-পাগল অরুণাচল বসুকে। অরুণাচলের সহযোগিতায় এবং সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল শিক্ষক নবদ্বীপ দেবনাথের তত্ত্বাবধানে ক্লাসের ছেলেদের ছবি ও লেখা নিয়ে 'সপ্তমিকা' নামে একটা হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন সুকান্ত। পত্রিকাটির সংগঠকও ছিলেন তিনি। তাই তাঁর বাড়িতে আসতেন শিল্পীবন্ধু শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন সরকার এবং আরও অনেকে।" স্বভাবতই সকলে মিলে দারুণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে একদিন সুচারুরূপে অলংকৃত হয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হোল। তার চেয়ে বড় খবর হোল সুকান্তর অন্তর্মুখী ভাবাবেগ যেন স্বীয় প্রকাশ মাধ্যম পেয়ে গেল। এই পত্রিকার জন্য সুকান্ত লিখেছিলেন 'সুকান্ত সমগ্র'-এর অন্তর্গত 'সুচিকিৎসা' ছড়াটি :

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এ সব কি সুচিকিৎসা? —আরে আরে রামঃ।
আমার হাতে পড়লে পরে 'একসরে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা—আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন ত রাখুক।

'ইনজেক্‌শান' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে,
তারপরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন ক'রে।''
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর? ধন্য ডাক্তারী!!

এবং প্রায় একই সময়ে মাসতুতো ভাই এবং বন্ধু ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের হাতে-লেখা পত্রিকা 'নাগরিক'-এর জন্য 'ভবিষ্যতে' ছড়াটি :

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন!
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে,
রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে।
মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন বঞ্চিত
তাদের তরে মুক্তি-সুধা করব সঞ্চিত।
চাষী-মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই,
একস্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই।।
থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়,
ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।
আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর।।

তখন ১৯৪০ সাল। স্বাধীনতার জন্য পরাধীন ভারতের আন্দোলন তখন দুর্বার। স্বাধীনতার জন্য কত মানুষ শহীদ হয়েছে। এই আন্দোলনে প্রয়োজন দীন দরিদ্র চাষী-মজুর সকলের একতা। সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন মনভেদ যেন ঐ আন্দোলনকে দুর্বল না করে। এর সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। সুকান্তের মনে তখন এই আন্দোলন কী প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এখানে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সুকান্ত যে কবি এবং সুকান্ত যে লেখক সেটা আর চাপা রইল না অন্তত আপনজনদের কাছে। এই আপনজন বলতে স্পষ্টতই সহপাঠী সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুরা এবং দাদারা। এ-প্রসঙ্গে সুকান্ত-অনুজ অশোক ভট্টাচার্য অরুণাচল বসুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ''দেশবন্ধু হাইস্কুলে সুকান্তর সব থেকে বড় লাভ অবশ্য অরুণাচল বসুর সঙ্গলাভ। কেননা, বন্ধুদের মধ্যে অরুণাচলই তার কবিজীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর মধ্যে সুকান্ত পেলেন এমন একজন অন্তরঙ্গ সাথীকে যাঁর জীবনে শিল্প ও সাহিত্য কেবলমাত্র সৌখিন আত্মবিনোদনের উপায় মাত্র ছিল না, ছিল আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য মাধ্যম। স্বভাবতই লাজুক সুকান্তর পক্ষে, যিনি তখন পর্যন্ত কবিতা ভিন্ন অন্য সব ক্ষেত্রেই নিজেকে রেখেছে সঙ্কুচিত ক'রে, এহেন সমমর্মীকে সর্বদা নাগালের মধ্যে পাওয়াটা নেহাৎ নগণ্য ঘটনা ছিল না।

অরুণাচলেরা তখন থাকতেন বেলেঘাটার নির্জন এক পল্লীর ফাঁকা মাঠের মধ্যে ঘেরা একটি বাড়িতে। বাড়িটি ছিল মেয়েদের স্কুল। সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন অরুণাচলের মা সরলা দেবী। সরলা দেবী নিজেও ছিলেন একজন লেখিকা। তাই তাঁর কাছে সুকান্তর একটা

বিশেষ আদর ছিল-- তিনি কিশোর কবিকে স্নেহ করতেন মায়ের মতোই। অরুণাচলদের ঐ বাড়িতে বহু নির্জন সন্ধ্যা কাটিয়ে আসতেন সুকান্ত। গল্প করতেন অরুণাচলের মা-বাবার সঙ্গে, শুনতেন তাঁদের ফেলে আসা সুন্দরবনের দিনগুলির কথা, আর প্রায়ই মেতে উঠতেন নানা সাহিত্যিক খেলায়। হয়তো কোন গল্প শুরু করলেন সরলা দেবী, আর সে গল্প শেষ করার ভার দিতেন সুকান্তর ওপর ; কিংবা এমন একটি কবিতা লিখলেন সুকান্ত ও অরুণাচল যার প্রতি দু'চরণের এক-একটি হল এক এক জনের অবদান।''

এমন একটি কবিতার নামকরণ হয়েছিল 'শতাব্দী'। অরুণাচল বসু অনেকদিন পরে তার মাত্র একটি স্তবক স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সে স্তবকটি হলো :

''অরুণাচল : হৃদয়ের উল্লাস ছন্দের বন্ধন মানে না,

সুকান্ত : চম্পক গন্ধের সুরভিত ক্রন্দন আনে না।

অরুণাচল : যৌবন-খঞ্জন উদ্দাম পিঞ্জর ভাঙতে,

সুকান্ত : রক্তের রঙ্গনে উদ্যত বুঝি আজ রাঙতে।

(আর ঐ কবিতায় সুকান্ত লিখেছিলো আর একটি অপূর্ব পংক্তি :

'জ্যোৎস্নার বুকে অমাবস্যার ফুল যেন ফুটলো')

'রক্তের বঙ্গনে উদ্যত বুঝি আজ রাঙতে' — অসুন্দরের বিরুদ্ধে, অসুন্দরকে টিকিয়ে বাখতে চায় যে-শক্তি, তার বিরুদ্ধে, প্রতিবন্ধের মুখোমুখি আরক্ত সংগ্রামে কৃত সংকল্প।''

সুকান্ত কবিতা ছাড়া গল্পও তখন লিখতো। সুকান্তর গল্প লেখার প্রসঙ্গে সরলা বসু লিখেছেন, আমি 'ছটি-ফাগুন-সন্ধ্যা' নামে একটি গল্প লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে দেখালাম। ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। তারপর ওর 'প্রাত্যহিক' ও 'মধুমালতী' গল্প এনে আমাকে দেখালো। 'মধুমালতী' একখানা মলিন কাগজে লেখা ; লেখা কাগজেরও ওর অভাব ছিল। 'মধুমালতী'কে গল্প বলা চলে না ; ছড়া-কাব্য বলতে হয়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার 'ফাগুন সন্ধ্যা'র প্রতিরূপ দেখে। মধু যখন বানের জলে ভেসে যাচ্ছে, মালতী তখন ব্যাকুল হয়ে মধুকে ডাকছে ; মধু স্রোতে ভেসে চলেছে। সেখানে গল্পটি নামের সার্থকতায় পূর্ণ মধুময়। দেখলাম সুকান্তও মধুচক্র রচনা করতে জানে। একমাস তিন দিন স্কুল বাড়িতে ছিলাম। একান্ত কাছে পেয়েছিলাম ওকে। দিনরাত আমার কাছে থাকতো, কতো গল্প কবতাম।''

এই বাড়ির সঙ্গে সুকান্তর যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯৪০ সালের সূচনায় যশোহরের ঠিকানায় বন্ধু অরুণাচলকে লেখা একখানা চিঠিতে। তখনো কিশোর সুকান্তর মনে স্বাভাবিক ভাবালুতাই ছিল প্রবল।

বহির্জগতে তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''যুদ্ধ লাগল স্পেনে :/ চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবান হেনে।'' (চলতি ছবি/সেঁজুতি) আরও স্পষ্ট করে তিনি বললেন :

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন।

(প্রায়শ্চিত্ত/নবজাতক)

অনেকদিন ধরেই এ আয়োজন চলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে একদিকে যেমন দেশে

দেশে বিপ্লবেব ঢেউ দেখা দিয়েছিল তেমনি অন্যদিকে নতুন করে সমর-সজ্জা যুদ্ধবিগ্রহের আয়োজন হচ্ছিল। এর প্রথম প্রকাশ দেখা গেল ইতালিতে। সেখানে একদা 'সমাজবাদী বিপ্লবী' নেতা মুসোলিনী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অর্থাৎ ফ্যাসিস্তদের মুখপাত্ররূপে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির ক্ষমতা দখল করল। ইতালির বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে যখন কমিউনিস্ট উত্থান একপ্রকার নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছিল, সে সময়েই এই বিপরীত কাণ্ড ঘটে গেল। ইতালীর একচেটিয়া ধনপতিরা 'লাল' আতঙ্কে ভীত হয়ে গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মুসোলিনীকে খাড়া করে যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছিল তা সাময়িকভাবে অনেকটা সার্থক হোল। ঘৃণ্য জাতি-বিদ্বেষ এই ফ্যাসিবাদের অন্যতম পুঁজি।

১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি সমভাবেই হিটলার জার্মানী ও বিশ্বের ধনপতি একচেটিয়াবাদের আশীর্বাদ নিয়ে জার্মানীর চান্সেলার হন। ইতালীতে যেমন একচেটিয়া ধনপতিরা বুঝেছিল পার্লামেন্টারী খেলায় আর শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিরোধ করা যাবে না সেজন্য তারা তাদের বহুদিন থেকে লালিতপালিত মুসোলিনীকে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসাল। জার্মানীর শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীকেও মোকাবিলা করার জন্য জার্মান একচেটিয়া ধনপতি এবং প্রাশিয়ার জমিদার জুঙ্কারের দল হিটলারকে খাড়া করল। তা ছাড়া হিটলারের অভ্যুত্থানের কোন বাস্তব ভিৎ ছিল না। টয়েনবি লিখেছেন, মাত্র কয়েকমাস আগে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি হিটলারের কয়েকজন ব্রাউন সার্টকে দেখেছেন পথে ভীত সন্ত্রস্তভাবে তাদের পার্টির চাঁদা তোলার জন্য টিনের কৌটো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পথিকদের কাছে সাড়া পাচ্ছে না। বস্তুতঃ, ১৯৩২-এব জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনের ফল থেকেও ঐ বৎসরের নভেম্বরের নির্বাচনে হিটলারের দলের ফল খারাপ হয়েছিল। কেবল ভন প্যাপেনের শয়তানী চালের ফলেই হিটলারের সিংহাসন লাভ সম্ভব হয়েছিল। আসলে জার্মান শাসকশ্রেণীর অভিপ্রায় পূর্ণ করার উপলক্ষ ছিল ভন প্যাপেন। হিটলার ও নাৎসীরা ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে রাইখস্টাগে আগুন লাগিয়ে, কমিউনিস্টদের ঘাড়ে তার অপবাদ চাপিয়ে সেই রাত থেকেই পর পর কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত কমিউনিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাট ও গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার, নিপীড়ন, গণহত্যা শুরু করে। পার্লামেন্ট শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করে তার বদলে ডিক্টেটারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে (২৩শে মার্চ, ১৯৩৩)।

ইতালি, জার্মানী ও জাপানে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তারা প্রতিবেশী দেশগুলি আক্রমণ করল। জাপান মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে পৃথক করে নিজের আয়ত্তে পূর্বেই এনেছিল, এবার আক্রমণ করল চীন মূল ভূখণ্ড ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইতালি আফ্রিকার একটি দেশ আবিসিনিয়া জয় করল। ১৯৩৬ সালেই ইতালি এবং জার্মানীর গোপন সহযোগিতায় মাদ্রিদের সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষিত হোল। দীর্ঘ দু-বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। নির্মমভাবে শহরগুলোর উপর বোমা ফেলা হয়েছিল। এ যুদ্ধে যত স্ত্রী ও শিশু মারা গিয়েছিল পূর্বের কোন যুদ্ধে তা মারা যায়নি।

১৯৩৮ সালে হিটলার হঠাৎ অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে দখল করে নিল। পূর্বেকার অনাক্রমণ চুক্তি সব নস্যাৎ হয়ে গেল। রাশিয়া বার বার আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিরোধ

চুক্তির জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করল। তাদের প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধিতা এবং নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক ধাক্কা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে জার্মানি, ইতালি এবং জাপান ক্রমশ নিজ নিজ শক্তি অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি করল।

মুসোলিনীর আবির্ভাবের সময়ও ভারত তথা বাংলাদেশে তখনকার জাতীয়বাদী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের কেউ কেউ ফ্যাসিবাদের প্রকৃত কলুষ চরিত্র ধরতে পারেননি। এমন কি রবীন্দ্রনাথও প্রথম ইতালিতে গিয়ে মুসোলিনীর প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু রম্যাঁরলা, বারবুস, আইনস্টাইন, গর্কী প্রমুখ মনীষীর বিবৃতি ও ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা দেশে-বিদেশে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তুলেছিল। জওহরলাল নেহেরু ২২শে জুন, ১৯৩৩ তারিখে তার কন্যাকে লিখেছিলেন, " As fascism has spread in other countries, it has become clear that it is not a peculiar Italian phenomenon, but that it is something which appears when certain social and economic conditions prevail in a country. Whenever the workers become powerful and actually threaten the capitalistic State, the capitalist class naturally tries to save itself. Usually such a threat from the workers comes in times of violent economic crisis. If the owning and ruling class cannot put down the workers in the ordinary democratic way by using the police and army, then it adopts the fascist method. This consists in creating a popular mass movement, with some slogans which appeal to the crowd, meant for the protection of the owning capitalist class. The backbone for this movement comes from the lower middle class, most of them suffering from unemployment, and many of the politically backward and unorganised workers and peasants are also attracted to it by the slogans and hopes of bettering their position. Such a movement is financially helped by the big bourgeoisie who hope to profit by it and although it makes violence a creed and a daily practic, the capitalist government of the country tolerates it to a large extent because it fights the common enemy--socialist labour. As a party, and much more so if it becomes the government in a country, it destroys the workers' organisations and terrorises all opponents." -- (Glimpses of World History). এই চিঠির মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অতি সহজে এবং খুব সুন্দর করে সব কথাই বলা হয়েছে। স্পষ্টতই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সচেতন বুদ্ধিজীবীর আর কোন মোহই রইল না।

ফলে তিরিশ দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন বলতেই ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন বলা যায়। ফরাসী লেখক আঁরি বারবুস এবং রম্যাঁরলা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও ফ্যাসিবিরোধী আবেদনে সই করে পাঠিয়েছেন।

১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় ছাত্ররা যুদ্ধ-বিরোধী দিবস পালন করে। ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে ইতালি-আবিসিনিয়া-যুদ্ধ-বিরোধী সংঘ গড়ে ওঠে। ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় পরিষদ দিল্লীতে সভা করে স্থির করে দরিদ্র অথচ মুক্তি-প্রেমী-আবিসিনিয়ার আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হবে। স্পেন এবং চীনেও মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়েছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্মানী ঘুরে এসে 'হিটলারবাদ'-এর ওপর বই লিখে ফেললেন। ১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তিকংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ আবিসিনিয়া এবং স্পেনের যুদ্ধের নিন্দা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে League Against Fascism and War-এর সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অ্যালবার্ট হলের সভায় সরোজিনী নাইডুও দৃপ্তকণ্ঠে স্পেনের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি জানালেন। রবীন্দ্রনাথ স্পেনের মুক্তিফ্রন্টকে সমর্থন জানাবার জন্য আবেদন জানালেন।

১৯৩৮ সালে জাপানের কোন কাগজ থেকে রবীন্দ্রনাথ জানলেন জাপানী সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল। তাকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন নবজাতকের 'বুদ্ধভক্তি' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের নির্লজ্জ আক্রমণের সমর্থন করায় রবীন্দ্রনাথ জাপানের কবি নোগুচিকে যে দুটো পত্র দিয়েছিলেন তা নিয়ে তখন কোলকাতায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তিন বছর পূর্বে ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে যখন নোগুচি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখনো রবীন্দ্রনাথ ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ ও ফ্যাসিস্ট আচরণের তীব্র নিন্দাবাদ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সেই নোগুচিই তিন বছর পরে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় আঘাত করেছিলেন। ঐ বছরেই রবীন্দ্রনাথ চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে অধ্যাপক লেসনির কাছে সহানুভূতিসূচক চিঠি লিখেছিলেন।

তিরিশ দশকে ইতালি, জার্মানি এবং জাপান যখন দ্রুত একটা বিশ্বমহাযুদ্ধের মহড়া চালাচ্ছিল তখন ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচারও কম ছিল না। তখন কুখ্যাত এন্ডারসনী 'কালাকানুন' ও দমননীতির প্রতিবাদে সারা দেশে ঝড় উঠেছিল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলি জেলে গুলি চালানোর প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে রবীন্দ্রনাথ তার ঐতিহাসিক ভাষণ পাঠ করেন। ১৯৩২ সালে ইংরেজের পৈশাচিক দমননীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে জনৈক ইংরেজ বুদ্ধিজীবীকে লিখেছিলেন, "ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে চলিয়াছে। পীড়ন ও প্রতিহিংসায় বিরামহীন চক্রের আবর্তনক্রমে সন্দেহ এবং শত্রুতার দ্বারা পৌরজীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।"

এর কয়েক মাস পরেই আন্দামান সেলুলর জেলে বিপ্লবী বন্দীরা কতগুলি অত্যন্ত ন্যায়সংগত দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং সেখানে তিনজন বন্দীর মৃত্যু হয়। এই সংবাদে কলকাতায় এবং সারা বাংলায় দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে ছিলেন বলে প্রত্যক্ষভাবে বিক্ষোভ সভায় যোগ দিতে পারেননি। দার্জিলিঙ থেকেই তিনি আন্দামান বন্দীদের অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানালেন। পরে আন্দামান বন্দীদের দাবীগুলির যৌক্তিকতা সমর্থন করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাতেও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল।

১৯৩৬ সালে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির জন্য দেশজোড়া আন্দোলন দেখা দেয়। বাংলাদেশে এবং অন্যত্র সর্বভারতীয় 'ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি' গড়ে ওঠে। ঐ বছরেই বাংলার দুইজন

রাজবন্দী আত্মহত্যা করেন। সেজন্য বাংলাদেশে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিনা বিচারে আটক আইনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও তাকে ধিক্কার জানান। ১৯৩৭ সালে রাজবন্দীদেব সাহায্যের জন্য ববীন্দ্রনাথ প্রমুখের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে তৎকালীন দেশেব অবস্থার কথা সুন্দর বিবৃত হয়েছে : "বিনাবিচারে বন্দী করা, বিচারে মুক্তিলাভের পর পুনরায় গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করা, সভা সমিতি ও বক্তৃতা করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা, স্বাধীন চিন্তা এবং মত প্রকাশ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রকে আইন দ্বারা আষ্ঠেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করা এবং আরও বহু প্রকারে সাধারণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করাই হইতেছে অজিকার বাংলার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।" ঐ বছরেই আগস্ট মাসে আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "জগতের অধিকাংশ দেশের দণ্ডবিধিতে যে শাস্তিদানের নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে, উহাই মানব সভ্যতার কলঙ্ক। তাহার উপর সম্প্রতি পাশ্চাত্যের কোনও কোনও প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবৃত্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের গর্ভনমেন্টের মধ্যেও এই ফ্যাসিস্ট-নীতি কতকটা সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই নীতি আইন এবং মানব স্বাধীনতার ন্যায্য দাবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।"

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে মধ্যবিত্ত সমাজ বরাবর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় উত্তাল বিক্ষোভে কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ যখন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত এবং বিক্ষুব্ধ তখন তার ঢেউ সুকান্তদের পরিবারেও এসে দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া কলকাতার বেলেঘাটা কলেজ স্ট্রীট ভবানীপুরে কালিঘাট অঞ্চল মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকা। এসব এলাকা বরাবরই আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুকান্তদের বাসও এই এলাকায়। বয়স হিসেবে সুকান্ত তখন কিশোর। সবেমাত্র হাইস্কুলের ছাত্র। তার অন্তর্মুখী কবিমন তখন সহপাঠী কবি বন্ধু অরুণাচলের নির্জন বাড়িতে কাব্যচিন্তা এবং প্রকৃতিময়তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও আগামী দিনের সুকান্তকে সেই পরিবেশ নিশ্চয়ই উপযুক্ত করে তুলেছিল।

অন্তর্মুখী কবিমন ছিলো বলেই ছেলেবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন খুব অনুভূতিপ্রবণ। প্রচুর পড়াশুনার ঝোঁক ছিল স্বাভাবিকভাবেই। সেজন্য বাল্যকাল থেকেই সুকান্তর বন্ধুর সংখ্যা ছিল সীমিত। "তবু যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন তার গভীর আন্তরিকতা ও নিবিড় সখ্যতার সঙ্গে পরিচিত।" সেই বন্ধুদের নিয়ে পাড়ার নানারকম গঠনমূলক কাজেও সুকান্ত সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা নোংরা মাঠ পরিষ্কার করে ব্যাডমিন্টন ক্লাব করা, বাড়ির চওড়া বারান্দায় ছোট ছেলেদের পড়ানোর জন্য বিনা পয়সার কোচিং ক্লাস খোলা, এবং বেলেঘাটা স্টুডেন্টস লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা। এগুলোর মধ্যে সুকান্তর সমাজসেবার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও এতে তার মন সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায়নি। তার মাতৃহীন বাড়িতেও ছিল না উপযুক্ত পরিবেশ। সুকান্তর মনের স্ফূর্তি লাভ করত তার বৈমাত্রেয় দাদা শিল্পী মনোমোহনের বাড়িতে। সেখানেই সুকান্তর বেশির ভাগ সময় কাটতো। তাঁর বাড়িতে ছিল "শিল্পীমনকে লালিত করার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ। সেখানে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকতো হাতে আঁকা নানান ছবি, গ্রামোফোন কিংবা রেডিওতে বাজতো গান, আর সব ছাড়িয়ে ছিল দাদার খেয়ালী মনের স্ফূর্তি, যা সুকান্তকে জোগাতো

অফুরন্ত আনন্দ। তা ছাড়া কথা বলার সঙ্গী পেয়ে বৌদি তাঁকে স্নেহ করতেন যথেষ্ট।" সেখানে বা তাঁর কাছাকাছিই বোধ হয় থাকতো তার বান্ধবী। যার সম্পর্কে পরবর্তীকালে বন্ধু অরুণাচলকে লিখেছিলেন, "সেই সুদূর শৈশব হতে সে আমার সাথী। ...আমারা একত্র হলে আনন্দ পেতুম এবং সে আনন্দ ছিল নানারকম কথা বলায়। .. আমাদের উভয়ের দেখা হত, কোন কারণে, প্রায়ই। সে আমায় শ্রদ্ধা করত এবং আমার সান্নিধ্যে খুশি হত। একবার আমাদের উভয়কেই.. যেতে হয়, সেখানেই আমরা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমি সেখান থেকেই লক্ষ করি ওর সান্নিধ্যের আকর্ষণ। তখন আমার বয়স ১১, তার ৯। তারপর আমাদের দেখা হ'তে লাগল দীর্ঘদিন পরে পরে। ...বাস্তিবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাই-বোনের মতই।

তখন ওকে নিয়ে যেতাম পার্কে বেড়াতে, উপক্রমণিকার বাড়ি ওকে পৌঁছে দিতাম দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। একত্রে আহার করতাম, পাশাপাশি শুয়ে বই পড়ে শোনাতুম ওকে, রাত্রেও পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতাম। ...তখনো ভালবাসা কি জানতাম না আর ওকে যে ভালবাসা যায় অন্যভাবে, এতো কল্পনাতীত। কোন আবেগ ছিল না, ছিল না অনুভূতির লেশমাত্র।

শেষে একদিন, যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে, এমনি একদিন, দিনটার তারিখ জানি না, পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম, ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নবপ্রভাতের পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়। অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুল। আর আমি যেন চোরের মত অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না-- আজ পর্যন্ত। ...জিজ্ঞাসা করল, সুকান্ত কথা বলছে না কেন আমার সঙ্গে? ...বহুবার চেষ্টা করল আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে-- কিন্তু আমারই বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল ওর উপর, কেন জানি না। (আমার বয়স তখন ছিল ১৩/১৪)। এই বিতৃষ্ণা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আমিও কথা বলিনি।" পরবর্তীকালে এই বিতৃষ্ণাই পরিণতি লাভ করেছিল গভীর প্রেমে।

ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করল ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর। পোলাণ্ডের সাহায্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। হিটলারের তখন অপ্রতিহত গতি। একের পর এক দেশ পদানত হয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হোল স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকু। অধিকার বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আর রইল না। বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্র। ব্রিটেন ফ্রান্সও অক্ষত রইল না। ফ্রান্সের পতন হোল। এক বছর পরে ১৯৪০ এর সেপ্টেম্বরে হিটলারের জার্মানী, ফ্যাসিস্ত ইতালি এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মধ্যে বিশ্বপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এক চুক্তি হোল। ১৯৪১ এর মে মাসের মধ্যে ইওরোপ মহাদেশের প্রায় সব দেশই হিটলারের পদানত হোল। অবশেষে হিটলার ১৯৪১ এর ২২শে জুন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করল। যুদ্ধের এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হোল।

বাইশে জুন ভোর রাতে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে, কোন রকম যুদ্ধ ঘোষণা না করে হিটলারের জার্মান সৈন্যবাহিনী অতর্কিতে বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত

সমগ্র সীমান্ত জুড়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করলো। জার্মান সরকার অবশ্য পরে ঘোষণা করলো 'সোভিয়েত বলশেভিকবাদ' সমগ্র ইওরোপের কাছেই সামরিক কারণে একটা আতঙ্কের বিষয়।

আসলে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে জার্মানী, ইতালী ও জাপান ছিল মূল আক্রমণের হাতিয়ার, বরাবরই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করেছিল।

বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নকে সফল করার পরিকল্পনায়, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে মূল ঘটনা বলে মনে করতো। সোভিয়েত ইউনিয়নকে তারা ঘৃণা করতো, কারণ তারা জানতো তাদের স্বপ্ন সার্থক করতে সোভিয়েতই হলো সবচেয়ে বড়ো বাধা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ তাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল, আক্রমণাত্মক ও চরম অন্যায়। এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্যই তার স্বাক্ষর বহন করে। হিটলার জার্মানী চেয়েছিল সোভিয়েতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমগ্র পৃথিবীর নিপীড়িত, শোষিত মানুষের সামনে যে একটা নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল সেই আদর্শকে বিনষ্ট করে দিতে।

সেজন্য স্তালিন এই যুদ্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা শুধু দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশপ্রেমী এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইওরোপীয় জনগণকে সাহায্য করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।"

স্বভাবতই এই যুদ্ধকে বলা হল 'পিপলস ওয়ার' বা জনযুদ্ধ। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির মুক্তির প্রশ্ন এই যুদ্ধে জড়িত বলে তাকে বলা হোল মুক্তি যুদ্ধ। এ নিয়ে প্রথমদিকে এমনকি বামপন্থীদের মধ্যেও বিভ্রান্তি দেখা দিলেও এই যুদ্ধের প্রকৃতি যে ভিন্নরূপ একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করল। এই যুদ্ধে গোটা পৃথিবী দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদিকে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠার জিগির অন্যদিকে জনগণের মুক্তি। সেজন্য এই যুদ্ধ ছিল যথার্থ মুক্তিযুদ্ধ। ফ্যাসিস্ত শক্তির হাত থেকে জনগণের মুক্তির যুদ্ধ। ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টি এর নাম দিয়েছিল 'জনযুদ্ধ'। এশিয়া খণ্ডে ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে আকস্মিক আক্রমণে জাপান সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ নৌ ঘাঁটি ধ্বংস করে সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ অল্পকালের মধ্যেই জয় করে নিয়ে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হোল।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতরক্ষা অর্ডিন্যাস জারী করে সভা সমিতি করা নিষিদ্ধ করে দিল, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার প্রভৃতি বহু নির্মম দমনমূলক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করল। এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং শ্রমিক শ্রেণীরও একটি নতুন বিশেষ অধ্যায় শুরু হোল। সেপ্টেম্বরেই জাতীয় কংগ্রেস এক বিবৃতিতে ঘোষণা করল, এই যুদ্ধের সঙ্গে তারা কোন যোগাযোগ রাখতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে তারা দাবী করলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। শ্রমিক শ্রেণীও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করল। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইংরেজ সরকারের নানা আশ্বাসবাণীতে এবার আর কেউ বিশ্বাস করল না। ২রা

অক্টোবর নব্বই হাজার বোম্বের শ্রমিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করল। যুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। মহার্ঘ ভাতার দাবীতে বোম্বে, কানপুর, আসাম, ধানবাদ ও বাংলাদেশের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলেও মার্কসবাদী চিন্তাধারা এবং কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ট্রেড ইউনিয়ন এবং ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠল। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মেনে না নেওয়ায় সারা দেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করল। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে গান্ধীজি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আরম্ভ করলেন। ইংরেজ সরকারের পাশবিক দমননীতিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। ১৯৪১ সালের মে মাসের মধ্যে সারাভারতে কুড়ি হাজার কর্মী ও নেতাকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করেছিল।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের রূপ যে পাল্টে গিয়েছিল সেকথা ১৯৪১ সালের কংগ্রেসের বারদলি অধিবেশনে স্বীকার করে প্রস্তাব গৃহীত হোল। জওহরলাল নেহেরু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করলেন, "The progressive forces of the world are now aligned with the group represented by Russia, Britain, America and China." ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি তখনো বেআইনী হলেও (১৯৩৪ সালে এই পাটিকে বেআইনী করেছিল। ১৯৪২ সালের ২২শে জুলাই তাকে আবার আইনী ঘোষণা করা হোল)। পৃথিবীর এই প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। তারা 'জনরক্ষা সমিতি' গঠন করে পাড়ায় পাড়ায় জনগণের সপক্ষে এবং ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে পুরোদমে কাজ শুরু করে। তখন ছোটো বড়ো সকলের মুখেই ছিল "জাপান এলে রুখতে হবে"—এই শ্লোগান। কেবল শ্লোগান নয়, এ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দল তৈরি হতে লাগল। তারা স্থানীয় এ. আর. পি-র সঙ্গে সহযোগিতা করত। শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা হিসেবে এবং জনগণকে সাহায্য করার জন্য তখন বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর পি নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মতাদর্শ প্রচারের জন্য 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা প্রকাশিত হোল। কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীদের তখন ভীষণ কর্মব্যস্ততা। পার্টিও দ্রুত শক্তি এবং জনপ্রিয়তায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তখন প্রত্যেকের মনে ভয়ও ছিল প্রচণ্ড। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে ইওরোপে যে বিরাট অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তা ১৯৪১ সালে একেবারে কলকাতার দোরগড়ায় এসে উপস্থিত হোল। ১৯৪১ থেকে জাপানী-বোমার ভয়ে কলকাতার মানুষ লাখে লাখে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলকাতার আকাশে তখন ঘন ঘন জাপানী বোমারু বিমানের আনাগোনা। দিনের কলকাতাও জনশূন্য। রাতে নিষ্প্রদীপ। ভয়ে সব শব্দহীন। মাঝে মাঝে মিলিটারি গাড়ি বা বুটের শব্দ। ২৪শে পৌষ, '৪৮ বন্ধু অরুণাচলকে লেখা সুকান্তর এক চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুকান্ত লিখেছিল, "... ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমস্তব্ধমান স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মত সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছবে কিনা ; জানি না ডাকবিভাগ ততদিন সচল থাকবে কিনা। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন

কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন-- সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে এই বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক-একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে বাসরঘরের নববধূর মত এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?

কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, এক রহস্যময়ী নারীর মত, ভালবেসে ছিলাম প্রিয়াব মত, মায়ের মত। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে ; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকব না. কিন্তু এই মূহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি! সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে। গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু ত জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম। ...এই আমার আজকের সান্ত্বনা।"

এই চিঠির মধ্যে একদিকে যেমন তখনকার কলকাতার অবস্থা জানা যায়, তেমনি অন্যদিকে সুকান্তের মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া য়ায়। মৃত্যু ত জীবনের অপরিহার্য পরিণতি কিন্তু সেই মৃত্যু যদি একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য রূপে দিতে হয়, আগামী বসন্তের জন্য আত্মত্যাগ করতে হয় তবে সে মৃত্যু সার্থক।

দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থাও তখন জটিল। প্রাক্ যুদ্ধের বছর গুলো থেকেই জিনিসের দাম ক্রমশঃ যে বৃদ্ধি পেতে লাগল। অন্যদিকে কলকারখানাগুলোতেও ছাঁটাই চলছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত। চটকলে, বস্ত্রশিল্পে, রেলওয়ে প্রভৃতি শিল্পে বহু ধর্মঘট দেখা দিল।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের (মার্চ ১৯৩৯) পর থেকে কংগ্রেসের মধ্যেও ভীষণ জটিলতা দেখা দিল। কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমশঃ বামপন্থী চিন্তাধারা বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেসের সভাপতিত্বলাভে। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীও গান্ধীজীর নেতৃত্বে তার প্রচণ্ড বিরোধিতায় কোমর বেঁধেছিল। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি থেকে পদত্যাগ করতে হোল। বিক্ষুব্ধ অবস্থায় গান্ধীজির প্রতি আস্থা রেখে নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী না নিয়েই সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে নতুন দল গঠন করলেন। কিন্তু গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও তীব্র আঘাত হানল। সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে সাসপেণ্ড করে দেওয়া হোল। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ইংরেজের পুলিশ আর গোয়েন্দাদলের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করে জার্মানীতে গিয়ে হাজির হলেন। সে এক দুর্ধর্ষ কাহিনী। লোকের মুখে মুখে সে নিয়ে কত রটনা।

অবশেষে জানা গেল সুভাষচন্দ্র জাপানেও এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠন করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ এবং ফ্যাসিবাদী শিবিরে যোগদান নিয়ে দেশের মধ্যে বহু বিভ্রান্তি দেখা গেল। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো অন্ধ ইংরেজবিরোধিতায় ফ্যাসিস্ত বাহিনীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মুক্তিবাহিনী বলে মনে করল। সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা তাদের সেই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করেছিল। ফলে একদিকে ইংরেজ সরকার এবং দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী ভারতীয় কমিউনিস্টদের নামে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করতে লাগল, অন্যদিকে এই বামপন্থী গোষ্ঠীও তাদের সোভিয়েতের দালাল, দেশদ্রোহী বলে প্রচার চালাতে লাগল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকলেও এবং বহু কমিউনিস্ট নেতা দীর্ঘকাল ধরে জেলে থাকলেও ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে, প্রগতি লেখক শিল্পী আন্দোলনে, ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে এবং সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি গঠন করে কমিউনিস্ট কর্মীরা জনজীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে এদেশে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা দ্রুত প্রসার লাভ করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণও জঘন্য পথ অবলম্বন করল। তারই নগ্ন প্রকাশ ঘটল ঢাকায় উদীয়মান লেখক ও কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডে।

সে দিনটি ছিল খুবই তাৎপর্যময়। ৮ই মার্চ, ১৯৪২। সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় এক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এখনকার পশ্চিমবাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদও সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যেই ই. বি. রেলওয়ের শ্রমিকদের একটি মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তরুণ শ্রমিকনেতা ও উদীয়মান সাহিত্যিক সোমেন চন্দ। পথের মধ্যে ফ্যাসিবাদী মতের সমর্থকরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ঐ দিন জাপানীদের হাতে রেঙ্গুনের পতন হয়।

তখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছাত্র সম্মেলন এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সোমেন চন্দের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লেখক শিল্পীরাও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। কলকাতায় ২৮শে মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসি বিরোধী লেখকদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে বর্তমানের অনেক কমিউনিস্ট বিরোধী লেখকও ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐদিনের সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্র মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র. সুরেন গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, নীহার রায়, বিষ্ণু দে, নীলিমা দেবী। ঐ সম্মেলন থেকেই গড়ে ওঠে 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।'

যতদূর মনে হয় সুকান্ত ১৯৪১ সালেই রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। চল্লিশ দশকের ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য 'সুকান্ত স্মৃতি'-তে লিখেছেন, "১৯৪১ থেকে জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতার মানুষ লাখে লাখে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলকাতার আকাশে তখন ঘন ঘন জাপানী বোমারু বিমানের আনাগোনা। দিনের কলকাতাও জনশূন্য। রাতে নিষ্প্রদীপ। ভয়ে সব শব্দহীন। মাঝে মাঝে মিলিটারি গাড়ি বা বুটের শব্দ। বহু রাতের অন্ধকারে আমি ও সুকান্ত পথে বেরিয়েছি কলকাতার এই প্রেতরূপ দেখার জন্য।"

তখনকার কলকাতার অবস্থা সুকান্তও লিখেছিলেন ২২শে চৈত্র, ১৩৪৮ তারিখের চিঠিতে তাঁর বন্ধুকে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "...কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত. নাগরিকরা

পলায়ন-তৎপর। নাগরিকরা যে পলায়ন-তৎপর তার প্রধান দৃষ্টান্ত তোমার মা, যদিও তিনি নাগরিক নন, নিতান্ত গ্রামের। তবু এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কত দ্রুত সবাই করছে প্রস্থান আর শহরটি হচ্ছে নির্জন। তবে এই নির্জনতা হবে উপভোগ্য--কারণ এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং এর নব্য পরিচয়ে আমরা একটি অচেনা কিছু দেখার সৌভাগ্যে সার্থক হব।...

আজকাল রাত একটায় যদি কলকাতা ভ্রমণ কর তাহলে তোমার ভয়ঙ্কর সাহস আছে বলতে হবে। শুধু চোর-গুণ্ডার নয়, কলকাতার পথে এখন রীতিমত ভূতের ভয়ও করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর কলকাতায় দেখা যায় গ্রাম্য বিষন্নতা।"

কলকাতার ঐ ভীষণতার মধ্যে সুকান্তর ভাইয়েরাও চিঠি লেখার তারিখেই চলে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে। সুকান্তরও যাবার কথা ছিল। গেলেন না, "মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি সংকুল, রোমাঞ্চকর পরম মুহূর্তের সন্ধানের" জন্য তিনি রয়ে গেলেন। সেই পরমমুহূর্তের আগমনে বিলম্ব দেখে সুকান্তের মনে ক্লান্তি আসছিল।

তখন যশোহর থেকে অরুণাচলের মা সরলাদেবীও সুকান্তকে সেখানে যেতে লিখেছিলেন। সেখানেও তার যাওয়া হোল না। সে সময়কার সুকান্তের কথা জানা যায় সরলা বসুকে লেখা সুকান্তের চিঠি থেকে। সুকান্ত লিখেছেন, "... পারিবারিক প্রতিকূলতা আমাকে এখানে আবদ্ধ করে রেখেছে, নইলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার অপরাধ যে হয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। ...বাড়ির কেউ আমায় এই দুর্দিনে চোখের আড়াল করতে চায় না। অথচ এখানটাও যে নিরাপদ নয়, সেটা ওরা বুঝতে পারে এবং পেরেও বলে, মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরবো। কী যুক্তি? আসল ব্যাপার হচ্ছে সমূলে বিনাশ হলেও আমি যেন না এই সংসার-বৃক্ষচ্যুত হই।

...যেখানে যাই, সেইখানে দেখি কুশ্রীমলিনতা--এক দুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি। আপনাকে এতো কথা বলছি, এর কারণ আপনার কাছে সান্ত্বনা, আরাম চাই বলে; আপনার আশীর্বাদ চাই যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি। আজকাল আপনাকে খুব বেশি করে--এই সময়ে আপনার পবিত্র সান্নিধ্য পেলে আমি নিজেকে এতোটা অসহায় মনে করতুম না-- এই ভেবে মনে পড়ে। চিঠি লেখার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই।

বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই ...কোন গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে কোন নিভৃততম প্রদেশে ; যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট-মনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা, আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এতোরও দরকার নেই, নিদেনপক্ষে আপনাদের ওখানে যেতে পারলেও গভীর আনন্দ পেতাম, নিষ্কৃতির বন্য আনন্দ। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার-- নিবিড় অসহযোগ চলেছে। এই পার্থিব কৌটিল্য আমার মনে এমন বিস্বাদনা এনে দিয়েছে, যাতে আর আমার প্রলোভন নেই জীবনের ওপর। ...অননুভূত অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করেছে। সমস্ত পৃথিবীর উপর রুক্ষতায় ভরা বৈরাগ্য এসেছে বটে, কিন্তু ধর্মভাব জাগেনি। আমার রচনাশক্তি পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে মনের এই শোচনীয় দুরবস্থায়। প্রত্যেককে ক্ষমা করে যাওয়া ছাড়া আজ আমার অন্য উপায় নেই। আচ্ছা, এই মনোভাব কি সবার মধ্যেই আসে এক বিশিষ্ট সময়ে?"

কয়েকদিন পরে লেখা আরেকটা চিঠিতেও যশোহরে এবং আরও দুটি জায়গায় যাওয়ার

কথা আছে। তবে এই চিঠি দুটোতে লেখার কোন তারিখ নেই। সুকান্ত লিখেছেন, "আপনি আমায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। আপনার আগ্রহ আমায় লজ্জা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না বলে। আপনার আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারবো বলে মনে হয় না। আমার মুর্শিদাবাদ যাবার ইচ্ছা নেই। তবে ঝাঁঝায় যাবার কথা হচ্ছে দাদা-বৌদির— সেখানে যেতে পারি। তবে আপনাদের ওখানকার আমন্ত্রণ সেরে।..."

সুকান্তর তখন দিন কাটছিল এক কৈশোরক প্রেমের উন্মাদনায় আর অঢেল পড়াশুনায়। ২৪শে পৌষ, ৪৮ তারিখে বন্ধুকে লেখা চিঠি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যর 'বনশ্রী', প্রবোধ সান্যালের 'কলরব', মনীন্দ্রলাল বসুর 'রক্তকমল' ইত্যাদি বই পড়েছেন। তাছাড়া সুকান্তর বৌদি মনোমোহন ভট্টাচার্যের স্ত্রী সরযূ দেবীর 'ঘরোয়া স্মৃতি' থেকে জানা য়ায় সুকান্ত শরৎচন্দ্রের সমস্ত বই পড়ে শেষ করেছিল। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'কথাসরিৎ সাগর', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও সুকান্ত পড়েছিল।

বাড়িতে এত লেখাপড়া করলেও স্কুলের পড়াশুনো সুকান্তর ভাল লাগত না। সরযূ দেবী লিখেছেন, "শৈশবকাল থেকে স্কুলের প্রতি সুকান্তর একটি বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছিলো ; বিশেষ করে স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা আর মাস্টারদের অত্যধিক শাসনের ওপর। টিফিনের পর বাড়ী এসে প্রায়ই সে আর স্কুলে যেতো না। এই স্কুলে না যাওয়ার জন্যে আমি আর মাসীমা (কে জি বসুর মা) ওকে বকাবকি করতাম যথেষ্ট। সুকান্ত ইতিহাসে বড্ড কাঁচা ছিলো। প্রায়ই ইতিহাসে সে ফেল করতো।" তাছাড়া অঙ্কেও সুকান্ত ছিল খুব কাঁচা। অঙ্কেও ফেল করতো। অঙ্ক বাদ দিয়ে পড়া যায় কিনা সে চিন্তা করতো এবং অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করতো। কিন্তু তা আর হোল না। ম্যাট্রিকটাই পাশ করা হোল না তার পক্ষে। এ জন্য তার আক্ষেপও কম ছিল না।

এর মধ্যে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের ঘটনা। তখন ছোট বড় সকলের মুখেই ছিল এক শ্লোগান—'জাপান এলে রুখতে হবে'। এ সম্পর্কে সুকান্তর বৌদি লিখেছেন, "এখানে ওখানে দল তৈরি হচ্ছে। সুকান্তও পাড়ার ওই রকম একটি দলে যোগ দিয়েছিল। আমি জানতে পেরে বললাম, ওসব আবার কি রে? বাড়িতে পুলিশের হামলা হবে শেষে—

সুকান্ত গম্ভীর ও ভারিক্কী চালে বললো, ওসব তুমি বুঝবে না।

আমাদের ওই অঞ্চলে, বর্তমানে যেখানে সুকান্তর ভাইয়েরা বাস করে, ঐ সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন। এসেছিলেন শুধু নয়। সাতদিন একটি মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ছিলেনও। কারণ, সে সময় ওখানে ধাঙড়-মেথরদের ধর্মঘট চলছিলো। সেই সমস্ত ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্র আসেন ও থাকেন কদিন।

পাড়ার ওই সমস্ত ব্যাপারে ভলান্টিয়ারি করতে সুকান্তর কী উৎসাহ। পথ ঘাট নর্দমা পরিষ্কার করার কাজেও সে যোগ দিয়েছিলো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। সুভাষচন্দ্রের আসা ভলান্টিয়ারের দল তৈরি করে পাড়ার জনহিতকর এই সব কাজ করা— এর থেকেই সুকান্ত পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলে আত্মনিয়োগ করার অনুপ্রেরণা পায়— এ কথা বলা চলে। এরপর থেকে সে নিয়মিত রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়তো, আর রেডিওর খবর শুনতো আগ্রহের সঙ্গে।

ওকে রাগাবার জন্যে বলতাম, কিরে 'জাপান এলে রুখতে হবে' করবি, না 'বন্দেমাতরম' করবি?

ও তার জবাবে গম্ভীর হয়ে বলতো, দেখি কি করি।

একটি উপসর্গ বাড়লো।

ওর ফরমাস মতো 'যুগান্তর' কাগজ রোজ নিতে হতো আমাদের।

ওই সময়ে পাড়ার ক'জন ছেলের সঙ্গে মিলেমিশে সুকান্ত একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলো।"

তার অনেক আগেই সুকান্ত তার দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের চেষ্টায় রেডিওর 'গল্প দাদুর আসরে' একটি কবিতা আবৃত্তি করার প্রোগ্রাম পেয়েছিল। আবৃত্তি করতে যাবার আগেই সুকান্তর পৈতা হয়েছিল। গল্পদাদুর আসরে তখন 'দাদুমণি' ছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সুকান্ত সেদিন রেডিওতে আবৃত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'শীতের আহ্বান' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান ছিল সুকান্তর খুব প্রিয়। সুকান্তর প্রথম দিকে রচিত কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথের খুব প্রভাব ছিল। তখন প্রতি রবিবার সকালে রেডিওতে পঙ্কজকুমার মল্লিকের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসতো। সুকান্ত নিবিষ্টচিত্তে সেই প্রোগ্রাম শুনতো। কোনদিন ফাঁক যেতো না। পঙ্কজকুমার ছিল সুকান্তর প্রিয় গায়ক। অনেক সময় তাঁর মতো গলা করে সুকান্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতো।

পৈতের সময়ও একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। পৈতার আগের দিন সুকান্তকে তার বৌদি একটা টাকা দিয়ে ইচ্ছে মত খাবার খেতে বলে দিলেন। "এক টাকায় তখন ছোটোরা রাজ্য কিনতে পারে। সুকান্ত কিন্তু সে টাকায় কিছু খায়নি। মাথার চুল বড় যত্নের ছিলো তার। পৈতার সময় তো মাথা কামিয়ে নেড়া হতে হবে! তার চুলের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সেই টাকাটিতে ক'খানা ছবি তুলেছিলো সুকান্ত। এখন ওই যে গালে হাত দেওয়া ছবিটি ওর দেখতে পাওয়া যায়, ওটা সেই ছবিগুলিরই একটি।"

যুদ্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ওই যুদ্ধের মধ্যেই সুকান্তদের বেলেঘাটার পৈতৃক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলো। সুকান্ত তার পিতার সঙ্গে বেলেঘাটার দুই রেলব্রীজের মাঝামাঝি ২০ নম্বর নারকেলডাঙা মেন রোডের বাড়িতে চলে গেলেন। একই সময়ে সুকান্তর দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্য হরমোহন ঘোষ লেনের কে. জি. বসুর বাড়ি থেকে চলে গেলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মায়ের মৃত্যুর পর সুকান্তর প্রধান স্নেহের অশ্রয়স্থল ছিল তার বৌদি। কে জি বসুর মাতা লিখেছেন, "আমাদের বাড়িতে, মনোমোহনের বউ সরযূর কাছে নানারকম আবদার ধরতো সুকান্ত। সরযূও তার মা-হারা এই ছোটো দেওরটিকে স্নেহ করতো খুব। তাই ওর সব রকমের বায়না মিটোতে চেষ্টা করতো। যতো দুষ্টুমিই করুক, সরযূ ওকে কোনদিন শাসন করতো না।"

সুকান্তর পিতা এবং দাদার বাসা বদল হয়েছিল ১৯৪২ সালে। তার ন'দিন পরেই কলকাতায় প্রথম বম্বিং হলো। তার মাস দুয়েক আগে সুকান্ত এমনভাবে পাড়ার দলে মিশে রিলিফ ইত্যাদির কাজে লেগে গেলো যে সুকান্তর ওপরের ভাই সুশীল বিরক্ত হয়ে এর জন্যে তার বৌদিকেই দোষারোপ করলো। সকলের কাছে বলতে লাগলো, বৌদিই সুকান্তর মাথাটা খেয়েছে।

পাড়ার মধ্যেই সুকান্তর আব একটি স্নেহ-নীড় ছিলো বন্ধু-মাতা সরলা বসুর বাড়ি। বেলেঘাটার নির্জন এক পল্লীর ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাঁচিল ঘেরা একটি বাড়ি। তিনি ছিলেন একজন লেখিকা। "তাই তাঁর কাছে সুকান্তের একটা বিশেষ আদর ছিল— তিনি কিশোর কবিকে স্নেহ করতেন মায়ের মতোই।" এই বাড়িতেই সুকান্তর অনেক সময় কেটেছে। তারপর কলকাতার সাইরেন বেজে উঠতেই সরলাদেবী কাজকর্ম বন্ধ করে ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন যশোর জেলার নিভৃত পল্লীতে। এই ঠিকানায় বন্ধু অরুণাচলকে লেখা চিঠিই আছে সুকান্তের পত্রগুচ্ছে। কিছুদিন পরে সরলাদেবী একা কলকাতায় ফিরে এলেন। ওদের স্কুল তখন উঠে গিয়েছে অবিনাশ শাসমল লেনে। পুরানো বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ায় সরলা দেবীর মনে যে বেদনা দেখা দিয়েছিল সুকান্তেব মনেও তার অনুভব কম ছিল না। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় :

"তুই বোধ হয় এ খবর পাসনি যে ; তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত তৃণ-শ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালি হাওয়ায়-হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি, তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনতায়। তোর মা এতে পেয়েছেন গভীরতম বেদনা, তাঁর ঠিক আপন জায়গাটিই যেন তিনি হারালেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন এক নিকটতম আত্মীয় সুদূর হয়ে উঠল প্রকৃতির প্রয়োজনে। শত শত জন-কোলাহল-মথিত ইস্কুল বাড়িটি আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মত তার অবস্থা। তোদের অজস্র স্মৃতি-চিহ্নিত তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদেরই স্পর্শের জন্য উন্মুখ ; সেখানে এখনও বাতাসে পাওয়া যায় তোদের স্মৃতির সৌরভ। কিন্তু সে আব কতদিন? তবু বাড়িটি যেন আজ তোদেরই ধ্যান করছে।" সুকান্তর অদ্ভুত বর্ণনাশক্তিতে "সদ্যবিয়োগব্যাথাতুরা বিরহিনীর মত বাড়িটার অপূর্ব মূহ্যমানতা" যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো খবর কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। আমরা দেখেছি 'জাপানকে রুখতে হবে' শ্লোগানের মধ্য দিয়েই সুকান্ত ক্রমশঃ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তখন কলকাতায় তরুণ এবং ছাত্রমহলে ভীষণ সাড়া পড়ে গিয়েছে। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তরুণ উদীয়মান লেখক সোমেন চন্দ ঢাকায় নিহত হয়েছেন। কলকাতায় তখনকার প্রায় সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিয়ে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। সুকান্তর তখনকার অবস্থা জানা য়ায় দেওয়ালের কবিতা লিখনে— সুকান্ত লিখেছে কে. জি. বসুদের বাড়ির দেওয়ালে ঃ

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কথা,
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা।

আর পাওয়া যায় বন্ধুকে লেখা ১৭ই এপ্রিলের লেখা চিঠিতে। সুকান্তর জীবনে তখন প্রধান সমস্যা ভালোবাসার সমস্যা। এ সম্পর্কে সুকান্ত লিখেছেন ঃ "বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব। হয়তো আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি সেই সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে। অবতরণকালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে আমার বুকের স্নিগ্ধ মধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক,

তার মধ্যে আমি যখন কথা বলি, তখন যদি দেখি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আমারই কথা শুনছে, তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশি, আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমার প্রেম। কিন্তু বড় ব্যথা।"

কিশোরপ্রেমের গভীর সংবেদনশীল আবেগের পরিচয় এই চিঠিতে আছে। এই ভালোবাসা সীমাবদ্ধ ছিল একটুকু কাছে পাওয়া, একটুকু চোখে দেখা, একটু পাশে পাশে চলা-র মধ্যে। তাতেই গভীর আনন্দ। সে আনন্দ সুকান্ত তখন খুবই পেয়েছিল। তারও উল্লেখ আছে ঐ চিঠিতে ঃ "ওর পাশে চলে, ওর এত কাছে থেকে, যে আনন্দ সেদিন আমি পেয়েছি, তা আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল।" তারপর বিমান আক্রমণের ভয়ে সেই ভালোবাসার সুন্দরী তরুণীটি সুদূর প্রবাসে চলে যাওয়ায় এই পর্বের সেখানেই ইতি ঘটল। কিন্তু ভালোবাসার ইতি হলো না, একটি মেয়ের প্রতি ভালোবাসা তখন সারা দেশের প্রতি ছড়িয়ে পড়ল।

সে সময়েই ক্রিপস মিশন ভারতে আসে। ঐ মিশন যুদ্ধোত্তরকালে ভারতকে ডোমিনিয়ন রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেন, যুদ্ধের সময় ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং যুদ্ধের পরে একটি সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা তৈরি করা হবে। বস্তুত ক্রিপস পরিকল্পনায় নতুন কোন নীতি পরিবর্তনের কথা ছিল না। ফলে কংগ্রেস সহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিকভাবে ক্রিপস প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তারপর রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটল। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল এর বেশি তাদের কিছু করবাব নেই। কংগ্রেস সহযোগিতা করতে চেয়েও যখন ব্যর্থ হোল তখন নৈরাশ্য ঘনীভূত হোল। মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপালাচারি মুসলীম লীগের সঙ্গে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার প্রস্তাব দিলেন। সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রাজাগোপালাচারি কংগ্রেস থেকে পদ্যতাগ করলেন।

কংগ্রেস চলে গেল গান্ধীজির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে। তিনি ঘোষণা করলেন, জাপানকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করতে হবে ; ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে হবে ; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রতি নৈতিক সমর্থন আছে এবং ভারতবর্ষকে কোন প্রকার সংঘর্ষের উর্ধ্বে রাখতে হবে। অন্য দিকে সুভাষচন্দ্রের সমর্থকরা শত্রুপক্ষের সাহায্যেই দেশের স্বাধীনতা সম্ভব বলে জোর প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বভাবতই এই প্রচার ছিল ফ্যাসিস্ত শক্তির অনুকূলে। জাপবাহিনীর সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশের মধ্যে যে অসদ্ইচ্ছা ক্রমবর্ধমান ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে তা স্বীকার করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ৮ই আগস্ট "ভারতছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজি বললেন, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হোল। শুরু হয়ে গেল "অগাস্ট আন্দোলন"। কংগ্রেসের নামে দেশের বিভিন্ন অংশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র এবং জাপানের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির কথা ভুলে তারা সরকারের পুলিসফাঁড়ি, রেলস্টেশন, ডাকঘরে আগুন দিল, রেল উপড়ে ফেলে যাতায়াত ব্যবস্থাকে বিকল করে দিল, কিছুকাল সারা ভারতে একটা প্রচণ্ড ঝড় যেন

বয়ে গেল। মোট ৫৩৮ বার পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীকে গুলি চালাতে হয়েছিল, অভ্যুত্থানে যোগদানকারিদের মধ্যে নয় শতের বেশি লোকের প্রাণ গেল, ত্রিশজন পুলিস ও এগারো জন সিপাহীকেও মরতে হয়েছিল।

দেশের অভ্যন্তরে এই এনার্কিষ্ট আন্দোলন পরোক্ষে জাপানকে সমর্থন করবে বলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফ্যাসিবিরোধী শ্রমিক শ্রেণী এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। তারা প্রস্তাব করে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে নিয়ে ভারতবর্ষে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হোক এবং এই ফ্রন্ট হবে ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধে একটি সাধারণ প্ল্যাটফরম। এই প্রস্তাবের পক্ষে তারা ব্যাপক আন্দোলনও গড়ে তোলে। কিন্তু অন্ধ ব্রিটিশ-বিরোধিতা এবং জাপানের প্রতি গোপন সমর্থনসূচক মনোভাবের জন্য এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

এই সময় মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের খুব সুনজরে পড়ে। কারণ তারা কেবল উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ-ব্যবস্থাকে সমর্থনই করেনি, তাদের লোকজনকে যুদ্ধে যোগ দিতেও প্ররোচিত করেছিল। প্রকৃত পক্ষে যে ভারতীয় বাহিনী উত্তর আফ্রিকা, ইতালি, মালয় এবং বর্মায় যুদ্ধ করেছিল, তাদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন ছিলেন মুসলমান। লিওনার্ড মসলি তাঁর "The Last days of the British Raj" গ্রন্থে লিখেছেন, "The idea that the Hindus would be prepared to accept Japanese occupation out of sheer resentment of the British was more than most British officials stomach, They shuddered at the idea of the Indian sub-continent in the hands of men like Gandhi, the congress leader, who in 1942, calmly contemplated a Japanese victory... Not unnaturally, they were inclined to embrace the Muslim League which not only supported the war effort euthusiastically but encouraged its members to join the armed forces and fight. In fact, sixty-five per cent of the soldiers of the Indian Army who fought in Norh Africa, Italy, Malaya and Burma were Muslims."

অনেক কংগ্রেস নেতারাও জাপ আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। উগ্র ব্রিটিশ বিরোধিতায় জাপ-প্রেমকে তারা দাস-সুলভ মনোভাব বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, "There is the imminent peril of invasion by Japan, Only a slave mind could imagine that Japan would give India freedom. National self-respect demanded that we should not think in terms of change of masters. We should resist Japanese aggression, not withstanding our differences with British. There could be no welcome for Japan, whether active or passive." জওহরলাল নেহেরুও ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২ তারিখে জাপানকে আক্রমণকারী বলে অভিহিত করে ভারতের মুক্তিদাতা জাপান বলে যারা মনে করতেন তাদের ধিক্কার জানিয়েছেন : "The fundamental factor to-day is the distrust or dislike of the British Government. It is not pro-Japanese sentiment. It is anti-British sentiment. That may occassionally lead

individuals to pro-Japanese expression of views. This is short-sighted. It is a slave's sentiment, a slave's way of thinking, to imagine that to get rid of one person who is dominating us we expect another person to help us and not dominate later. Free men ought not to think that way. It distresses me that any Indian should talk of the Japanese liberating India.''

তাদের এই উক্তির পিছনে যে বাস্তবতা ছিল তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। জাপানকে যারা মুক্তিদাতা বলে মনে করেছিল তাদের হাতেই ঢাকায় সোমেন চন্দ নিহত হয়েছিল। সোমেন চন্দ ছাড়াও তখন একাধিক ফ্যাসিবিরোধী কর্মী বহুস্থানে লাঞ্ছিত, প্রহৃত এবং নিহত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার কাছে তৎকালীন ছাত্র-যুব-তরুণ বা কৃষক-শ্রমিক পরাজয় স্বীকার করেনি। ১৯৪২ সালে পাটনায় সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে ঐ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হয় এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য সুসংহত সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

১৯৪১ সালের প্রথম দিকেই যুবচিত্তে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বজুড়ে যে আলোড়ন চলেছিল তার ঢেউ এসে লাগে। কলকাতায় তারা 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি সংস্থা গড়ে, সেখানে আলাপ আলোচনা, বিতর্ক, সমবেত সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে তারা ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবধারার প্রচার শুরু করেছিল। তারপর ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েতের ওপর হিটলার বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যখন যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল তখন কলকাতায় ধীরে ধীরে জাপানকে রুখতে হবে বলে জনযুদ্ধের পক্ষে প্রচার শুরু হোল আর তার সঙ্গে গড়ে উঠল একটি নতুন সংগঠন 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি।' এরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতির সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জনসমাজে তুলে ধরলেন। তার পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে নানা কুৎসা এবং ভ্রান্ত ধারণাই এদেশে প্রচলিত ছিল।

অন্যদিকে তখন জাপানী আক্রমণ দ্রুত ভারতের দিকে এগিয়ে আসছিল। ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, বর্মা তারা দখল করে নিল। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও জাপানীদের দখলে চলে গেল। মণিপুরের ইম্ফল পর্যন্ত তারা এগিয়ে এল। চট্টগ্রাম, কলকাতায়, মাদ্রাজে তারা বোমা ফেলল।

কলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণের কাহিনী সুকান্তের এক চিঠিতেই পাওয়া যায়। চিঠির তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪২। সুকান্ত লিখেছেন, "গত বছরে এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল। ইচ্ছা হলে পুরানো চিঠির তাড়া খুঁজে দেখতে পারিস। এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, এখন ত বর্তমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল। ব্যাপারটা ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা এক রকম ভরসারই কথা। গুজবরে আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। ...প্রথম দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিনে হাতীবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে-- (এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে), চতুর্থ দিন ডালহৌসী অঞ্চলে-- (এই দিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে আর

নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়।) আর পঞ্চম দিনে অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। কালকের আক্রমণ স্থান আমার এখনও অজ্ঞাত। ১ম ৩য় আর ৫ম দিন বাড়িতে কেটেছে, কৌতূহলী আনন্দের মধ্যে দিয়ে। ২য় দিন বালীগঞ্জে মামার বাড়িতে মামার (সমবয়সী বন্ধু ছোট মামা শ্রীবিমল ভট্টাচার্য) সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কেটেছে, ৪র্থ দিন সদ্য স্থানান্তরিত দাদা-বৌদির (বৈমাত্রেয় বড় ভাই শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য ও তাঁব পত্নী) সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে কেটেছে সবচেয়ে ভয়ানকভাবে। সেদিনকার ছোট্ট বর্ণনা দিই কেমন? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অতিমাত্রায় খুশি ছিল। ...অবিশ্যি এতখানি উদারতার মূলে ছিল সেদিনকার কর্মহীনতা, যেহেতু Examination হয়ে গেছে. রাজনৈতিক কাজও সেদিন খুব অল্পই ছিল, সুতরাং মহানুভব (!) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বৌদির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ...(রাত্রি) ৯-১০ এমনি সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধহয় সাইরেন বাজছে ; রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাইরেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাদা তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি, হৈ-চৈ করে বাড়ি মাৎ করে দিলেন। এমন সময় বঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্তব্ধ। আর শুরু হয়ে গেল দাদার 'হায়', 'হায়' বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহুল মুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে-বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতে ছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহে মনে চমকে উঠি, এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিনঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু হয়নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।"

জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণ ও তৎকালীন কলকাতাবাসীর মনে প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হোল। এই চিঠির মধ্যেই সুকান্ত উল্লেখ করেছেন তিনি 'রাজনৈতিক কাজ' করছেন। 'রাজনৈতিক কাজ অল্প ছিল', বলেই বৌদির সঙ্গে গল্প করতে তার বাড়ি গিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতেই উল্লেখ আছে, তিনি একদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পি. সি. জোশীর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। এই সভাতেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেই এসে সুকান্তের সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং সুকান্তের "কোন বন্ধুর প্রতি" কবিতাটির প্রশংসা করে দুঃখের সঙ্গে জানায় কবিতাটি তাঁর পকেট থেকে হারিয়ে গেছে নচেৎ তা ছাপা হত। সুকান্তের সঙ্গে সুভাষের এই আলাপ এবং কথাবার্তা থেকে কিন্তু মনে হয় না যে সেদিনই সুকান্তের সঙ্গে সুভাষের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। অর্থাৎ সুকান্তের সঙ্গে সুভাষের পরিচযটা পূর্বেই হয়েছিল। 'কোন বন্ধুর প্রতি' কবিতাটা পূর্বেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পকেটে ছিল এবং বোধ হয় তা বেশ কয়েকদিন ছিল এবং তার ফলেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পকেটে কবিতা যাওয়ার পূর্বেই পরিচয় থাকাটা স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন কত পূর্বে? 'সুকান্ত সমগ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সুকান্তর যখন বালক বয়স, তখন থেকেই তার কবিতাব সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছি। 'পদাতিক' বেরিয়ে তখন পুরানো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে অপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাস পালিয়ে বিডন স্ট্রিটের চায়ের দোকানে আমাদের আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর করে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। পড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি কবিতাগুলো সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমন কি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা প'ড়ে অবাক না হয়ে পারেননি।

আমার সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যেই বোধ হয় মনোজ একদিন কিশোর সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তের চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারবো না।

সে সব কবিতা পরে 'পূর্বাভাস'-এ ছাপা হয়েছে। তাতে কি এমন ছিল যে, পড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম? আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না। কারণ, বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি ব'য়ে এসেছে। কোনো কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল, শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। সে হিসাবে তখন সুকান্তর বয়স চোদ্দ কিন্তু 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সব কবিতাই কি ঐ বয়সের লেখা? না, তার পরে লেখা কবিতাও 'পূর্বাভাস'-এ সঙ্কলিত হয়েছে। অতএব পূর্বাভাস-এর সব কবিতাই সুকান্তর চোদ্দ বছর বয়সের লেখা বলে মনে করলে ভুল হবে।

সুকান্ত-অনুজ অশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি সুকান্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, "সুকান্তব এক জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার নিয়মিত পাঠক। এর কাছ থেকেই বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা ও বিভিন্ন আধুনিক কবিতার বই পড়ার সুযোগ ঘটেছিল সুকান্তর। মনোজই তাঁর স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকান্তর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। একটি খাতায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা সুকান্তর কিছু কবিতা পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন সুভাষ— এত অল্পবয়সী ছেলে এমন পরিণত ও বলিষ্ঠ কবিতা লিখলো কী-করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় সুকান্তর জীবনে একটা বড় ঘটনা! কেন না সুভাষকেই তিনি তাঁর কবিচেতনার গুরু বলে মানতেন।"

সুকান্তের চিঠি পড়ে কিন্তু অশোক ভট্টাচার্যের কথা সত্য বলে মনে হয় না। সুকান্তর উপরোক্ত চিঠিতেই আছে, "তারপর (ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভার পর) অনেকদিন পরে সুভাষের কথামত একটা সংকলন গ্রন্থের জন্য রচিত কবিতা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে থেকে সুভাষের অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, স্বর্ণকমলের সঙ্গেও বেশ গল্প জুড়ে ছিলাম। সেদিন সুভাষ আমার এত প্রশংসা করছিল যা সহসা চটুকারিতা বলে ভ্রম হতে পারত। সুভাষও আমাকে বই ছাপাতে বললে।" এ ছাড়া আর কোন চিঠিতেই সুভাষ সম্পর্কে সুকান্তর কোন উচ্ছ্বাসপূর্ণ বা সশ্রদ্ধ উক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। সুকান্ত যদি সুভাষকে 'কবিচেতনার গুরু বলে' মনে করতেন তাহলে তাঁর সম্পর্কে অন্যভাবে অনেক উল্লেখ থাকতো।

তবে পারিপার্শিক ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সুকান্তকে কবিমহলে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার মূলে সুভাষের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় বিডন স্ট্রীটের চায়ের দোকানে সুকান্তর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে কথা বলেছেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যা সুভাষের কলেজের বন্ধু মনোজ ভট্টাচার্য এবং কে. জি. বসুর সুকান্ত স্মৃতিচারণায়। 'সুকান্ত বিচিত্রা' গ্রন্থে মনোজ ভট্টাচার্য ঐ চায়ের দোকানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে "সুকান্ত ছিল অত্যন্ত মুখচোরা। সুভাষের মত প্রথম সারির কবির সঙ্গে সুকান্ত একটাও কথা বলতে পারেনি—বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তার কয়েকদিন পরে একটি সুদৃশ্য খাতায় লেখা কয়েকটি কবিতা সুকান্ত আমায় পড়তে দিল। তার মধ্যে "বৈশম্পায়ন" কবিতাটি ছিল। এই কবিতার গভীরতা এবং ছন্দমাধুর্য আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করেছিল। আমি তড়িৎ সেই খাতাখানা দিলাম কবি বন্ধু সুভাষকে। আমার ভাই সুকান্ত যে একটি বিস্ময় তা তাকে না জানিয়ে পারছিলাম না।

সে খাতাখানা সুভাষের হাত থেকে গেল কবি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এবং তারপরে বুদ্ধদেব বসুর কাছে। এরা দু'জনেই প্রথমে বিশ্বাসই করলেন না যে এই লেখা এক চোদ্দ বছরের কিশোরের! এই খাতার সব কবিতাই পরে 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে।" চোদ্দ বছর বয়সের লেখা এবং সব কবিতাই পর্বাভাস গ্রন্থে মুদ্রিত কথাগুলো ঠিক নয়। কারণ উল্লিখিত 'বৈশম্পায়ন' কবিতাটিই 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পূর্বাভাস এর সব কবিতাই সুকান্তের চোদ্দ বছর বয়সের লেখা নয়। তার একটি প্রমাণ 'প্রথম বার্ষিকী' কবিতাটি। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই কবিতাটি ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে রচিত, সুকান্তর বয়স তখন ষোল বছর। স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে অনেকেই তথ্যের প্রামাণ্যতার দিকে দৃষ্টি দেন না। ফলে তার ওপর নির্ভর করে সঠিকভাবে কিছু বলাও মুশকিল।

যাই হোক, সুকান্ত তখনো স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় বম্বিং হওয়ার সময় সুকান্ত তাঁর দাদার বাড়িতে আটকে আছেন। সে সময়কার সুকান্তের কথা বলতে গিয়ে তার বৌদি সরযূ দেবী লিখেছেন, "কলকাতায় তখন বিরাট হৈ চৈ, বম্বিং হয়ে গেছে, বহু মানুষ মারা পড়েছে। সকলেই নিজের নিজের লোকের খোঁজ খবর নিচ্ছে তখন। এইরকম যখন অবস্থা তখন সুকান্ত আমাদের কাছে। তিন দিনের দিন আমার শ্বশুরমশাই সুকান্তর খোঁজ করতে এলেন। সব জায়গায় খুঁজে, এখানে এসে ওর দেখা পেয়ে, না বলে আসার জন্যে খুব বকাবকি করলেন। ...শ্বশুরমশাই বললেন, সুকান্ত কোনো নিয়ম মেনে চলে না, পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছে একরকম—বাড়িতে কারো সঙ্গে কথাও বলে না বিশেষ।

সেদিন তিনি সুকান্তকে বকাবকি করলেন না শুধু, অনেক বোঝালেনও। বললেন, যদি ভাল লাগে এখানেই না হয় থাক। ইস্কুলে ভর্তি হ, পড়াশোনা কর মন দিয়ে।

যাবার সময় জিজ্ঞেস করলেন, কবে বাড়ি যাবি বল, দিনটা আমার জানা দরকার। তুই আবার এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবি না তো? তারপর বললেন, না, আর কোথাও যেও না। দিনকাল খারাপ—এখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে।

সুকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনো কথা বললো না।

বাবার মুখের ওপব কোনদিনই কোনো কথা বলতো না সে।''

এই ঘটনার আগের থেকেই সুকান্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। সে যে রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকে তারও উল্লেখ আছে পূর্বোক্ত পত্রে। সুকান্ত ঠিক কবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল দিন তারিখ দিয়ে তা বলা যায় না। সুধী প্রধান লিখেছেন, ''অরণি' সাপ্তাহিক প্রকাশেব পর (১৯৪১) যে তাকে দেখেছি এবং আলাপ হয়েছে এটা বলতে পারি।'' এখানে 'ভবিষ্যতে' ছড়াটি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। ঐ ছড়ার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন, চাষী-মজুর প্রভৃতির উল্লেখে সুকান্তর 'কমিটমেন্টে'র পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া ঐ লেখা সম্ভব নয়। ছড়াটি ১৯৪০ সালে লেখা বলে মনে করা হয়। তাহলে সেই সময় বা তার পূর্ব থেকে সুকান্তের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব। গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে একদিন সুকান্তও যোগ দিল লড়াই-এর ময়দানে। তখন চারদিকেই জনতার বিরাট জাগরণ দেখা দিয়েছিল। এই লক্ষ লক্ষ জাগ্রত জনতার মধ্যে সুকান্ত নিজেকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল। বিপ্লবী আন্দোলন তার সুপ্ত সৃজনী প্রতিভাকে জাগিয়ে দিল।

তখনকার অবস্থা বর্ণনায় তৎকালীন ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ''আর পাঁচজনের মত স্কুলের পড়ায় ওর তেমন মন ছিল না। স্বভাবতই অভিভাবকরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। ফলে মাঝে মাঝেই দেখা দিত পারিবারিক অশান্তি। প্রায়ই সেসব কথা এসে বলত ও হতাশ হয়ে পড়ত। আমরা কিন্তু বুঝেছিলাম পাঠ্য-পুস্তকের চারদেয়ালে আটকে পড়ার ছেলে ও নয়। তাই, যদিও তখন আমাদের নীতি ছিল ভালো ছাত্রকর্মী হতে হলে— স্কুল-কলেজের লেখাপড়াতেও ভাল ছেলে হতে হবে— সুকান্তর বেলায় তার ঘটল ব্যতিক্রম। কারণ আগেই বলেছি ও ছিল অসাধারণ। সৃষ্টির বেদনায় অস্থিরতার লক্ষণ ও প্রকাশ তখন সুকান্ততে সুস্পষ্ট। তা ছাড়া তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। মার্কসবাদের প্রচার ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে একদিকে বিতর্ক, আলোচনা, নকল পার্লামেন্ট ও অপরদিকে গান, নাটক ও কবিতা-পাঠের আয়োজন ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রগতিশীল গান, নাটক ইত্যাদি রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ছাত্র ফেডারেশন গণনাট্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘেরও পূর্বসুরী। পরবর্তী কালে গান, নাটক ও ছায়াছবির জগতে বাংলায় যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের অনেকেই কোন না কোনভাবে গোড়ায় ছাত্র-ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অংশীদার ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সর্বশ্রী সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা য়ায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন সুর ও ছন্দের কবিতা তখনকার আন্দোলনে প্রভূত উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায়। এই পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতী মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নতুন সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সুকান্তর কবিতা রচনাও দানা বাঁধতে থাকে।''

ছাত্র-আন্দোলনের বাইরে তখন বৃহত্তর সমাজ জীবনে যে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল

তার নাম জনযুদ্ধের আন্দোলন। আসামে চট্টগ্রামে বোমা পড়তে লাগল। অবশেষে কলকাতায়ও বোমা পড়ল। জাপ বিরোধীদের কণ্ঠে তখন "জাপানকে রুখতে হবে" শ্লোগান। তাই তাদের পল্লীকবি নিবারণ চক্রবর্তী লিখলেন :

ওরে আসাম মণিপুরে
দিবারাত্র ঘর্ঘর শব্দ ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান উড়ে।
চতুস্পার্শে আছে য়ারা, মৃতপ্রায় হইয়াছে তারা
সদায় এই চিন্তাধারা, কখন বোমা পড়ে।
দরদী কেউ নাইগো তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে
আপন বুচকা বান্দে সবাই আপন আপন চিন্তা করে।।

কারণ, তখন প্রগতি আন্দোলনের মানুষ মাত্রই জানতেন ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার মধ্যেই ছিল মুক্তি আন্দোলনের নিশানা। সেজন্যই আগস্ট আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসকদের বর্বর নিপীড়ন, কংগ্রেসী নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতির পরিণামে জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতায় যে সর্বনাশা জাপপ্রীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রগতিকামী মানুষকে সোচ্চার হতে হয়েছিল। সুকান্তও স্বাভাবিকভাবে এই আন্দোলনের শরিক হয়ে পড়ল।

১৯৪২ সালেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং গোলাম কুদ্দুসের সম্পাদনায় 'একসূত্রে' নামে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক-ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৯৪২ মূল্য— এক টাকা। এই গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলার ৫৫ জন কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে সুকান্তরও একটি কবিতা ছিল। তার নাম মধ্যবিত্ত, ৪২।

এছাড়া 'জনযুদ্ধের গান' নামে আরেকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৪২। প্রথম সংস্করণে সুকান্তের গান ছিল না। ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৪২। এই সংস্করণে সুকান্তের 'জনযুদ্ধের গান' অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ৩য় সংস্করণ মে, ১৯৪৩। এই সংস্করণে সুকান্তের গান বাদ। সম্পাদক-সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে। প্রকাশক ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।

সুকান্ত অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান লাভ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তার তখন কবিতা প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় আর গল্প প্রকাশিত হয় 'অরণি' পত্রিকায়।

এই সময়েই সুকান্তের ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এল এক 'কালবৈশাখীর ঝড়'। মনে হয় তার অভিভাবকরা তখন সুকান্তের পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ২৭শে চৈত্র, ১৩৪৯ তারিখে বন্ধু অরুণাচলকে সুকান্ত লিখেছিলেন, "বেশ স্কুলে যাচ্ছিলাম, রাজনীতির চর্চা করছিলাম, এমন সময় এল কালবৈশাখীর মত বিনা নোটিশে এক ঝড়", সেই ঝড় যে আসলে কী ছিল তা গোটা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে লেখেননি। তবে চিঠির একেবারে শেষাংশে বলেছেন, "একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে...আমার সমস্ত আশা আকাঙ্খা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। আমার শিক্ষা জীবনের ওপর এত বড় আঘাত আর আসেনি, তাই বোধহয় এত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতা, তাই সমস্ত শিরা--শিরার রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ।" তখন সুকান্তের সংসারে পারিবারিক আভ্যন্তরীণ খুব গোলযোগ দেখা

দিয়েছিল। সেজন্য সুকান্তকে ভীষণ আর্থিক প্রতিকূলতায় পড়তে হয়েছিল। তবে এটা কেন কেবল সুকান্তের জীবনেই ঘটেছিল তা সুকান্ত জীবনী আলোচনায় বা সুকান্তের স্মৃতি কথনে কেউ উল্লেখ করেননি। ২৭শে ১৩৪৯ তারিখে বন্ধু অরুণাচলকে সুকান্ত এ সম্পর্কে লিখেছেন, "চিঠিটার উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হল, বোধহয় কুড়ি-বাইশ দিন, কিন্তু সেজন্য আমি এতটুকু দুঃখিত নই-- যেহেতু আর্থিক প্রতিকূলতা (শুধু অর্থনৈতিক অরাজকতার জন্যে নয়, পারিবারিক আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন) ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে আমাকে, এমনকি আমার ভবিষ্যৎকে পর্যন্ত। অবিশ্যি আর কিছু পরিবর্তন পরিবারের কোথাও হয়নি, কেবল আমার পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে বিপর্যয়।"

রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রথম দিকে সুকান্তর-র কার্যক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় 'কবি সুকান্ত' গ্রন্থে। "স্কুলের ছাত্র হিসাবে প্রথমে তখনকার ছাত্র-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল সুকান্তকে। পরপর বিভিন্ন ছাত্র-ধর্মঘটে সংগঠকের ভূমিকা নেওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দেশবন্ধু হাইস্কুলের কর্মকর্তাদের বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু তাঁর কাজ কেবলমাত্র ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যেই সীমিত ছিল না। তখন বেলেঘাটায় কমিউনিস্ট কর্মীরা সংখ্যায় ছিলেন কয়েক জন, আর সে তুলনায় তাঁদের কাজ ছিল অনেক বেশি। তাই প্রত্যেক কর্মীকেই পরিশ্রম করতে হতো যথেষ্ট। সুকান্তও তাঁর অপরিণত মনের আবেগে একাই একাধিক মানুষের কাজ করতেন দিনে রাতে। সুকান্তদের বাড়ির অদূরেই একটা পোড়ো বাড়িতে ছিল কমিউনিস্টদের আস্তানা— 'জনরক্ষা সমিতি'র অফিস। অফিসের দেয়াল জুড়ে পোস্টার আর পোস্টার। এইসব পোস্টারে তুলে ধরা হতো সমসাময়িক মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণার যুক্তি ও তাৎপর্য—সোভিয়েত রাশিয়ার পিছনে দেশের শ্রমিক ও জনসাধারণকে জড়ো করার দুরন্ত প্রয়াস। সেই পোড়ো বাড়ির মাঠেই তখন জমা হতেন স্থানীয় কর্মীরা, আলাপ-আলোচনা চলতো, তারপর সবাই ছড়িয়ে পড়তেন যে যার কাজে। নিয়মিত ভাবে পাড়ায় পাড়ায় 'এ-আর পি'র তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা বে-সরকারি সংগঠনগুলির কোন একটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিরক্ষামূলক কাজে উৎসাহিত করতে হতো স্থানীয় অধিবাসীদের, বেচতে হতো রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা। তা ছাড়াও সারা দুপুর পোস্টার লিখে রাত্রে সেই পোস্টার দেয়ালে দেয়ালে মেরে দিতে ঘুরতে হতো ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে।"

এই 'জনরক্ষা সমিতি' গড়ে উঠেছিল বেলেঘাটার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা সুশীল মুখার্জি প্রমুখের নেতৃত্বে। এই সমিতির কাজ ছিল খাদ্য আন্দোলন করা, কন্ট্রোল-এর দোকানে লাইন সাজানো, লাইনে যাতে কোনো অনুপ্রবেশ না ঘটে তা দেখা। খাদ্যের সারিতে দাঁড়ানোর ব্যবস্থায় সুকান্তও ছিল একজন স্বেচ্ছাসেবক। তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতায় সেজন্যই সে লিখতে পেরেছিল আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের স রিতে প্রতীক্ষায়।

. বাল্যকাল থেকেই দেখা গিয়েছে সুকান্ত ছিলেন আবেগপ্রবণ এবং সিরিয়াস প্রকৃতির। অনুভবের গভীরতায় এবং আবেগের দৃঢ়তায় যা তাঁর কাছে সত্য বলে মনে হোত তার প্রকাশেও থাকতো না কোন অস্পষ্টতা এবং পিছিয়ে পড়া মনোভাব। সেজন্য রাজনৈতিক কাজকর্মকে তৎকালীন আরও অনেক তরুণের মতো সুকান্তও একটা আদর্শ এবং প্রত্যয় হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। স্বভাবতই সে কাজে গাফিলতি করা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সে

কাজের মধ্যে যে কী উন্মাদনা ছিল তা পরবর্তী কালের 'অতি সচেতন' তরুণ বা যুবকদের পক্ষে উপলব্ধি করা হয়তো সহজ নয়। সেজন্য অশোকবাবু 'অপরিণত মনের আবেগে' সুকান্ত একাই একাধিক লোকের কাজ করতেন বলে যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তখনকার কর্মীদের মধ্যে কথায় আর কাজে কোন 'ফারাক' ছিল না। সেজন্য অপরিণত মনের আবেগে নয়, স্বভাবসুলভ নিষ্ঠাতেই তারা অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। সুকান্তও করেছিলেন।

সুকান্তর বাড়ির পরিবেশ সুকান্তর-র মনের উপযোগী ছিল না সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসম্পর্কে সুকান্ত-স্মৃতি চারণায় কে. জি. বসু লিখেছেন, "...সুকান্তদের সংসারধর্ম ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে অবিন্যস্ত এলোমেলো। বাড়ির গৃহকর্ত্রী না থাকলে যা হয় আর কি। ওর বড় ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তখন আমাদের বাড়ির একটি অংশে বসবাস শুরু করেছেন।

নিজের বাড়ির ওই নোংরা ময়লা আবহাওয়ার মধ্যে সুকান্ত মানিয়ে নিয়েছিলো নিজেকে। ময়লা জামা-কাপড়, ময়লা বিছানায় চাদর, এমন কি পরণের গেঞ্জীটির মধ্যেও তার দৈন্যদশা। মাইনে করা পরিচারিকার এসব দিকে লক্ষ্য করার অবকাশ ছিল না। ...শুধু জামা কাপড় নয়, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও সুকান্ত আর তার ভায়েদের কোন নিয়ম কানুন ছিলো না। দিনে আর রাতে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল বাড়ীতে, অন্যসময় জলখাবার টিফিন খেলো কি না ছেলেরা, সে বিষয়ে লক্ষ্য কারো ছিল না।

এইসব কারণেই সুকান্তর মনটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল বহির্মুখী। বাড়ীতে সে বিশেষ থাকতো না। হয় আমাদের বাড়ি আমার মায়ের কাছে, মোনাদার কাছে, নয় অরুণাচলদের বাড়ি চলে যেত সুকান্ত।"...

"ওর জ্যাঠামশায়ের পরিবারটি কিন্তু ওদের মতো অবিন্যস্ত এলোমেলো ছিলো না, ও বাড়ির সুন্দর সুস্থ শান্তিময় আবহাওয়ার মধ্যে তাই সুকান্ত ছুটে যেতো বার বার। ওখানে জ্যাঠতুতো দাদা রাখালদা আর মনোজের কাছে বসে রাজনীতি আর সাহিত্যের চর্চা শুনতো সে। ওদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশতে পারতো সুকান্ত। যেটা নিজের বাড়িতে অগ্রজ সুশীলের সঙ্গে কখনো হয়নি। সুশীল আর সুকান্ত ছিলো পিঠোপিঠি দুই ভাই। সেজন্য সুশীলের সঙ্গে তার গোলমাল অশান্তি হামেশাই লেগে থাকতো।...

"ওর রাজনৈতিক অনুভূতি তৈরি করার ব্যাপারে আরো একজন মানুষের দান ছিলো, তিনি হলেন সুকান্তর ইস্কুলের মাস্টারমশাই শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দাস।"

যাই হোক, সুকান্ত রাজনীতিব সঙ্গে ক্রমশ নিজেকে বেশি করে জড়িয়ে ফেলছিলেন। বাড়ির সঙ্গে সুকান্তর নিবিড়তা পূর্বেই কম ছিল এখন আরো কম হয়ে গেল। "বাড়ির মাইনে করা রাঁধুনী রান্না শেষ করে যারা দেরিতে যেত তাঁদের জন্যে খাবার ঢেকে রেখে, চলে যেত বলে সুকান্তর পক্ষে বাড়ির লোকজনদের এড়িয়ে চলাটা আরো সহজ হয়েছিল। এ অবস্থায় সুকান্তর বাবা তাঁর রক্ষণশীল বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারলেন তাঁর ছেলেটি "কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়েছে-- অর্থাৎ গোল্লায় গেছে-- তখন তাঁর দুঃখের আর অন্ত থাকতো না। কিন্তু সুকান্তর প্রতি মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তিনি কথায় তার মাতৃহারা ছেলের প্রতি কঠোর হতে পারতেন না।"

ফলে সুকান্তও জাতীয় কর্তব্যবোধের প্রেরণায়, নতুন আদর্শবোধের তাড়নায় আর পাঁচজন কমিউনিস্ট কর্মীর মতই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন পার্টির নির্দেশে। সাম্প্রতিক কালের মত তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ সহজ ছিল না। প্রতিটি কর্মীকেই নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব পালন করতে হতো। না করলে 'আত্ম-সমালোচনার' সম্মুখীন হতে হতো। এখনো বোধ হয় একই নিয়ম আছে তবে তা নিশ্চয়ই অনেক শিথিল। সুকান্ত তার আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার জন্য অল্পদিনেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন কিন্তু "যতদূর জানা যায় সেই সময় তিনি ছিলেন এর তরুণতম সভ্য"! অশোকবাবুর এ উক্তি ঠিক নয়। বেলেঘাটা আঞ্চলিক পার্টির তরুণতম হতে পারেন কিন্তু সারা বাংলা এমনকি সারা কলকাতা পার্টিতেও বোধ হয় না। যাই হোক, রাজনীতির কাজে ব্যস্ত হয়েও সুকান্তর কবি-সত্তা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়নি। বরং নব নব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তা শীঘ্র স্বকীয়তা লাভ করল। সুকান্তের জীবনে রাজনীতি এবং সাহিত্যের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না।

চল্লিশের দশক বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধির কাল। তখন একের পর এক সাংঘাতিক ঘটনা দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল। তখনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অন্য ঘটনাগুলো তারই অনুষঙ্গ। তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক হলো পঞ্চাশের মন্বন্তর।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণের এক শোচনীয় পরিণাম ভারতবর্ষে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মন্তুদ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ হয়েছিল তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। এ সম্পর্কে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'আকাল' (প্রথম প্রকাশ, ১৩৫১, সব কবিতাই ১৩৫০ সালে লেখা) কাব্যগ্রন্থের 'কথা-মুখ' এ লিখেছেন, "তেরোশো পঞ্চাশ' সম্বন্ধে কোন বাঙালীকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? কেন না তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হ'য়ে য়াওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতীয় কৃষির অবস্থা যে কী পরিমাণে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল তার নগ্ন প্রকাশ পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন যোগ দিল। বর্মাদেশ থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। বাংলা দেশে তখন চালের ঘাটতি ছিল মাত্র ছ'সপ্তাহের। যে ঘাটতি আমদানি এবং সুষম বন্টনের দ্বারাই মেটানো যেত। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের তখন সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তারা তখন যুদ্ধের খেলায় মত্ত। স্টার্লিং রিজার্ভের বিরুদ্ধে ব্যাপক কাগজী মুদ্রা ছাপিয়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিল। সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ী চক্রও নিজেদের কোলে ঝোল টানবার জন্য জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়িয়ে দিল। গোপন মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করল। শুরু হোল কালোবাজারি যা এখনো অব্যাহত চলেছে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে যেখানে চালের মণ ছিল মাত্র ছ টাকা সেখানে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চালের মণের দাম উঠল একশ টাকায়। দরিদ্রতর শ্রেণীর ওপরে এই আঘাত এসে পড়ল প্রচণ্ড। মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে গ্রামগুলো শ্মশান হয়ে গেল।

এই দুর্ভিক্ষের চিত্র পাওয়া যাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' উপন্যাসে, 'আজ কাল পরশুর' গল্পগুলোতে। এই দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকের বর্ণনা আছে চিন্তামণি উপন্যাসে :

"জিনিসের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিসের দাম একেবারে হয়ে যায় চড়ক গাছ! কতগুলি দরকারি জিনিস একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে। সারা মধুবণীতে বিলেতী ফুড কেনার সমস্যা চাষীদের মধ্যে এক রঘু ছাড়া আর কেউ বোধ করেনি, কিন্তু লাঙলের ফাল, দা কাস্তে পেরেকের সমস্যায় ভুগেছে অনেক চাষী। নিতাই কামারের হাপর বন্ধ নয়, কিন্তু হাপর চলেছে শুধু সারাইয়ের কাজে, কিছু তৈরি হবে না, লোহা নেই। বাজারের পুরানো লোহার কারবারি রামচরণ ক'দিন আগে হঠাৎ এসে ডবল দাম দিয়ে লোহার গুঁড়োটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নিতাইয়ের দোকান থেকে। নিতাই কি জানত তখন এমন ব্যাপার হবে? গরুর গাড়ির একটা লোহার ডাণ্ডা রামচরণ কিনে নিয়ে গিয়েছিল সাড়ে পাঁচ টাকায়, আড়াই টাকা লাভ হয়েছিল নিতাই-এর। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িটার জন্য সেই ডাণ্ডা হরেকৃষ্ণবাবু কিনেছেন তের টাকায়।...

গাজনতলার সোমবারের হাটে কাপড় কিনত চাষীরা, আট দশ আনা চড়া দেখে দু'তিন হাট তারা কেনা বন্ধ রেখেছিল। পরের সোমবার দ্যাখে কি হাটে কাপড় এসেছে মোটে দু'চার খানা।"

কেবল জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধি নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা। সেই জীবনযাত্রাই একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। রজনীপাম দত্ত India Today গ্রন্থে তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "The whole life of the people was disrupted. Parents were forced to thorw their children and babies on the roadside in the hope that somebody may pick them up and feed them. Husbands were forced to leave their wives and the whole family at the mercy of events. Women were forced to sell themselves and enter brothels. Out of the 125,000 destitutes who came to Calcutta, it is estimated that quite about 30,000 young women joined brothels to be able to just continue their breathing."

সে এক বীভৎস দৃশ্য। পিতামাতা অসহায় অবস্থায় নিজেদের শিশুপুত্রকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। বিবাহযোগ্য মেয়েগুলোকে মেয়ে চালান ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিয়েছে কিছু টাকার বিনিময়ে। জায়গা জমি জিনিসপত্র সব তো আগেই বিক্রি করে দিয়েছে। পাতা লতা খেয়েও আর ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করা যাচ্ছে না। গ্রাম ছেড়ে কাতারে কাতারে মানুষ কলকাতায় এবং বিভিন্ন শহরে এসে ভীড় করেছে। অহোরাত্র একটু ভাত দাও, ফেন দাও চীৎকারে সমগ্র পরিবেশ কেঁপে উঠেছে। শহরের ফুটপাতে, গ্রামের পথে ঘাটে মড়া মানুষ নিয়ে শেয়াল কুকুরে টানাটানি করেছে। রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে গেছে অসহায় স্বামী নিরূপায় হয়ে। তেমনি নিদ্রিত স্বামীকে পরিত্যাগ করে স্ত্রী চলে গিয়েছে আরো অন্ধকারের দিকে। পূতিগন্ধময় সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় মন্বন্তর দেখা দিল সম্পূর্ণরূপে তার করালগ্রাস নিয়ে।

তার কিছু নমুনা পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পে : নারী-ব্যবসায়ী কালাচাঁদ এসেছে কেশবের কাছে তার মেয়ে শৈলকে নিতে। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মানিক লিখেছেন, "সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিছে মানুষের মরণ। নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা

কুশায়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে। ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রি হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশ ও তার পরিবারের বাড়তি পড়তি মানুষ কটাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।"

"শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুনগুনানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায় : তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী। মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!"

সার্বিক দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেল। বাংলা দেশের এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ গত মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। এই দুর্ভিক্ষের সম্পর্কে Percival Spear তাঁর বিখ্যাত A History of India গ্রন্থে লিখেছেন, "The loss of Burma rice led to an overall food loss of about five percent, which, however, was felt chiefly by the rice-eating regions of Bengal and in the south. The shortage was not catastrophic but stocks had to be moved over a transport sysyetem already clogged by the mounting allied war efforts. Prices began to rise, the peasant sold his stock to pay off his debts and then found himself with nothing to eat ; black makct appeared and the peasants began to flock to Calcutta. The Bengal Government proved unable to meet the crisis while the Central Government refused to intervene from federal scruple of overriding a provincial administration. Thus what should have been a controlled shortage became the first famine of starvation since the famine code was devised in 1883 with a mortality of upto two millions."

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে যে সমীক্ষা পরিচালিত করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন ৩৫ লক্ষ ঐ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছে। সরকারি সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে ১৫ লক্ষ মারা গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, "It has been for us a sad task to enquire into the course and causes of the Bengal famine. We have been haunted by a deep sense of tragedy. A million and half of the poor of Bengal fell victim to circumstances for which they themselves were not responsible. Society, together with its organs, failed to protect its weaker members, Indeed, there was a moral and social breakdown, as well as an administrative breakdown."

দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কি অবস্থায় উপনীত হয়েছিল তারই একটি মর্মান্তিক বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন পত্রিকায় :

"গতকল্য অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া পার্কে এ. অর. পি. ডিপোর সম্মুখে একটি হৃদয়বিদারক

দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থান আবর্জনা ফেলিবার পাত্র হইতে ভিক্ষুকেরা প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য খুঁটিয়া খায়, একটি ভিক্ষুক রমণী অপর একটি ভিক্ষুক রমণীর সংগৃহীত খাদ্য ছিনাইয়া লওয়ায় শেষোক্ত ভিক্ষুক রমণী পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মাথায় একটি লৌহ পাত্র দ্বারা আঘাত করে। ফলে, তার ক্ষতস্থান হইতে ভীষণভাবে রক্ত পড়িতে থাকে এবং রক্তপাতের ফলে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।"

ভারবতর্ষের জাতীয় জীবনে তখন বিরাট সংকট। দেশের দোরগোড়ায় জাপানী আক্রমণ, দেশের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, ভারত ছাড় হুমকি দিয়ে কংগ্রেসের নেতারা কারারুদ্ধ, অগাস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের করুণ আর্তনাদ। বাঙলা দেশের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে তখন কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যান্য দলীয় কর্মীরা তখন বিভ্রান্ত। অন্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধিতায় তারা সোচ্চার। জনমনে তা কোন স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। কমিউনিস্ট কর্মীদের সমকালীন সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে সমকালীন রাজনীতির এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়েছিল। একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উত্তেজনা অন্যদিকে যুদ্ধ মন্বন্তরে পীড়িত মানবিকতার প্রতি কর্তব্যবোধ তৎকালীন সচেতন তরুণমনকে নাড়া না দিয়ে পারলো না। রাজনীতিটা তাদের কাছে প্রত্যক্ষ রূপে ধরা ছিল। জনযুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষীয় প্রচারে তাদের পথ বেছে নিতে কোন অসুবিধা হোল না। তাদের রাজনীতি একটি সম্পূর্ণ জীবনবোধ এবং আচরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দলে দলে কমিউনিস্ট কর্মীরা যেমন জাপ-বিরোধী প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠল অন্য দিকে তেমনি তারা আর্ত মানুষের সেবায় এবং সাহায্য লঙ্গরখানায়, রেশনের লাইনে স্বেচ্ছাসেবকের অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগল।

কর্মী হিসাবে সুকান্তকেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। "বেলেঘাটার 'জনরক্ষা সমিতি'র পক্ষ থেকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁদের কাজ ছিল কখনো নিরন্নদের অন্ন বিতরণ, আবার কখনো বা শৃঙ্খলায় অনভ্যস্ত জনতাকে লাইন দিয়ে চাল, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনায় সাহায্য করা। ...এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সব থেকে সৎ ও একনিষ্ঠ ছিল যে অংশ, তাদেরই অন্যতম ছিলেন সুকান্ত। কী কঠিন পরিশ্রম করতেন প্রত্যহ— কোন সকালে বেরিয়ে সূর্য পশ্চিমে যেন কিছুটা হেলে পড়লে ক্লান্ত দেহ টেনে বাড়ি ফিরতেন তিনি। অথচ এর জন্যে স্বেচ্ছাসেবকের প্রাপ্য একটা চালের টিকিট সঙ্গে নিয়ে ফেরেন নি কোন দিন। প্রয়োজন ছিল না এমন নয়। বরং পরিবারের দরকারে ঐ মহামূল্য বস্তুটি সংগ্রহ করতে প্রাণপাত হতো তাঁরই ছোটভায়েদের। তবু এই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি ছিলেন মনে প্রাণেই স্বেচ্ছাসেবক, সেবার কোন বিনিময় গ্রহণ তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব।" (কবি সুকান্ত)

কমিউনিস্ট পার্টি তখন তার সাংস্কৃতিক শাখাকেও নানা দিকে উজ্জীবিত করে তুলল। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কিশোর, লেখক, শিল্পী, প্রত্যেকের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। সুকান্তর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি। তার রাজনীতির ক্রিয়া-কর্ম ছিল কবিত্বেরই পরিপূরক। পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে মানবতার অপমৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রেশনের লাইনের তিক্ত অভিসম্পাতে, লঙ্গরখানার করুণ কোলাহলে, মিছিলের উল্লাসে-চিৎকারে যে ক্ষোভ, যে বেদনা, যে আশা, যে উদ্দীপনা তিনি সকাল থেকে

রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকেই তিনি প্রত্যক্ষ ভাষায় প্রকাশ করে মৌন মুককে মুখর করে তুলেছেন। তা ছাড়া চিন্মোহন সেহানবীশের স্মৃতিচারণ থেকে জানা য়ায়, 'জনযুদ্ধে'র পৃষ্টায় সংবাদ ছাপানোর জন্য সুকান্তকে রিপোর্টার হিসেবে বহু জেলায় পাঠানো হয়েছিল। তিনি চট্টগ্রাম থেকে দুর্ভিক্ষের খবর পাঠিয়েছেন তা ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমণও তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেজন্যই তখনকার সমাজসচেতন সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সংগঠন 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' যখন দুর্ভিক্ষ বিষয়ক একটি প্রতিনিধিমূলক সংকলন প্রকাশের আয়োজন করেছিল তখন তার সম্পাদনার ভার দেওয়া হয়েছিল তরুণতম এই কবিকে। 'আকাল' নামে এই সংকলনের সম্পাদনায় সুকান্ত নিঃসন্দেহে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থের তিনি যে ভূমিকা লিখেছিলেন সেটাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ঐ সংকলনের সব কবিতাই ১৩৫০ সালে লেখা। সংকলন গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ, ১৩৫১।

এই গ্রন্থ সম্পাদনা সুকান্তের কাব্য প্রতিভারই সাদর স্বীকৃতি। এতে মোট আঠার জন কবির আঠারোটি কবিতা আছে। সেগুলো হোল, জঠর--অরুণ মিত্র, চালের কাতারে--বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি--সুকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রাবণ-- বুদ্ধদেব বসু, ১৩৫০--বিমলচন্দ্র ঘোষ, ফ্যান-- প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরক-- নবেন্দু রায়, অনুভব--মনীন্দ্র রায়, লাল--ফারুক আহমদ, আমাদের গান-- জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মন্বন্তর--দিনেশ দাস, স্বাগত-- সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাতা--অমিয় চক্রবর্তী, অভিশাপ--কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গৃহস্থ বিলাপ--সমর সেন, কাহিনী-- অবন্তী সান্যাল, দ্বৈরথ--গোলাম কুদ্দুস এবং মেঘমুক্ত--কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। সুকান্ত এই গ্রন্থের 'কথা-মুখ'-এ লিখেছেন, ''বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব-অনাহার পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র? তাদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত? এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি? এই জাতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে চেয়েছে এই সংকলন।

সাহিত্য যে সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া, জীবনেরই প্রতিভূ-- তেরোশো পঞ্চাশ সালে প্রগতিশীল লেখকেরা অংশত এই কথাই প্রমাণ করেছেন তাঁদের গল্পে উপন্যাসে কবিতায়। ইতিপূর্বে দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কবিতা এখনো কোনো সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অবশ্য এমন কবিও আমাদের দেশে আছেন, যাঁরা কবিতাকে দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় কণ্টকিত হতেদেখলে শিউরে ওঠেন। তাঁরা নিজেদের না পারুন, কবিতাকে দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

'তেরোশো পঞ্চাশ' সম্বন্ধে কোন বাঙালীকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কি হতে পারে? কেন না তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মতো স্বদেশ-বৎসলের মতো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে ব'সে গাইলেন সূর্যোদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়। তাঁদেরই কয়েকজনের কবিতার সংগ্রহ নিয়ে এই সংকলন।

তেরোশো একান্ন সালে সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের

স্বজনবিয়োগের ক্ষোভ, অক্ষমতার জ্বালাকে কত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারছি, এতো বড়ো লোকসানকে স্বীকার করতে পারছি কত সহজে। এক বছর পূর্ণ হবার বহু আগেই ভাবতে শুরু করেছি, "এই তো সেদিন তবু সে কাহিনী হয়ে গেছে একান্ত প্রাচীন।" অথচ বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় গত বছরের ক্ষত এখনো শুকোয়নি। এই সংকলন যদি গত বছরের দুঃসহ স্মৃতিকে এবং বর্তমানের অনুত্তীর্ণ সংকটকে আমাদের মনে জাগিয়ে রাখার কাজে এতটুকু সহায়তা করতে পারে, তাহলে সংকলনের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হবে।"

এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় সুকান্ত লিখেছেন অনেক গল্প কবিতা, পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন একটি রূপক কাব্যনাট্য 'অভিযান'। ছেলে মেয়েদের অভিনয়ের জন্য লেখা বলে হয়ত এর মধ্যে সেবার আদর্শই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সময়কার লেখা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় ফুটে উঠেছে কবির অন্তর্জ্বালা, তীব্র বেদনার অভিব্যক্তি।

সুকান্ত তাঁর এই কবিতাটি প্রথম পাঠ করেছিলেন বালিগঞ্জ লেকের সীমানার মধ্যেকার সংগঠন 'ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি'র ১৯৪৩ সালের বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যায় 'রবীন্দ্র স্মরণ' অনুষ্ঠানে। ওই সংগঠনের সভ্য পৃষ্ঠপোষকেরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন কলকাতার নামকরা ধনী অভিজাত সম্প্রদায় থেকে। সুকান্তর জ্যাঠতুতো মেজদাদা রাখাল ভট্টাচার্যও ওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসু এবং অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যও সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে এক স্মৃতিচারণায় পারুল বসু (কে. জি. বসুর স্ত্রী) বলেছেন, সুকান্তর গায়ে আধময়লা জামা, পায়ে জুতো নেই, ওই অভিজাত সমাবেশে সামিল হওয়ার মতো সাজ পোশাক চেহারা তার মোটেই ছিলো না। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে লাজুক সুকান্ত মাথা নিচু করে কোনরকমে কবিতাটি পড়ে শেষ করলো।

সভার অধিকাংশ লোকই ছিলেন কবিতা সম্বন্ধে উদাসীন। তাই সুকান্তর কবিতার ওই স্মরণীয় লাইনগুলি কারো মনেই কোনো সাড়া তুললো না। সে যখন পড়ছিলো:

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তখন, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অনুষ্ঠানের শ্রোতারা পরস্পরের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলছিলেন। প্রায় শ্রোতাই ছিলেন অমনোযোগী। ওর কবিতা পড়া শেষ হতে, উপস্থিত শ্রোতাদের মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, যেন ওই আলোক-উজ্জ্বল কেতাদুরস্ত অনুষ্ঠানে বিরাট এক ছন্দপতন ঘটিয়ে ফেলেছে সুকান্ত। অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের ওই মানুষগুলি যেন সুকান্তর ওই জ্বালাময়ী কবিতার বক্তব্য সহ্য করতে পারেননি সেদিন। কেউ কেউ বিরক্তও হয়েছিলেন।"

এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "বন্ধুমহলে নাম শুনেছিলুম আগেই ; চোখে দেখলুম লেক-লগ্ন একটি ক্লাবের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে। উজ্জ্বল আলোয় সুবেশ, চিক্কণ

এবং সাধারণত কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন মেয়ে পুরুষের ভীড়ের মধ্যে কালো একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে, বেশ চেঁচিয়ে, বেশ স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নিজের লেখা একটি কবিতা পড়লো। পড়াটা ভালো লাগলো আমার, কবিতাটিও মন্দ না।''

চল্লিশের যুগেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবা স্বাধীনতা'র আদর্শে 'কিশোর বাহিনী' নামে কিশোরদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত ১৯৪৩ সালেই সুকান্ত এই সংগঠনের দায়িত্বে আসে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় জেলার বিভিন্ন শহরে বিশেষভাবে পূর্ব বঙ্গের জেলাগুলোতে কিশোর বাহিনীর শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিশোর বাহিনীর সংগঠন, খেলা-ধূলা, নাচ-গান, কবিতার লড়াই সবই সুকান্ত নিজেদেখাশুনা করত। পাড়ায় পাড়ায় শাখা সংগঠনগুলো নিজে গিয়ে দেখে আসত। ১৯৪৪ সালে দেখা যায় 'বাংলার কিশোর বাহিনী'র কেন্দ্রীয় অফিস ছিল ৮/২ ভবানী দত্ত লেন-এ। সুকান্ত সেখান থেকে 'কর্মসচিব' হিসেবে শাখা সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দিতেন। তখন কিশোর বাহিনীর সভ্যদের মাথা পিছু চাঁদা ছিল এক আনা (বর্তমানে ছয় পয়সা)। তাহলেই তাকে সভ্যকার্ড দেওয়া হোত। ৭.১০.৪৪ তারিখে কর্ম সচিবের লেখা একটি চিঠি থেকে কিশোর বাহিনীর কী রকম কাজ কর্ম ছিল তা জানা যায় :

''তোমরা কী ধরনের কাজ করবে জানতে চেয়েছ তাই জানাচ্ছি, তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার-ব্যবহার-চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দিবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজের পাড়ার বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে।''

কিশোর বাহিনী ও সুকান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''জাতীয়তার ভাবে কিশোর সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা ও নানা সৃজনশীল কাজের ভেতর দিয়ে কিশোরদের গড়ে তোলাই ছিল কিশোর বাহিনীর লক্ষ্য। কিশোর বাহিনী ও কিশোর সভা ছিল সুকান্তর প্রাণ। দেশের ভাবী সমাজ কিশোরকুলকে সে সত্যই প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। নাটক ও অভিনয়ের প্রতি কিশোরদের আকর্ষণ অতি প্রবল। কিশোর বাহিনীর কিশোর-কিশোরীদের অভিনয়োপযোগী কোন নাটক বা নাটিকা তখন ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল সুকান্তই রচনা করতে পারে এমন নাটক। আমাদের ভেতর অনেক আলোচনার পর ঠিক হল—১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রূপকের মাধ্যমে একটি নৃত্যনাট্য সুকান্ত রচনা করবে। কিন্তু নাটক লিখতে গেলে নাটক সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা থাকা দরকার। তাই সুকান্তকে পাঠালাম স্টারে 'বিন্দুর ছেলে' দেখতে। দেখে ফিরে এল আমাদের আস্তানায় তখনকার ছাত্র কমিউনে। থিয়েটার দেখে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম—কি দেখলে? উত্তরে বুঝলাম 'বিন্দুর ছেলে' দেখে দর্শকের গ্যালারীতে বসে শুধুই কেঁদে কেঁদে চোখ ভারি করেছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে বসেই 'অভিযান' নৃত্যনাট্যটি লেখা শেষ হলো। প্রথম লেখার ওর বিপ্লবী চেতনার স্বাভাবিকতা থেকে শেষ দৃশ্যে ছিলো নিপীড়িত প্রজাদের হাতে অত্যাচারী কোতোয়ালের মৃত্যু। তখনকার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষকদের অনেককেই পড়ে শোনান হল। তাদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত কোতোয়াল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রজাদের হাতে বন্দী হলেন। এই অবাঞ্চিত পরিবর্তনের কথা মনে পড়লে আজ বিরক্ত ও ব্যথাই শুধু জাগে।''

অন্নদাশঙ্করের এই লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। তিনি লিখেছেন "নাটক সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা" সংগ্রহের জন্য তারা সুকান্তকে 'বিন্দুর ছেলে' নাটক দেখতে পাঠিয়েছিলেন। এখানে নাটক সম্বন্ধে ধারণা বলতে অন্নদাশঙ্কর নিশ্চয়ই নাটকের কলাকৌশল বোঝাতে চেয়েছেন। অমরা জানি এ সম্পর্কে সুকান্তর কেবল ধারণা নায় নাটক লেখার অভিজ্ঞতাও পূর্বেই ছিল। ১৯৪২ সালের ১৭ই অক্টোবর চট্টগ্রামের ফটিকা গ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের দল 'জাপানকে রুখতে হবে' এই নাটক অভিনয় করে। নাটকটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা। এর পিছনেও একটি ইতিহাস আছে। ঢাকায় সোমেন চন্দ নিহত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টায় পুরানো প্রগতি লেখক সংঘের কিছু সমর্থক এবং নতুনদের নিয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সূচনা হল ২৮শে মার্চ, ১৯৪২। এই সংঘের সাহিত্যিকরা কবে কি করতে পারবেন তার ওপর ভরসা না করে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' ১৯৪২ সালের ১৬ই মে তারিখে 'জাপ বিরোধী নাটিকা চাই' এই মর্মে এক ঘোষণায় ১০ টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল। সঙ্গে সঙ্গে জানানো হল, খোলা জায়গায়, অল্পদৃশ্যপট ও সাজসজ্জা নিয়ে যাত্রার মতো করে এক বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে অভিনয়যোগ্য তীব্র জাপবিরোধী নাটক হওয়া চাই। এক মাসের মধ্যে আশানুরূপ নাটিকা না পাওয়ায় 'জনযুদ্ধ' আবার নাটক জমা দেওয়ার তারিখ পরিবর্তন করে পুরস্কারের পরিমাণ ৩০ টাকা করে। ফলে এই সময়ে অনেক নাটক রচিত হয়েছিল, অবশ্য কোনটাই পুরস্কারযোগ্য হয়নি। সুকান্তের 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটকও সেই ঘোষণারই ফল। তাছাড়া 'অভিযান' নৃত্যনাট্য রচনার মূলে রবীন্দ্র প্রভাব বর্তমান। 'বিন্দুর ছেলে' রচনার সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

এই 'অভিযান' নাটকটি বোধ হয় প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে। আসলে সেদিন ওখানে কিশোর বাহিনীর সমাবেশ হয় এবং সমাবেশ শেষে বেলেঘাটার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এই নাটক অভিনয় করে।

জনযুদ্ধের পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় ১৯৪৩ সালের শুরুতেই কিশোর বাহিনী গড়ার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। কারণ ২৪শে মার্চ তারিখের জনযুদ্ধের রিপোর্টে ছিল 'ছেলের দল পিছিয়ে নেই'। সুকান্তর তার আগেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে গোলাম কুদ্দুসের সম্পাদনায় 'একসূত্রে' শীর্ষক একটি সংকলন পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাতে বয়স্ক কবিদের লেখার সঙ্গে সুকান্তর 'মধ্যবিত্ত, ৪২' কবিতাটিও প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ 'জনযুদ্ধ' সম্পাদকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল, "ছোটদের জন্য লেখা চাই ও খবর চাই... দেশের কাজে আজ ছোট ছেলে মেয়েদের অবদান কম নয়। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সংগঠনের রূপ দিতে হইবে। তাদের সজীব মনে সত্যিকারের দেশপ্রেমের বীজ বপন করিতে হইবে।" ২৮শে এপ্রিল 'জনযুদ্ধ' বিশেষ সংখ্যায় সুকান্ত ভট্টচার্যের 'দরদী কিশোর' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর নামের সঙ্গে লেখা ছিল কিশোর বাহিনীর সভ্য। এমনি করে আমরা দেখতে পাই সুকান্ত ভট্টাচার্য কিশোর বাহিনীর নেতৃত্বে এবং 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রবেশলাভ করে। তারপর ১৯৪৩ সালের ৬ই অক্টোবর বিশেষ সংখ্যায় সুকান্তর ছোট গল্প 'কিশোরের স্বপ্ন' প্রকাশিত হয়েছে।

১৪ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কয়েক হাজার কিশোরের সমাবেশ হয়। সেখানে ঢাকা, হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন কিশোর বাহিনীর কাজের বিবরণী পড়া হয়। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. জোশী কিশোরদের কর্তব্য এবং একটি কিশোর পত্রিকা-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। সভার শেষে একটি নাটক অভিনীত হয়। তখন অনেক জায়গায় কিশোর বাহিনী নাটক অভিনয় করত। এগুলোর মধ্যে ছিল 'অভিযান', 'জাগো কিশোর' প্রভৃতি নাটক। সবগুলো সুকান্তর লেখা ছিল কিনা জানা যায় না।

১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ তারিখের 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'কিশোর বাহিনী শোন' এই শিরোনামায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের রচিত কিশোরদের উপযোগী গীতিনাট্য ও নাটকের বই 'অপরাজেয়' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। মূল্য আট আনা— এ বই প্রত্যেকের পড়া উচিত। চাঁদা তুলে দল বেঁধে এ বই কেনা ও কেনানো উচিত। এর আগেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথী' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি'কে একটি সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছিল। এ বছরেই সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৪৪ সালের মার্চের শেষের দিকে কলকাতায় দলাদলি ও গৃহ-বিবাদ বন্ধ করার এবং সর্বদলীয় মন্ত্রীত্ব কায়েম করার দাবীতে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশ হয়। ঐ সমাবেশের শেষে কিশোর বাহিনীর সভ্যরা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান' গীতিনাট্য অভিনয় করেন। ঐ সভার প্রথমে খ্যাতনামা কবি ও রবীন্দ্র-শিষ্য অমিয় চক্রবর্তী বলেন, ''ক্ষুধায় অন্ন আমার ঘরে হয়তো নাই, কিন্তু রাজভাণ্ডারে অথবা বণিকের ঘরে তো আছে। তাই শুধু হতাশার সুর গাইলে চলবে না। ক্ষুধার অন্ন চাই, বাঁচতে চাই, এই আশা ও আত্মবিশ্বাসের বাণীও আজকের সাহিত্যে ফুটে ওঠা চাই।'' সুকান্তের গীতিনাট্যের শেষে এ সত্যই জয়যুক্ত হয়েছে। প্রজাদের খাদ্য অপহরণকারী কোতোয়ালকে বন্দী করে প্রজাদের নেতা ইন্দ্রসেন ঘোষণা করেছে .

রাজার ওপর আর করব না নির্ভর—
আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর!

এই আশা ও আত্মবিশ্বাসের গভীর সুর ফুটে উঠেছে সুকান্তের প্রায় সমকালে লেখা দুটি গল্পে- 'ক্ষুধা' এবং 'দুর্বোধ্য'-এ। গল্প দুটি সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ২রা এপ্রিল এবং আঠাশে মে তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ দুটি গল্পের পটভূমি পাওয়া যাবে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত (২৬.৩.১৯৯৪৪) 'অনামীর' 'কথা প্রসঙ্গ'-এ। তিনি লিখেছেন, ''বুভুক্ষু পল্লী চোখের সামনে নেই। শহর থেকে চলতে একটু-আধটু যা চোখে পড়ে তাই যথেষ্ট। সকাল থেকে কন্ট্রোলের দোকানের কাছে নানান বয়সী মেয়ে, পুরুষ শিশু, বৃদ্ধ, সুদীর্ঘ সার বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভিজে, রোদে পোড়ে, ধুলো খায়, দাঁড়াবার জায়গা নিয়ে গালাগালি করে, চুলোচুলি করে— অবশেষে পয়সা দিয়ে ভাগের ভাগ চাল নিয়ে শান্ত দেহে ঘরে যায়, কেউ বা খালি হাতেই বাসায় ফেরে নিষ্ফল আক্রোশে কিংবা দুর্বোধ নৈরাশ্যে। ...ডাষ্টবিনে আজকাল আর উচ্ছিষ্টের দাক্ষিণ্য নেই। ...উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাজধানীর ফুটপাথের উপর রাত্তিরে কখন যে মরে পড়ে থাকে কে জানে।'' 'ক্ষুধা' গল্পে ক্ষুধার জ্বালায় বিপর্যস্ত মানুষের বিশেষ করে দুটি পরিবারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিন তিনটি মানুষকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যা করতে হয়েছে। কারণ, ''ক্ষুধা শোক মানে না, প্রেম মানে না, মানে

না পৃথিবীর যে কোন বিপর্যয়, সে আদিম, সে অনশ্বর,'' কিন্তু গল্পের এখানেই শেষ নয়, এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গল্পের নায়ক ক্ষুধার জ্বালায় লাইনবন্দী মানুষগুলোর সীমাহীন ধৈর্যের মধ্য দিয়ে চালের চেয়ে মহৎ কিছুকে যেন অনুভব করছে। এদের প্রয়োজন একটু চেতনার আগুন। কারণ এদের প্রতীক্ষা তো বিপ্লবের প্রতীক্ষা। 'দুর্বোধ্য' গল্পেও আছে এক অন্ধ ভিক্ষুকের তীক্ষ্ণ অনুভূতির মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণামে তাকে নিয়ে যাওয়ার ''কোমল হাত'' দুটোর হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। একদিন 'অন্ন চাই চাই, বস্ত্র চাই' শ্লোগান দেওয়া সমবেত মিছিলের হাজার হাজার মিলিত পদধ্বনি আর উন্মত্ত আওয়াজ ক্ষুধায়, অন্ধতায় অক্ষম সেই মানুষটিরও অবসন্ন প্রাণে রোমাঞ্চ আনে, এতো লোকের ক্ষুধার যন্ত্রণা যেন সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করে। অবশ্য এগোবার তার ক্ষমতা নেই, শীর্ণ দেহে লুটিয়ে পড়ে তবু রাতের অন্ধকারে নারী দেহের বিনিময়ে সংগৃহীত চাল সে অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে। দ্বিতীয় গল্পটিকে 'অরণি' পত্রিকা 'চিত্র' নামে প্রকাশ করলেও এর মধ্যে ছোট গল্পের প্রাণধর্ম তির্যকতা, ব্যঞ্জনাময়তা সবই বর্তমান। সুকান্ত অল্প বয়সেই গল্পে, কবিতায়, নাটকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন।

১৯৪৩ সালে সুকান্ত তার জ্যাঠতুত দাদাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন রাঁচি। সুকান্তের জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাঁচী থেকে লেখা বন্ধু অরুণকে সুকান্ত যে চিঠি দিয়েছিল তার থেকে মানুষ সুকান্তকে, কবি সুকান্তকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। এখানে আসবার আগে সুকান্ত যে অসম্ভব কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছিলেন তার উল্লেখ করেছি। তাঁর নিজের কথায় ''পরিবর্তনহীনভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয়'' করছিলেন। কিন্তু বন্ধুর থেকে মানসিক পরিপক্কতায় যে তিনি অনেক উঁচুতে তারও পরিচয় দিয়েছিলেন এ বছরের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের লেখা চিঠিতে। বন্ধুরা একটি হাতে লেখা পত্রিকা বার করছে জেনে তিনি লিখেছিলেন, ''হাতের লেখা পত্রিকা বার করবার মতো মনের অপরিপক্কতা তোর আজো আছে? কথাটা নীরস হলেও একথা বলবই যে, এই ধরনের 'খই ভাজায়' এই দুর্দিনে কাগজ ও সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।'' তিনি বন্ধুকে ''নানাভাবে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা''র জন্য উপদেশে দিয়েছেন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে লেখা চিঠিকে সবসময় আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। এসব লেখার মধ্য দিয়ে যাকে লেখা হয় তার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বক্তব্যগুলোকে গ্রহণ করা উচিত। দিন পনের পরেই লেখা চিঠি থেকে জানা যায় অরুণাচল 'ত্রিদিব' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় অরুণাচল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও তার মতের সঙ্গে সুকান্তের মতের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পত্রিকা সম্পর্কে সুকান্ত লিখেছেন, ''তোদের (খুড়ি) আমাদের 'ত্রিদিব' সম্বন্ধে একটা বড় সত্য অনুমান করছি যে, আমরা এই পাপ-দুঃখ-কষ্ট আকীর্ণ ধরণীর নগণ্য লোক কর্মদোষে 'ত্রিদিবে'র দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সঙ্গ লাভের পুণ্যে হয়তো পাপস্খলন হবে''... আবার একই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ''ত্রিদিবে'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা গভীর হল যশোহরের সঙ্কীর্ণতা থেকে সারা বাংলাদেশেই এর পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ দেখে। পত্রিকাটি নতুন লেখক ও শিল্পীদের প্রাণরসে পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়ে একদিন সারা বাংলার ক্ষুধা মেটানোর জন্যে পরিবেশিত হবে, সূচনা দেখে এ অনুমান করা খুব সম্ভবত আমার অদূরদর্শিতায় পর্যবসিত হবে না। সুকান্তের এই মনোভাবের

পরিপ্রেক্ষিতেই "পরিবর্তনহীনভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয়" কথাটা বিবেচ্য। এই সময়কার রচনা তাঁর 'আহ্নিক' কবিতাটা কবি নিজেই কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলেন।

যাই হোক, এরপর রাঁচি যাওয়ার নতুন পটভূমিকায় সুকান্তর এক নতুন নিসর্গ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সুকান্ত লিখেছেন, "অনেক ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে অনেক অবিশ্বাস আর অসম্ভবকে অগ্রাহ্য করে শেষে সত্যিই রাঁচি এসে পৌঁছেছি।" আসার পথে পূর্ণিমার অস্পষ্ট আলোয় স্তব্ধ গভীর বরাকর নদী আর গোমো স্টেশন তাঁর ভালো লেগেছিল। সুকান্ত লিখেছেন, "বরাকর নদীর এক পাশে বাঙলা, অপর পাশে বিহার আর তার মধ্যে স্বয়ংস্ফূর্ত বরাকর ; কী অদ্ভুত, কী গম্ভীর! আর কোনো নদী (বোধ হয়, গঙ্গাও না) আমার চোখে এত মোহ বিস্তার করতে পারেনি।

আর ভালো লেগেছিল গোমো স্টেশন। সেখানে ট্রেন বদল করার জন্যে শেষ রাতটা কাটাতে হয়েছিল। পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা সেখানে উপলব্ধি করেছি। স্তব্ধ স্টেশনে সেই রাত আমার কাছে তার এক অস্ফুট সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে রইল চিরকাল।"

তাছাড়া রাঁচি রোড ধরে বিপুল বেগে ধাবমান বাসে যেতে তাঁর মনে হয়েছিল : "হাজার হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চলতে চলতে আবেগে উছলে উঠেছি আর ভাবছি এ দৃশ্য কেবল আমিই দেখলুম ; এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করল!"

তারপর সুকান্তরা থাকতেন রাঁচি থেকে একটু দূরে ডুরাণ্ডায়। তাঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রবাহিত ছিল ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখা নদী। তার কূলে ছিল একটা গোরস্থান। যাকে দেখতে দেখতে সুকান্ত আত্মহারা হয়ে পড়তেন। "সেই গোরস্থানে একটা বটগাছ আছে, সেটা শুধু আমার নয়, এখানকার সকলেরই প্রিয়। সেই বটগাছের ওপরে এবং তলায় আমার কয়েকটি বিশিষ্ট দুপুর কেটেছে।"

সবচেয়ে সুকান্তর ভালো লেগেছিল 'জোনহা প্রপাত'। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি থেকে ২৮ মাইল দূরে 'জোনহা প্রপাত' দেখতে বেরুলাম। ট্রেনে চাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বৃষ্টি নামল এবং ট্রেনে বৃষ্টির আনন্দ আমার এই প্রথম। দুধারে পাহাড় বন ঝাপসা করে, অনেক জলধারার সৃষ্টি করে বৃষ্টি আমাদের রোমাঞ্চিত করল।

কিন্তু আরও আনন্দ বাকি ছিল— প্রতীক্ষা করে ছিল আমাদের জন্য জোনহা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। বৃষ্টিতে ভিজে অনেক পথ হাঁটার পর সেই পাহাড়ের শিখর দেশে এক বৌদ্ধ-মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ...সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশি। আমরা তাই মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে। —গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করল। এতদিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক দৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় হিসেবে দেখা দিল। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটি কবিতা না লিখে পারল না। (পরে কবিতাটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি) ...জোনহা যে দেখেছে, তার ছোটনাগপুরে আসা সার্থক। যদিও হুড্রু খুব বিখ্যাত প্রপাত, কিন্তু হুড্রুতে 'প্রপাত' দর্শনের এবং উপভোগের এত বেশি সুবিধা নেই— একথা জোর করেই বলব। ...জোনহা সবসময়েই এত সুন্দর, এত উপভোগ্য, তা নয় ; এমন কি আমরা যদি তার আগের দিনও পৌঁছতাম তাহলেও এ-দৃশ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম নিশ্চিত।

জোনহা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে-আছড়ে

ফেলতে লাগল কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগল আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। প্রহরীর মতো জেগে রইল ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়ে।

পরদিন আর একবার দেখলাম রহস্যময়ী জোনহাকে। তার সেই উচ্ছল রূপের প্রতি জানালাম আমার গভীরতম ভালবাসা। তারপর ধীরে ধীরে চলে এলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও।... ফেরার সময় মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, আমাদের এই যাত্রা যেন অনন্ত হয়। কিন্তু পথও ফুরাল, আর আমরাও জোনহাকে ফেলে, সেই আশ্রয়দাতা বুদ্ধমন্দিরকে ফেলে রাঁচি চলে এলাম। এ থেকে বুঝলাম, কোন কিছুর আসাটাই স্বপ্ন--আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব। খুব কম জিনিসই কাছে আসে ; কিন্তু যায় প্রায় সবকিছুই। জোনহাই তার বড় প্রমাণ।''

সুকান্তের ১৯৪৩ সালের লেখা সুকান্তের কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল : বিবৃতি, চট্টগ্রাম ১৯৪৩, শত্রু এক, উদ্বীক্ষণ, মণিপুর, বৈশম্পায়ণ, নিভৃত, রোম ১৯৪৩ প্রভৃতি। এ বছরের শেষের দিকে সুকান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২২.১২.৪৩ তারিখে লেখা (অরুণকে) চিঠি থেকে তাই মনে হয়। তিনি লিখেছেন, ''আমি এখনও এখানেই (শ্যামবাজার, কলকাতা) আছি। অথচ 'আমি কেমন আছি' এই খবরটা নেবার যে তোর দরকার হয় না, এইটেই আমাকে বিস্মিত করেছে।'' অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের লেখা থেকে জানা যায়, ''সুকান্তের স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভালো ছিল না। ম্যালেরিয়াতে মাঝে মাঝেই ভুগত।'' টাকা পয়সার অভাব ওর বরাবর ছিল। ঐ চিঠিতেই সুকান্ত বন্ধু 'অরুণ'কে লিখেছেন ২২.১২.৪৩-এ ৪টার মধ্যে তাঁর কাছে যেতে। উদ্দেশ্য Govt. Art School-এ Exhibition দেখতে যাওয়া। সেজন্য বন্ধুকে অনুরোধ করেছেন ''দেখতে যাবার মত গাড়িভাড়াও আনিস।''

১৯৪৪ সালে মন্বন্তরের দাপট কমে গেলে শুরু হোল পুনর্বাসনের পালা। কৃষকরা গ্রামে ফিরে যাতে নিজের বাড়িজমি ফিরে পেতে পারে, নতুন ফসল ফলিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে তার জন্যও কমিউনিস্ট কর্মীরা তখন প্রচুর পরিশ্রম করেছিল। তারই আভাস পাওয়া যাবে সুকান্তর 'ফসলের ডাক : ১৩৫১', 'কৃষকের গান', 'এই নবান্নে' প্রভৃতি কবিতায়।

সুকান্তর জীবনকে তৎকালীন গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুকান্তও কোনদিন সেভাবে ভাবেন নি। তাছাড়া সুকান্ত ছিল পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। কিশোর আন্দোলনের নেতা। কিশোরবাহিনীর কর্মসচিব হিসেবে প্রতিদিন অনেক কাজ করতে হতো। সভ্যদের চিঠিপত্রের উত্তর লিখতে হতো। সুকান্ত যে তখন কী ধরনের ব্যস্ততায় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বন্ধুর কাছে লেখা চিঠি থেকে। বন্ধুর ওখানে না যাওয়ার কৈফিয়ত হিসেবে তিনি কারণ দেখিয়েছেন :

(১) কিশোর বাহিনীর দুধের নতুন আন্দোলন শুরু হল। (১৪ই জুনের 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য)।

(২) ১৫ই জুন A. I. S. F Conf.

(৩) কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয়নি। ছাপাব।

(৪) ১৬ই জুন I P. T. A-এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।

(৫) ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরি মিটিং।

(৬) কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ সপ্তাহে লিখতে হবে।

(৭) ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।

(৮) এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

অতি ব্যস্ততার জন্য সুকান্ত এ চিঠিতে কোন তারিখ বা স্বাক্ষর দিতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়াও পারিবারিক ব্যস্ততা ছিল। ১৯৪৪-এর জুন মাসে সুকান্তের অগ্রজ সুশীলের বিয়ে হল। কিন্তু 'সুকান্ত-সমগ্র' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বন্ধু 'অরুণ'কে তিনি যে চিঠি দিয়েছেন তার তারিখ '৪.৪.৪৩'। মনে হয় এই তারিখটি মুদ্রণত্রুটি। যাইহোক , অগ্রজের এই বিবাহ উপলক্ষে নববধূকে উদ্দেশ্য করে সুকান্ত একটি কবিতা লিখেছিল। অরুণাচল বসু এবং সরলা বসু তাঁদের 'কবি কিশোর সুকান্ত' বইতে তা উদ্ধৃত করেছেন। এই কবিতার মধ্যে তখন ঘরে বাইরে এবং সুকান্তের মনেরও একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

এ শহর নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রদীপ আমাদের ঘর
জমেছে উদাস ধুলো অনাদৃত বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া
তাই তো এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।
বাঁচার আতঙ্ক স্পষ্ট, দারিদ্র্য অনবগুণ্ঠিত
সন্ত্রস্ত ফুলের গন্ধ, এখানে চাঁদও কুণ্ঠিত।
বুভুক্ষায় পিষ্ট আশা, তিরোহিত নিষ্ফল নিঃশ্বাসও।
একটি প্রদীপ এনো এখানে কখনো যদি আসো,
শুরু হবে অন্ধকারে সে আলোয় প্রাথমিক চেনা
রাত্রি শেষে সে-প্রদীপ অবশেষে সূর্য কি হবে না?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্ল্যাক আউটের কলকাতা, মাতৃহীন তাদের সংসার, কবি মনে আলোর আকুতি অনুকূল পরিবেশে বসন্তের কামনা সুকান্তের গাঢ় অনুভবে একটি সুন্দর গীতি কবিতা হয়ে উঠেছে। অরুণাচলকে লেখা চিঠিতে সুকান্তের মনের খবরও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "বিয়ের দিন সকাল বেলায় তোর চিঠি পেলাম। তোর কথামত শুধু বিশ্বনাথকে 'জনযুদ্ধ' দেওয়ার সুযোগ পেলাম না বিয়ের কাজের চাপে। অন্য অনুরোধগুলো রাখবার চেষ্টা করব।

এই চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় বিয়ে এবং বিয়েও হয়ে গেল দুদিন হল। আজ ফুলশয্যা। বিয়েটা আমার ভাল লাগেনি, বরং খুব নিরানন্দেই কেটেছে বিশেষ করে আদর এবং সম্মান পাওয়ায় অভ্যস্ত আমি, মোটেই সম্মান পাইনি কোথাও, ভাঁড়ের মত আমার অবস্থা।

...আমার ডান পাশে খাটের ওপর ঘুমিয়ে নববধূ। মেঝেতে মেজবৌদি এবং ভূপেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। এই আবহাওয়ায় লেখা খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন বিয়ের জন্যে পার্টির কাজের কামাই হয়ে গেল।" এর মধ্যে একটুকু সান্ত্বনা বিয়ে উপলক্ষে সুকান্তর ভালবাসার মেয়েটি এসেছিল। যার নম্রতায় কবি মুগ্ধ। উপরোক্ত চিঠির বোধ হয় কয়েকদিন পরেই এক তারিখবিহীন লেখায় সুকান্ত নিজের মনোভাবের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন। "কবিতা পাঠালুম। ... আমার সাম্প্রতিক মনোভাব শোচনীয়। অবস্থাটা কবিতায় বলি :

কেবল আঘাত দেয় মূর্খ চতুর্দিক,
তবুও এখনো আমি নিষ্ক্রিয় নির্ভীক,

ভারাক্রান্ত মন আজ অবিশ্রান্ত যায়,
তবু নিকটস্থ ফুল সুগন্ধে মাতায়।"

... এ বছরের শেষের দিকে (অক্টোবরে) রাখালবাবুদের পরিবারের সঙ্গে সুকান্ত বেনারস গিয়েছিলেন। সেখানে যাবার "পঞ্চম দিনেই" সুকান্ত ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েছিলেন। তার উল্লেখ আছে অরুণাচলকে লেখা ২৮/১০/৪৪ তারিখের চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, "এখানে আসার পঞ্চম দিনে তারই কবলে পড়ে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করবার পথে-- তাই এতদিন চিঠি দিইনি। আজ অন্ন গ্রহণ করলুম। ...দুদিন মাত্র সুযোগ পেয়েছিলাম কাশী দেখবার তাতেই অনেকখানি দেখে নিয়েছি। কাশী ভাল লাগছে না : অনেকদিন পর ফিরে পাওয়া তামার পয়সার মত ম্লান লাগছে। আর শরীর এখন খুবই দুর্বল, কারণ এ-কদিন সাংঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট করেই লিখতে হচ্ছে। আর লিখতে পারছিনা।"

এর পরেও তিনি আবার অসুখে পড়েছিলেন তার উল্লেখ আছে ২০/১১/৪৪ তারিখের চিঠিতে। বারবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে সুকান্তের শরীর খুবই ক্লান্ত। তাই বেলেঘাটায় ফিরে যাবার কথায় তিনি আশঙ্কিত। তিনি লিখেছেন, "বেলেঘাটাই এখন ম্যালেরিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর আমি ম্যালেরিয়ার রোগী হয়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি? বিশেষত আমি যখন ম্যালেরিয়া-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে আর রাজী নই।" কাশীর ঐতিহাসিক স্থান এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছু সুকান্তের ভাল লাগেনি। "কাশীর প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভাল লেগেছে "কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধ-ঘটনাজড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত observatory মানমন্দির। অবিশ্যি বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ। কাশীর গঙ্গা এবং উপাসনার মত স্তব্ধ তার শ্যামল পরপার, এ দুটোই উপভোগ্য। কাশী শহর হিসেবে খুব বড় সন্দেহ নেই ; বিশেষত আজকের দিনে আলো-ঝলমল শহর হিসেবে। অর্থাৎ এখানে 'ব্লাক-আউট' নেই। আর পথে পথে এখানে দেখা যায় লোকের ভিড় কলকাতার মতই।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ছাত্রনিবাসমূলক' বিশ্ববিদ্যালয়। আর দেখলাম গান্ধীজি পরিকল্পিত ভারতমাতার মন্দির। দুটোতেই ভাল লাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও ধর্মের লেবেল আঁটা বলে বিশেষ ভাল লাগল না। আর সবচেয়ে ভাল লাগল সারনাথ। তার ঐতিহাসিকতায়, তার নির্জনতায়, তার স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তার ইটপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমাময়।"

বেনারস থেকে ফিরে এসে সুকান্ত বোধহয় জ্যাঠতুতো দাদার বাড়িতেই ছিলেন। অবশ্য তখন মনোমোহনবাবুও শ্যামবাজারের দিকে নিজেদের বাসা বদল করেছেন। বেনারস থেকে ফেরার পরেও একবার অসুখে পড়েছিলেন। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর কথায় "এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য আমার দুশ্চিন্তা ও অবহেলার সীমা নেই, যদিচ তোড়জোড় করছি খুব।" এই পরীক্ষা সুকান্তের জীবনে সত্যি ছিল এক দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা। সুকান্তর স্বপ্ন ছিল তিনি বাংলার অধ্যাপক হবেন। কিন্তু তার দুঃখ তিনি তা কোনদিনই হতে পারবেন না। কারণ ম্যাট্রিক পাশ করাই সম্ভব হোল না তার জীবনে। দু'দুবার তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করলেন। অঙ্কে তিনি ছিলেন কাঁচা।

একবার তো মোটে পাঁচ পেয়েছিলেন। বছর দুই পরে অসুস্থ অবস্থায় তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন অঙ্ক ছাড়াই জুনিয়ার কেমব্রিজে, সিনিয়ার কেমব্রিজে পড়া যায় তখন তিনি তা পড়ার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন।

সুকান্ত-র এসব ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও পার্টির প্রতি কোন উপেক্ষা ছিল না। আর কবি বলে তিনি যে কেবল কল্পনাবিলাসী, নির্জনতাপ্রিয় হবেন তাও ঠিক নয়। সুকান্ত নিজের কবিসত্তাকে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম করে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্য-সাধনায় সেটাই বড় কথা। ১৩৫১ সালে তাঁর মেজবৌদিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি সেকথা স্পষ্ট করে লিখেছেন, "আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।" সুকান্তের জীবন, তাঁর কাব্যচর্চা তাঁর এই উক্তিকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে তুলেছিল।

১৯৪৪ সালে সুকান্তের যে সব কবিতা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল—কৃষকের গান, এই নবান্নে, হে মহাজীবন, চিরদিনের, নিভৃত, আঠারো বছর বয়স প্রভৃতি। সুকান্ত এখন আঠার বছর বয়সের যুবক। তাঁর কাব্যের ভাষায় :

এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে। (আঠার বছর বয়স)

নানা দুর্যোগ আর ঝড়ের মধ্য দিয়ে দেশ ও সমাজের সঙ্গে সুকান্তও এগিয়ে চলেছেন আগামী দিনের দিকে। যেখানে তিনি উপলব্ধি করেছেন, 'প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা'। ক্ষুধার্ত পীড়িত ও অত্যাচারিত শোষিত সমাজে কাব্যের সোনালী মড়কে সাধাবণ মানুষের কোন হিতসাধন হবে না, সাহিত্যকে যদি সাধারণ মানুষের প্রকাশ-মাধ্যম করতে হয় তাহলে তার প্রকরণ রীতিকে জীবনের ন্যায় কঠোর কঠিন গদ্যের সমধর্মী করে তুলতে হবে।

১৯৪৪ সালের মে মাসে স্বাস্থ্যের কারণে গান্ধীজিকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্টের প্রস্তাবকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। তবু ১৯৪৫ সালের জুন মাসের পূর্বে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার কোন পথ খুলল না। তারপর বর্ণহিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সমতা এনে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা যায় কিনা সে সর্ম্পকে 'সিমলা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হোল। সেই আলোচনা বৈঠকও ব্যর্থ হয়েছিল।

সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হোল ১৯৪৫ সনের জুন মাসে। তার পূর্বেই বার্লিনের পতন হয়েছে এবং হিটলার আত্মহত্যা করেছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে অবশ্য যুদ্ধ আরো কিছুদিন চলেছিল। তাও শেষ হোল ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির যৌথ প্রচেষ্টায় ফ্যাসিবাদ ও পররাজ্য লোলুপতার প্রতিক্রিয়াশলী শক্তির বিরুদ্ধে সম্ভব হলো এক ঐতিহাসিক বিজয় সাফল্য।" ফ্যাসিবাদের পিছু হঠার সঙ্গে সঙ্গে বহুদেশে গণতান্ত্রিক শক্তি স্বাধীনতা-সংগ্রামে এগিয়ে এসে নিজেদের দেশকে শোষণমুক্ত করে নিল। ইয়াল্‌টা সম্মেলনে তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে যৌথ স্বীকৃতি জানাবার

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কেবল ফ্যাসিবাদেরই কবর রচনা করেনি, ধনতন্ত্রের ওপরেও তীব্র আঘাত হেনে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সফল বিক্ষোভ দেখা দিল।

ভারতবর্ষও পেছনে রইল না। অন্যান্য দেশের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলন আবার দুর্বার হয়ে ওঠে। ইংলন্ডের নির্বাচনে লেবর পার্টির জয়লাভে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আশা আরো উজ্জীবিত হোল। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলতে লাগল। হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষিত হোল। পূর্ব এবং পূর্ব-প্রাচ্যের আন্দোলনের প্রবল ঢেউ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করল।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালেই এক বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হন, (অবশ্য তাঁর মৃত্যু নিয়ে এখনো অনেক ধোঁয়াটে সন্দেহ আছে) ; কিন্তু তাঁর আজাদহিন্দের সৈন্যবাহিনী দেশে ফিরে এসে এক বিচারের সম্মুখীন হোল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তখন চরমে। স্বভাবতই ব্রিটিশ বিচারের সম্মুখীন এই সৈন্যদলও তখনকার জনচিত্তে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ বলে মনে হোল। আজাদহিন্দ ফৌজের এই বন্দীদের মুক্তির দাবীতে, দেশের দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বন্দী-মুক্তির দাবীতে কলকাতার ছাত্র-আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে। তখন প্রায় দিনই স্কুলে কলেজে ধর্মঘট হোত। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হোত। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হোত। রক্তাক্ত এই বিক্ষোভ প্রথম চরমাকার ধারণ করল ২১ শে নভেম্বর, ১৯৪৫। বর্তমান সুবোধ মুল্লিক স্কোয়ারের পাশে ধর্মতলার মোড়ে আজাদহিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে বিরাট ছাত্র মিছিল পুলিশ আটকে দিল। ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিল অবস্থান ধর্মঘটের। সারা কলকাতা জুড়ে সে এক বিরাট উন্মাদনা। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল তবু জমায়েতের সংখ্যা কমল না। বরং চারদিকে অবরোধের কথা ছড়িয়ে পড়ায় সান্ধ্য কলেজের ছাত্ররা এসে জড়ো হোল। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমায়েতের সংখ্যা যেন বেড়ে গেল। সারারাত ধরে ছাত্ররা সেখানে বসে রইল। মাঝে মাঝে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশী প্ররোচনা চলল। তাতেও যখন কোন কাজ হোল না তখন পুলিশ গুলি চালাল। শহীদ হোল রামেশ্বর। তবু ছাত্রদের মনোবল ভাঙল না। পরদিন বিকেলে পুলিশী অবরোধ উঠল এবং তিনলক্ষ লোকের দৃপ্ত মিছিলে রক্তের বিনিময়ে জয়যাত্রা ঘোষিত হোল।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই একই রকম ঘটনা ঘটতে লাগল। কেবল বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ কেবল ছাত্র যুবকের মনে নয়, এই বিক্ষোভ দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য শিবিরেও। ১৯৪৬ সালে বিমান বাহিনীতে ধর্মঘট দেখা দিল। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসে এল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টিকারী নৌ-বিদ্রোহ। এই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাইয়ে সামিল হোল কলকারখানার শ্রমিকরা এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ২২শে ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রাস্তার মানুষ এবং সৈন্যদল একসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

কলকাতার রাস্তায়ও সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল। ছাত্র সমাজ উপযুক্ত প্রতিবাদের মাধ্যমে নৌ-দিবস এবং রসিদ আলি দিবস পালন করে। সেদিনও আরেকটি ছাত্র শহীদ হোল, তার নাম আবদুস সালাম। এই গুলি চালনা এবং ছাত্র হত্যাকে বাংলা দেশের ছাত্র সমাজ

সহজে হজম করেনি। কলকাতার পথে পথে, বস্তিতে বস্তিতে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে ছাত্র যুব সাধারণ মানুষ একসঙ্গে পথ-যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। এ ছাড়াও তখন উপলক্ষ ছিল ইন্দোচীনে ফরাসী সরকারের নির্মম অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। সব মিলিয়ে তখন এক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। অবস্থা বেগতিক বুঝে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠিয়ে দিল। এ সম্পর্কে একজন ইংরেজ P. G. Griffiths লন্ডনে ইস্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেবার সময় সঠিক কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "India in the opinion of many was on the verge of a revolution before the British Cabinet Mission arrived. The Cabinet Mission has at least postponed if not eliminated the danger" (India To-day গ্রন্থে উদ্ধৃত)

একথা সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডেও স্বীকৃত হয়েছে:

Towards the close of 1945 and early in 1946 anti-imperialist and anti-feudal actions of the peasants grew in number. The growing revolutionary crisis and the prospect of the nation as a whole being drawn into the struggle were clear enough evidence that Great Britain was no longer able to exercise complete sway over India." .

কেবল ব্রিটিশ সরকার নয়, ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও জনসাধারণের এই বিপ্লবীমূর্তি দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল। সর্দার প্যাটেলের পরামর্শে নৌ-বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে হোল। বিপ্লবী আন্দোলনের এই স্বরূপকে তারা অস্বীকার করল। ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য ভিক্ষা করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভাগীকরণ স্বীকার করে নিল।

'জনতার কবি' সুকান্ত গণ-আন্দোলনের দর্শক ছিলেন না। খবরের কাগজের পাতা থেকে তিনি তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞানকে উত্তপ্ত করেননি। তিনি ছিলেন এই গণ-আন্দোলনের অন্যতম শরিক ; শহীদ রামেশ্বর আর আবদুস সালামের পাশে পাশে কলকাতার ছাত্রদের পথ-যুদ্ধের একজন সৈনিক এবং চারণ কবি। "তাই তাঁর লেখায় এই বিপ্লবী মেজাজ, বিদ্রোহের সুর, তাই তাঁর কবিতার ভাষায় ও ছন্দে এত আগুনের ফুলকি।" সেই বিদ্রোহ মিছিল চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছিল ১৯৪৬ সালে সারা ভারত ডাক-তার ধর্মঘট উপলক্ষ্যে ২৯ শে জুলাই-এর সারা বাংলা-বন্ধ হরতালে। সর্বস্তরের মানুষ, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যোগ দিল ঐ হরতালে। জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত শিল্পীরাও সেদিন হরতালকে সফল করার জন্য এগিয়ে এলেন। আকাশবাণীতে—তখনকার অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে শিল্পীরা ধর্মঘট করলেন। সেদিনের ভাষা পাওয়া যায় একমাত্র সুকান্ত ভট্টাচার্যেরই কবিতায়:

নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত,
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি।

তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে।। (অনুভব)

সুকান্তর প্রায় সব বিখ্যাত কবিতাই এ সমযকাব লেখা। খবর, ইউরোপের উদ্দেশে, প্রস্তুত, অনুভব, বিক্ষোভ, ১লা মে-র কবিতা '৪৬, দিন বদলের পালা প্রভৃতি কবিতা এই সময়কার লেখা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' হয়ে গেল 'স্বাধীনতা'। তবে এবার আর সাপ্তাহিক পত্রিকা নয়। অনেক দিন থেকেই একটি দৈনিক পত্রিকার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখন সম্পাদক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। তাতে 'কিশোর সভা' নামে একটি বিভাগ থাকে। এই কিশোর সভার সম্পাদনা প্রথমে শুরু করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায। পরে কিশোর বাহিনীর পবিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-সভার পরিচালনার দায়িত্বও সুকান্ত ভট্টাচার্য গ্রহণ করেন। তখন থেকে সুকান্তর একটা নতুন পরিচয় হোল সাংবাদিক সুকান্ত। সাধারণ মানুষ যখন মধ্যরাত্রে নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন সংবাদপত্রের কর্মীরা আর প্রেসের কম্পোজিটররা বিনিদ্র চোখে ভোরবেলাকার কাগজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে। সুকান্তর সেই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে 'খবর' কবিতায়। কাজের মধ্যেই হোত সুকান্তর কবিতার জন্ম ও প্রকাশ।

নভেম্বরের রক্তাক্ত দিনগুলোর পরে ১৯৪৫-এর ডিসেম্বব মাসে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন হোল চট্টগ্রামে। বিরাট এক ছাত্র প্রতিনিধি দল গেল কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে। সেই দলে ছিলেন ভারতীয় ছাত্রনেতা সত্যপাল ডাঙ্গ এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরে জাহাজে করে যেতে হয়। এই যাত্রা খুব সুন্দর। "কেউ গল্প করছে, কেউ ডেকে দাঁড়িয়ে পদ্মার শোভা দেখছে। আর সুকান্ত একমনে কবিতা লিখছে সম্মেলনের জন্য।" সুকান্তর 'ঠিকানা' কবিতা পাঠ দিয়েই সম্মেলন শুরু হয়েছিল। সুকান্ত সেদিন সোচ্চারে আত্ম-ঘোষণায় বলেছিলেন :

জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এ দেশে রক্তের অক্ষরে।

সুকান্ত তাঁর কবিসত্তাকে এই বিপ্লবের রক্তাক্ত পথেই ফুল ফোটাবার কাজে নিয়োজিত করেছেন। সুকান্তর ঐ আত্ম-ঘোষণার পরেই এল কলকাতার বুকে, বোম্বাইয়ের বুকে, সারা দেশ জুড়ে সেই রসিদ আলি দিবস আর নৌ-বিদ্রোহের ঝড়ের দিনগুলো। ক্যাবিনেট মিশন আসবার পরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ আপোষ আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে আসে। তারপর কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘকাল দরে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশন তাদের পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় তারা বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রের

হাতে মাত্র তিনটি বিষয় রেখেছিলেন— প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার এবং যোগাযোগ। বাকী বিষয় থাকবে রাজ্যের হাতে। ফলে রাজ্যগুলো লাভ করবে স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা। তারা দেশকে এমনভাবে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করার সুপারিশ করলেন যাতে সংখ্যালঘুদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগে। তারা কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যাগুরু হয়ে উঠতে পারবে। মূলত এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের আদর্শে রচিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসিত রাজ্যের জন্য দাবী করে আসছিল। প্রথম প্রথম আপত্তি করলেও জিন্নাও শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন স্পষ্ট করেই বলল তারা কিছুতেই দেশ বিভাগ মেনে নিতে পারে না। কংগ্রেস লীগ উভয়েই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ লিখেছেন, "The acceptance of the Cabinct Mission Plan by both Congress and Muslim league was a glorious event in the history of the freedom movement in India." (India Wins Freedom) পরবর্তীকালে এই প্ল্যান ভেস্তে গেল মাউন্টবেটেন আসার পর। সাধারণ মানুষ এত কথা জানত না। জুনের শেষে ক্যাবিনেট মিশন চলে গেল। জুলাই মাসে জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেস সভাপতি হবার পরেই জল ঘোলা হতে থাকল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগ করার জন্য তাদের দাবার ছক ঠিক করে ফেলেছিল। সেটা টের পাওয়া গেল অনেক পরে। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব দিয়ে গেল Constituent Assembly এবং অস্থায়ী সরকারের। কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি দেখা গেল। বড়লাট জওহরলালকে অস্থায়ী সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ করলেন ১২ই আগস্ট। মুসলীম লীগও শেষ পর্যন্ত এই সরকারে যোগ দিল। স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়নের জন্য Constituent Assembly-ও গঠিত হোল। তাসত্ত্বেও দেশ ভাগ হযে গেল। সে পরের কথা। দেশের মধ্যে তখন অগ্নিগর্ভ অবস্থা।

কলকাতার ছাত্রসমাজ চুপ করে রইল না। বন্দীমুক্তি আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্র-কর্মীদের এক বিরাট সভা হয়। এ সম্পর্কে তখনকার অন্যতম ছাত্র-নেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "কেন জানি না, কারুব বক্তৃতাই সেদিনের ভিজে বারুদে অগ্নিসংযোগ করতেপারছিল না।" হঠাৎ সেখানে পড়া হোল সুকান্তের কবিতা 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' :

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।

ওদের মুক্ত করে আনবার দায়িত্ব নিতে হবে আজকের মানুষের। সুকান্তের কবিতার আগ্নেয় ঘোষণায় ঘোষিত হোল তখনকার মানুষের মনের কথা :

শোনো, পৃথিবীর মানুষেরা শোনো।
শোনো স্বদেশের ভাই,

রক্তের বিনিময়ে হয় হোক
আমরা ওদের চাই।।

"সমস্ত হল ফেটে পড়ল বজ্রধ্বনিতে—আমরা ওদের চাই .সেই বজ্র ঘোষণা হাজার হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হোল বিধান পরিষদের গেটে সম্ভবত ১৯৪৬ সালের ২৪শে জুলাই। পর পরই এল ২৯শে জুলাইয়ের সেই বিরাট বিক্ষোভেব দিন। সারা ভারত ধর্মঘটী ডাক তার কর্মিদেব সমর্থনে সর্বাত্মক সফল হরতাল। কিন্তু তারপর? বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন চরম সীমায় উন্নীত, ঘটনা যখন দ্রুত পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশের বুকে, ভারতের ইতিহাসে নেমে এল ভয়ঙ্কর দুর্দিন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগ সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবীতে ঘোষণা কবল "ডাইরেক্ট অ্যাকশন"। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ আন্দোলন গেল না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। গেল প্রতিবেশী হিন্দুর বিরুদ্ধে। হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অংশও গর্জে উঠল ডাইরেক্ট অ্যাকশনেব বিরুদ্ধে। প্রতিক্রিয়ার চরম চক্রান্ত সার্থক হোল। ভাইয়ের বুকে ভাই প্রত্যক্ষ ছুরি মেরে চলল প্রত্যক্ষ দিবালোকে। সেই বীভৎসতম সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা চলল গোটা এক বছর ধরে। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের নেতারা দূবে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সেই বীভৎস দৃশ্য আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মুখে দেখা গেল তীব্র ব্যঙ্গেব হাসি।

দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা শহরের মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন সুকান্ত 'সেপ্টেম্বর '৪৬', 'দেওয়ালী', 'চরমপত্র', 'ঐতিহাসিক', 'শত্রু এক', 'মুক্ত বীরদের প্রতি', 'একুশে নভেম্বর ঃ ১৯৪৬', 'ডাক' প্রভৃতি কবিতায়। ভ্রাতৃঘাতী রক্তের কলঙ্কে কলকাতা শহর মূর্চ্ছিত। জনবহুল কলকাতার রাস্তাঘাট জনহীন। ট্রাম নেই, বাস নেই, ভয়ে ভয়ে দোকান পাট খোলে আর বন্ধ হয়। পথিকেরা ভযে ভয়ে দুরু দুরু বুকে ত্রস্ত পদে দ্রুত চলে যায়। শহরে কেবল আতঙ্ক আর গুজব .

সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো।
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে
চুপ করে সভয়ে নির্জনে।
মাঝে মাঝে শব্দ হয় ঃ
মিলিটারী লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদম্ভ আক্রোশে। (সেপ্টেম্বর '৪৬)

রাত্রির রূপ আরো ভয়ঙ্কর। মাঝে মাঝে চিৎকার রাতের স্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে যায় আর ভীত শঙ্কিত মানুষ উৎকর্ণ অপেক্ষা করে কখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। কবি সুকান্ত জানতেন এ নির্মম ঘটনা প্রত্যক্ষ সত্য হলেও ইতিহাস চেতনায় এ এক দুর্ঘটনা। ছেচল্লিশের এই ক্লেদাক্ত দিনগুলো বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে সত্য হতে পারে না। কবি সুকান্ত তাঁর কবিতায় সেই সত্যকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। :

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,

আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবাবের মতো মুছে যাক ইতিহাসে।। (ঐ)

শুধু কলকাতা নয়। এ দাঙ্গা ছড়ায় সর্বত্র। এ দাঙ্গায় "কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী, সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা।" কবি সুকান্ত এই অন্ধকার রাতেই বিপ্লবের দেওয়ালীকে প্রত্যক্ষ করেছেন :

এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে। (দেওয়ালী)।

কবি সুকান্তের জীবনেও ঘনিয়ে এল অন্ধকাব। তার অসুস্থ শরীর ভেঙে পড়ল। এমনিতেই ছিল ওর দুর্বল শরীর। তার উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম। সুকান্ত প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এবারে কিন্তু বেশি রকম অসুস্থ হযে পড়লেন। সুকান্তের সঙ্গে বরাবরই অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব বেশি। অন্নদাশঙ্কর তার এই সময়কার স্মৃতিচারণায় বলেছেন, "বেশ কিছুদিন খবর নেই। পরে শুনলাম অসুস্থ। গিয়ে হাজির হলাম ওদের বেলেঘাটার বাসায়। তখন পার্টির হাসপাতাল বেড এড হোমের সবে সূচনা হয়েছে বউবাজারের একটা বাড়ির দোতালায়। একখানা ঘোড়ার গাড়ি করে সেখানে এনে ওকে প্রথমে রাখলাম।" সুকান্তর মৃত্যুর পর তাঁর ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় এখানকার চিকিৎসা ও চিকিৎসকের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে (স্বাধীনতা ২৮শে মে, ১৯৪৭ তারিখে প্রকাশিত)

"মেডিক্যাল ইউনিটে এসে প্রথমে এইটাই অনুভব করা যায় যে, এখানে যে সমস্ত রোগীরা আসেন তাঁদের কেউই সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত নন, অর্থাৎ তাঁদের রোগকে কেন্দ্র করে দিনরাত্রি জীবন মরণের সংগ্রাম চলে না। তাই এখানকার যা ব্যবস্থা, তা সে অনুযায়ীই রচিত। সে ব্যবস্থা যে একেবারে ক্রীটিহীন নয়, তা বলাই বাহুল্য ; তবু তা মোটামুটি ভালো এবং এই ব্যবস্থার যে ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে লক্ষ্য করলে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

"প্রথমে ধরা যাক চিকিৎসা . চিকিৎসা যে এখানকার ভালো তার প্রমাণ আমি নিজে। কিন্তু চিকিৎসার চেয়েও ভালো মেডিক্যাল ইউনিটের চিকিৎসক যিনি সহৃদয়, সদালাপী এবং মিষ্টভাষী। সর্বদা এই রকম চিকিৎকেরই প্রয়োজন এবং মেডিক্যাল ইউনিট এ-বিষয়ে অগ্রগণ্য। কেননা অর্থের বিনিময়ে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়, ভালো চিকিৎসক বড় একটা পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য এটা কমিউনিস্ট পার্টির মেডিক্যাল ইউনিট এবং চিকিৎসকও কমিউনিস্ট ; তাই এটা সম্ভব হয়েছে। সুনির্দ্ধারিত চিকিৎসার মধ্যেও এখানকার আবহাওয়া সরস, মুক্ত এবং হৃদ্যতাপূর্ণ—রোগীর কাছে যেটা প্রায় ওষুধের মতই কার্যকরী। রোগী কমরেডদের মধ্যেও পরস্পরকে সাহায্য করার ঔৎসুক্য 'কমরেড' কথাটির মর্যাদা রক্ষা করে চলে।"

তারপর সেখান থেকে 'রেড এড কিওর হোম' প্রতিষ্ঠিত হোল পার্ক সার্কাস এলাকায় ১০নং রাউডন স্ট্রীটে। এখান থেকে লেখা সুকান্তের চিঠিতে তাঁর অসুস্থতা এবং তৎকালীন তাঁর মানসিক অবস্থার কথা জানা যায়। সুকান্ত এই চিঠিটি লিখেছেন ১২-৯-৪৬ তারিখে তাঁর মাসতুতো ভাই ভূপেন ভট্টাচার্যকে :

"তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি। গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি— আরো কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। যদিও অঞ্চলটা পার্ক-সার্কাস তবুও দাঙ্গা সংক্রান্ত ভয় নেই।

একরকম বৈচিত্র্যহীনভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অনন্ত সিং,

গণেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন-- সেই একটা বৈচিত্র্য। সেদিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছি এমন সময় কমরেড জোশী সেই ঘরে ঢুকে আমাদের খাওয়া পরীক্ষা করলেন। এটাকেও একটা বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে।

তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন-- "আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।" অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন— আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করিনি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বর এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

হাসপাতালের ছককাটা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে সকালের ঝকমকে রোদ্দুরকে দুপুরে দেবদারু গাছের পাতায় খেলা করতে দেখি। ঝিরঝির করে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্তিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়, ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে বসে কোন দিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর—কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ্য ; শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়—দিন।

রেডিও, বই, খেলাধুলো—সময় কাটানোর অনেক উপকরণই আছে, আমার কিন্তু সবচেয়ে দেবদারু গাছে রোদের ঝিকিমিকিই ভালো লাগছে। উড়ে যাওয়া বাইরের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বাতাসকে মনে হয় খুবই উপভোগ্য। এমনি চুপ করে বোধ হয় অনেক যুগ অনেক শতাব্দী কাটিয়ে দেওয়া যায়।

যাক, আর নয়। অসুস্থ শরীরের চিঠিতে আমার ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস এসে পড়ে কিছু মনে করিসনি।

মেজদার মুখে শুনলাম— তুই নাকি প্রায়ই "স্বাধীনতা" কিনে পড়ছিস? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত "স্বাধীনতা" রাখলে আরো খুশী হবো।"

এই চিঠি থেকেই কবিসুলভ নিসর্গপ্রিয়তার যেমন সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় পার্টির নেতা, কর্মী ও তার মুখপত্রের প্রতি সুকান্তের গভীর ভালোবাসা।

জুলাইয়ের প্রবল আন্দোলনের ধাক্কায় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেলেন। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়করা স্বাভাবিক কারণেই তরুণ মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। দীর্ঘকাল আন্দামানে কারাবাস করে এই সব বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। "ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই বন্দীদের সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করা হলো উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ 'উত্তরা' সিনেমা হলে। আলাদা অভিনন্দনপত্র আর রচিত হলো না, কারণ সুকান্ত নিয়ে হাজির তার কবিতা— 'মুক্ত বন্দীদের প্রতি' । এই অনুষ্ঠান যখন হয় তখন কলকাতার বুকে অনেকদিন :

গৃহযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে—

ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান ;
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুর খান্‌খান্‌।
দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙ্গিন উদ্যত ;
তোমরা এসেছ বীরের মতন, আমরা চোরের মতো।

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের এই স্মৃতিচারণ বোধ হয় সঠিক নয়। সুকান্ত তখন অসুস্থ। সুকান্তর চিঠিতে আছে, মুক্ত বন্দীরা অনুষ্ঠান শেষে পার্টি হাসপাতালে সুকান্তকে দেখতে গিয়েছিলেন। অতএব উত্তরার অনুষ্ঠানে (সম্ভবত ১১/৯/১৯৪৬ তারিখে) সুকান্তর উপস্থিত না থাকারই কথা। তাছাড়া কবিতাটির নামও 'মুক্ত বন্দীদের প্রতি' নয়, 'সুকান্ত সমগ্র' সংকলনে আছে 'মুক্ত বীরদের প্রতি'। সুকান্ত-র কবিতাটি হয়ত সেখানে পঠিত হয়েছিল। ঐ কবিতায় সুকান্ত দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়েছিলেন :

তোমরা রয়েছে, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।

এরপর সুকান্তের চিঠি পাওয়া যায় ৩রা অক্টোবর তারিখের। রেড-এড কিওর হোম থেকে ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছেন, ''অসুখের মধ্যে চিঠি পেতে ও চিঠি লিখতে ভালই লাগে। যদিও আমার এখন একশ'র ওপর জ্বর তবুও বেশ উপভোগ্য লাগছে এই শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা।

তুই যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসিসনি এতে আমি খুশিই হয়েছি। আমি যখন তোকে চিঠিটা পাঠাই তখনো কলকাতার অবস্থা এত সাংঘাতিক হয়নি ; খবরের কাগজও বন্ধ হয়ে যায়নি এমন অতর্কিতে।

আমি তোকে ডেকেছিলাম শুধুমাত্র তোর সান্নিধ্য পেতে নয়, সদ্যমুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবাব জন্য। শিশুর মত সরল ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হত। আমার সঙ্গে তো এঁর রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। বাস্তবিক এইসব বীরদের প্রায় প্রতেকেই শিশুর মত হাসি-খুশি, সরল, আমোদপ্রিয়। এ ছাড়াও বিখ্যাত শ্রমিক এবং কৃষক নেতারা এখানে এখন অসুস্থ অবস্থায় জড়ো হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়েদেবার লোভ আমার ছিল। ...

বেশ কাটছে এখানে। সবাই এখানে আপন হয়ে উঠছে, ভালবাসতে আরম্ভ করেছে আমাকে। ডাক্তার রোগী সবারই আনন্দ আমার সঙ্গে রসিকতায়! এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি— শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মত জায়গায় বেশ আছি। কিন্তু তবুও আমার শিকড় গজিয়ে উঠতে পারে নি, বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-সমৃদ্ধ হাতছানি সকাল সন্ধ্যায় ঝলক দিয়ে ওঠে তলোয়ারের মতো। এখন বদ্ধ-দীঘির জগতে ; সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে.মাছের মতো, কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে। সকালের আশ্চর্য অদ্ভুত রোদ্দুর কোনো কোনো দিন সারাদিন ধরে কেবলই মন্ত্রণা দেয় বেরিয়ে পড়তে ; শহর-বন্দর ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলের সবুজে মুখ লুকোতে দেয় অযাচিত পরামর্শ। সত্যিই অসহ্য লাগে কলকাতাকে মনের এই সব মুহূর্তে।

উপন্যাসের ব্যাপারে তোর দুঃসাহসিক ধৈর্য আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করল।

পুজোয় কোথায় কোথায় লিখেছি জানতে চেয়েছিস? একমাত্র পুজোসংখ্যার 'স্বাধীনতা'

ও 'পরিচয়' এবং কিশোরদের বার্ষিকী 'শতাব্দীর লেখা'য় লেখা বেরিয়েছে জানি। তা ছাড়া এইসব কাগজ ও সংকলনে লেখা বেরুনোর কথা আছে :

(১) শারদীয়া বসুমতী (২) শারদীয়া আজকাল (৩) উজ্জয়িনী—সংকলন (৪) মেঘনা-- সংকলন (৫) ক্রান্তি— সংকলন (৬) বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি সংকলন ও (৭) পুজোর 'রংমশাল'।

এই চিঠিতে যে উপন্যাসের কথা সুকান্ত উল্লেখ করেছেন তার নাম 'চতুর্ভুজ'। সুকান্ত, অরুণাচল, ভূপেন এবং সুকান্তর সমবয়সী মামা বিমল এই চারজনে মিলে এই উপন্যাসটা লিখছিলেন।

কিছুদিন পরে সুকান্ত একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। "আবার শুরু করলো নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম, ঘোরাঘুরি। এর ফলে আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাড়িতে দেখবার মতো কেউ থাকলে অতো তাড়াতাড়ি আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়তো না।" এই অসুস্থতার কথা জানা যায় সুকান্তর ৪/১১/৪৬ তারিখে লেখা চিঠিতে, "ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ক' দিন ধরে ঘুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে ওখানে, যার ফলে কাল রাত্তিরে অনেকদিন পরে জ্বল এল। তাই আমাকে এখন সাবধান হতে হবে। ডাক্তারের কথামত পরিপূর্ণ বিশ্রামই আমার দরকার। তাই আবার বন্ধ করে দিলুম সুস্থ লোকের মত ঘোরাফেরা।"

একমাস পরে লেখা (৪/১২/৪৬) চিঠি থেকে জানা যায় সুকান্তর রোগ ক্রমেই জটিলাকার ধারণ কবেছে : "আমার রোগ এমন একটা বিশেষ সন্দেহজনক অবস্থায় পৌচেছে, যা শুনলে তুই আবার 'চোখে বিশেষ এক ধরনের ফুল' দেখতে পারিস। ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ শয্যাগত আছি। কাজেই আগামী 'চতুর্ভুজ বৈঠক' আমার বাড়িতে বসবে, অরুণের বাড়িতে নয়। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করেছি।"

সুকান্তের চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন ডাঃ তাপস বোস এবং বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট ডাঃ রাম অধিকারী। অসুখের বাড়াবাড়ি হওয়ায় সুকান্তের জ্যাঠতুত দাদা রাখাল ভট্টাচার্য সুকান্তকে তাঁদের পূর্ব কলকাতার বাড়ি থেকে শ্যামবাজারে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে চিকিৎসা চললেও স্যানাটোরিয়াম ছাড়া ঠিকমতো চিকিৎসা সম্ভব নয়। "ডাঃ অধিকারী প্রস্তাব করলেন এবং নিজে চেষ্টা করতে লাগলেন—মাদার স্যানাটোরিয়াম, মিশনারীদের প্রতিষ্ঠান, যেখানে কিছুটা সেবা-প্রবৃত্তি আছে, যত্ন হবে।" কিন্তু সেখানে সীট পেতে দু'তিন মাস সময় লাগবে জেনে যাদবপুরে চেষ্টা করা হোল। "অল্প চেষ্টায় যাদবপুর টিউবারকিউলোসিস হসপিটালে ক্যাবিনও পাওয়া গেল। সেখানেই ভর্তি করানো হলো সুকান্তকে।" সেদিন ছিল ১৯৪৭ সালের ১লা কিংবা ২রা এপ্রিল। যাবার সময় সুকান্তের বালিশের তলায় পাওয়া গিয়েছিল 'হে মহাজীবন' কবিতাটি।

তখনো কলকাতায় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ভীষণ দাঙ্গা চলেছে। পূর্ব কলকাতায় যখন-তখন লড়াই বাধত। ফলে একটানা ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত কারফিউ জারী হোত। কারফিউ এলাকভুক্ত বলে শিয়ালদা-র রেল বন্ধ। উত্তর এবং পূর্ব কলকাতার লোকদের যাদবপুরে যাতায়াত করাও কষ্টকর হয়ে পড়ল।

হাসপাতালে যাওয়ার পরেও সুকান্তর অসুখটা ভালোর দিকে না গিয়ে বাড়াবাড়ি রূপ নিল। সুকান্তর সময়ে ফুসফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসা সবে বেরিয়েছে, কিন্তু পেটের যক্ষ্মা তখনও

চিকিৎসাব বাইবে। যক্ষ্মার জীবাণু সুকান্তকে একাধারে বুকে ও পেটে আক্রমণ করেছিল। রোগ তখন বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে অনিবার্য পরিণতি দ্রুত এগিয়ে এল।

যাদবপুব হাসপাতালে আসার সাতদিন পরে বন্ধু অরুণকে সুকান্ত লিখেছিলেন, "সাতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। বড় একা-একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি। মেজদা (রাখাল ভট্টাচার্য) নিয়মিত আসে, কিন্তু সুভাষ নিয়মিত আসে না। কাল মেজবৌদি-মাসিমাকে নিয়ে মেজদা এসেছিল। চলে যাবার পর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। বাস্তবিক শ্যামবাজারের ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছি।

তুই-কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস? না কলকাতায় যাতায়াত করতে পারছিস? যাই হোক, সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করবার সময়— বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারিস, কিংবা ৮এ বাসে। এখানে 'লেডী মেরী হার্বার্ট ব্লক' এক নম্বর বেডে আছি।"

এই হাসপাতালে সুকান্তের চিকিৎসায় অব্যবস্থা সম্পর্কে রাখালবাবু পরে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। সে প্রশ্নগুলো হয়ত ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন . "মানুষের মরা দেখতে দেখতে মৃত্যু বা মৃত্যুযন্ত্রণা ওদের হৃদয় স্পর্শ করে না।" এ কথাটাও হয়ত সঠিক। এখানে ওদের বলতে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মী সকলকেই বোঝানো যায় এবং প্রায় সব হাসপাতাল সম্পর্কেই এ কথা বলা যায়। ডাঃ তাপস বোস বলেছিলেন পেটের টি. বি. বাঁচবে না তিনি জানতেন। তবু একটু সতর্ক সেবা যত্ন পেলে সুকান্ত আরও কিছুদিন বাঁচতেন। সরলা বসুও তাই বলেন— "সাড়ে তিন বছর ধরে সুকান্ত নানা রোগে ভুগছিল। একটু যত্ন করবারও কেউ ছিল না। ভাইগুলোকে উপদেশ দিতাম ওর খাবারটার 'পরে নজর করবে। যখন অরুণের মুখে শুনলাম ওব টি. বি. হতে পাবে, ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়েছেন তখনি জেনেছিলাম ও আর বাঁচবে না।" (ভোলা যায় না সুকান্তকে)। সুকান্ত সেরে উঠুক, বেশিদিন বাঁচুক সকলের এই ঐকান্তিক কামনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে, ২৯ বৈশাখ, ১৩৫৪ মঙ্গলবার সকালবেলা সুকান্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তিনি ইতিহাস রচনা করে গেলেন। মনীন্দ্রলাল বসুর সুকান্ত গল্পের 'নায়কের' যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়েছিল। বাংলাদেশের নতুন যুগের কবি সুকান্তেরও মৃত্যু হোল যক্ষ্মারোগেই।

সুকান্তর মৃত্যুর দিনটিও ছিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হানাহানিতে মত্ত, ফলে এই মহামরণকে কেন্দ্র করে কোন মহামিছিল করা সম্ভব হয়নি। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের থেকে জানা যায়, তাঁর মৃতদেহ একটি লরিতে করে দু-একজন আত্মীয় এবং বন্ধু শেষ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিল কাশীমিত্তিরের শ্মশানঘাটে। নীরবে এবং নিঃশব্দে অগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়েছিল সংগ্রামী কবির প্রাণহীন দেহ।

সুকান্তের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে এল সুকান্তর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং কমিউনিস্ট পার্টির সকলের মধ্যে। তাঁর মৃত্যুর পর কবিরা সেই শোক প্রকাশ করেছেন তাঁদের কবিতার মাধ্যমে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতায় যেন সকলের কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে :

"স্মৃতিস্তম্ভ গড়িব না, প্রহসন 'স্মৃতির ভাণ্ডার'
অর্থগৃধ্নু সমাজের তুমি নও কবি গীতিকার,
তুমি বেঁচে রবে নিত্য মাঠে মাঠে সোনালী ফসলে
তোমার স্মৃতির হাওয়া দিবে দোলা জীবনের পালে ;
বেঁচে রবে চিরদিন জনতার জয় কলরবে
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের রৌদ্রোজ্জ্বল নবান্ন উৎসবে,
আগন্তুক কিশোরের স্বপ্ন চোখে আঁকা তব ছবি
বুকে বেঁধে নেবে সূর্য-স্বয়ম্বরা আগামী পৃথিবী। (সুকান্ত স্মরণে)

সুকান্ত সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, "গভীরতা, ব্যাপ্তি, তীব্রতা, ভাবৈশ্বর্য ইত্যাদি সবকিছুর ধারক ও বাহক হিসাবে সাদামাটা স্পষ্টভাষী সার্থক কবিতা কল্পনা করতে আমরা অপটু ছিলাম, আমাদের অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতি গীতি কবিতা পর্যন্ত। সুকান্তর কবিতায় তাই বাংলা-কাব্য সাহিত্যের নবজন্মের সূচনা ছিলো।" কিন্তু এ কাজে সুকান্তকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "সে বুঝি টের পেয়েছিলো চলতি অবস্থা অব্যবস্থা উলটে দিতে কবিরও শহীদ হবার প্রয়োজন আছে।" আপোষ করেনি বলে সুকান্তকে শহীদ হতে হয়েছিল।

সুকান্তের মৃত্যুতে কমিউনিস্ট পার্টি হারিয়েছে একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে, আগামী বিপ্লবের চারণ কবিকে। অথচ সুকান্তের অসুস্থতার খবর কমিউনিষ্ট পার্টির উচ্চতম মহলে সময়মত পৌঁছয়নি। সেজন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণতম সর্বজনশ্রদ্ধেয় অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ লিখেছেন, "আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কি অঘটন ঘটে গেল! আমি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। কমিউনিষ্ট পার্টির বৃদ্ধ লোক আমি। আমার বয়স তখন ৫৭ বছর। ঢাকা হতে সামসুদ্দীন আহমদ এসে কিনা আমাকে সুকান্তের অসুখের খবর দিলেন।...

আমার অনুশোচনার আর শেষ নেই। কেন আমি আগে খবর পেলাম না? কেন ঢাকা হতে এসে সামসুদ্দীন আহমদকে আমায় সুকান্তর অসুখের খবর দিতে হলো!

এই জন্যে আমি কখনও নিজেকে ক্ষমা করিনি।"

অনেক আপশোষ আর অনুশোচনার মধ্যে সুকান্তর জীবন শেষ হয়ে গেল; কিন্তু তার আগ্নেয় কাব্য-বাণী সীমাহীন ব্যঞ্জনা রেখে গেল সংগ্রামী মানুষের কাছে।

সুকান্ত যখন শয্যাগত তখন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ কিছু বন্ধু ও শুভার্থীরা সুকান্তের একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে লেখা সুকান্তের সংগৃহীত কবিতা নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ। বই যখন প্রেসে যায় তখন সুকান্ত সেই ফাইল কপি দেখেছিলেন কিন্তু নামকরণ ঠিক করে উঠতে পারেননি। সুকান্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রথম কবিতার নামে নাম রেখে সুকান্তের প্রথম কবিতার বই 'ছাড়পত্র' প্রকাশিত হল আষাঢ় ১৩৫৪।

এছাড়াও আরেকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার নাম 'ঘুম তাড়ানি ছড়া'— সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। ছবি-সূর্য রায়। প্রকাশক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিসিং হাউস। তিন টাকা।

এই সংকলনে মঙ্গলাচরণ, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং সুকান্তের কবিতা ছিল। সুকান্তের পাঁচটি কবিতা 'সিপাই বিদ্রোহ', 'আজব লড়াই', 'পুরানো ধাঁধা', 'ব্ল্যাক মার্কেট', এবং 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' ছিল। এই কবিতাগুলি পরে সুকান্তের মিঠেকড়া গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়।

এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায়। লিখেছেন পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল। এই বছরই ২৯ বৈশাখ ১৩৫৪, ১৩ মে ১৯৪৭ সুকান্তের মৃত্যু হয়। মনে হয়, বইটি এই বছরেই প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যুর পূবেই সুকান্ত পেয়েছিল দেশজোড়া খ্যাতি। তার কবিতার একাধিক অনুবাদ হয়েছে বিদেশে। ফরাসি, রুশ, জার্মান, চেক, ইংরাজি ভাষায় তাব বহু কবিতা অনুদিত হয়েছে। "১৯৫৩-তে 'ক্ষুধা ও বিদ্রোহের গান' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ চেক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশে বিদেশে সংগ্রামী মানুষ সুকান্তের কবিতায় পেয়েছে তাদের সংগ্রামের এবং প্রতিবাদের ভাষা। এখানেই সুকান্ত জীবিত এবং অপরাজেয়। নবজাতকের কাছে জীর্ণ পৃথিবীর আবর্জনা অপসারণের দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করে সুকান্ত চিরজীবী হয়ে রইল সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস হয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রত্যক্ষ রাজনীতি-সংযোগের পূর্বে কাব্য-চর্চা

পাখির কলরবে রাত্রির অবসান হয়, পাখিরাই ভোরের বার্তা এনে কবিকে স্বপ্নের জড়িমা থেকে প্রখর আলোর বাস্তবতার মধ্যে টেনে আনে। উনিশশো একচল্লিশ সালে কবি সুকান্তর "একক পৃথিবী ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে।" '১৯৪১ সাল' কবিতায় আছে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি :

"কোথায় সেই দূর সমুদ্রের ইশারা
আর অন্ধকারে নির্বিরোধ ডাক!
দিনের মুখে মৃত্যুর মুখোস।
যে সব মুহূর্ত-পরমাণু
গেঁথেছিল অস্থায়ী রচনা,
সে সব মুহূর্তে আজ
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়
অজ্ঞাত রক্তিম ফুল ফোটে।।"

১৯৪০ সালে রচিত 'ভবিষ্যতে' কবিতার মধ্যে রাজনীতি বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সুকান্তের এক আবেগ মথিত প্রকাশ দেখা যায়। মনে হয় তখনো কবি তার সঙ্গে আবেগে জড়িত থাকলেও পুরোপুরি কম্যিউনিস্ট আদর্শে সক্রিয় হয়ে ওঠেননি। ১৯৪১ সাল থেকেই তার সক্রিয় অনুভূতি এবং অংশগ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়।

তার পূর্বে তিনি তার 'নির্বাসিত মন' নিয়ে গৃহকোণে বদ্ধ ছিলেন। সেখানে ছিল অন্ধকার, হতাশা আর বিষণ্ণ অবসাদ। তন্দ্রাচ্ছন্ন কবি চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন :

অবিরাম স্বপ্নপথ বেয়ে
চলিয়াছে দুরাশার স্রোত,
বুকে তার বহু ভগ্নপোত। (স্বপ্নপথ)

বাঁধা সড়কে সুকান্ত দেখেছেন কেবল নরক। জীবনের চেয়ে মৃত্যু সেখানে প্রধান। মৃত্যুকে স্মরণে না রাখলেই অশান্ত মনে হয়। জীবনের অনিবার্য যে পরিণতি সে মৃত্যুকেই যদি শ্যামসুন্দর বরণীয় বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে মৃত্যুকে বরণ করতে আর কষ্ট হয় না। অতি প্রাচীন কাল থেকে জীবনের অনিত্যতার কথা স্মরণ করিয়ে মানুষকে জীবনবিমুখী করবার যে সূক্ষ্ম প্রয়াস চলে এসেছিল ভারতীয় সনাতন সেই ঐতিহ্য বালক কবিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এখানে রবীন্দ্রপ্রভাবও সক্রিয় বলে মনে হয়। তাই তিনি অবলীলায় বলতে পারেন, "আমরা বুদ্বুদমাত্র জীবনের স্রোতে।" জীবনের সম্পর্কে আগ্রহ যেখানে জোরালো নয় সেখানে মৃত্যুর অন্ধকারই স্বাভাবিক। সুকান্তও তাই লিখেছেন :

অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে ; প্রতিবার
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর বিস্তার। (আলো-অন্ধকার)

কোন চিন্তা ভাবনাই নিরালম্ব নয়। সুকান্তের এই মৃত্যু ভাবনার পেছনেও যথেষ্ট কারণ ছিল। সুকান্তর যখন সাত-আট বছর বয়স তখন তার জ্যাঠতুতো দিদি রাণীদির মৃত্যু হয়। যে রাণীদি সুকান্তকে খুব ভালবাসত। ছড়া আর গান শুনিয়ে মনে কল্পনার জাল বোনাতে উদ্বুদ্ধ করত, কান ছন্দের দোলায় দীক্ষিত করে তুলত। সেই রাণীদির হঠাৎ মৃত্যু সুকান্তদের পরিবারের পরিবেশটাকেই ছিন্ন ভিন্ন বিষণ্ণ করে দিয়ে গেল। তারপরে মা এবং জ্যেঠতুতো দাদার মৃত্যু সুকান্তকে আরও নিরাশ্রয় করে দিয়ে গেল। সুকান্তর তখনকার আলো-অন্ধকার দিনগুলোতে অন্ধকারের কালো ছায়ারই প্রাধান্য লাভ করা স্বাভাবিক।

সুকান্তের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পূর্বাভাস' এর কবিতাগুলো সুকান্তের বারো তেব বছর বয়সের লেখা বলে উক্ত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে।

'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থে মোট উনত্রিশটি কবিতা আছে। এর সব কবিতা গুলো সুকান্তেব বারো তেরো বছরের লেখা বলে মনে হয় না। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'পূর্বাভাস' এর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং বিশেষ করে জাপানী আক্রমণের কথা আছে :

দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ—
বিস্ফারিত হিংস্র-বেদনায়।
অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান
লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,
উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত।

এটা ১৯৪১-৪২ সালের ঘটনা। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞের কথা আছে। তেমনি 'অসহ্য দিন'—এই কবিতায় আছে :

ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিন রাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
এখানে ওখানে, পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।।

এখানে "অক্ষম দেহ" বলতে সুকান্তের নিজের অসুস্থতা, "এখানে ওখানে, পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত" বলতে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত দিন গুলোর কথা মনে হয়। এই অবস্থায় কবির অনেক দায়িত্ব। তাঁর "চেতনা" এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে তাঁকে "নির্দয় হাতে চাবুক মারে"। এই কবিতাটিকে সেজন্য রাজনীতির সঙ্গে সংযোগের পূর্বের বলে মনে হয় না।

'উদ্যোগ' কবিতাকেও একটি জাপ বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য বলেই মনে হয় "একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন"— বক্তব্যের মধ্যে 'জাপান এলে রুখতে হবে'-এর প্রতিরোধের সুরই বেশি ধ্বনিত হয়েছে। এই কথাই পরবর্তী কালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

"সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পূব-দরজায়,
ফেনী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।"

'পরাভব' কবিতায় মন্বন্তর এবং চোরাকারবারের উল্লেখ আছে। "লাল সূর্য মুক্তির প্রতীক' কথার পরে জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকলেও কবির মনে যে তখন সাম্যবাদের প্রভাব পড়েছে তা স্পষ্ট। 'বিভীষণের প্রতি' কবিতাও সৌমেন চন্দের মৃত্যুর পরে লেখা। "হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত ফুলে''র মধ্যে আছে দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা। 'হৃদিশ' কবিতাটিও পরের লেখা। এই কবিতায় স্পষ্ট লেখা আছে :

একদা যুদ্ধ শুরু হল সারা বিশ্ব জুড়ে,
জগতের যত লুণ্ঠনকারী আর মজুরে,
চঞ্চল দিন ঘোড়ার খুরে।

'দুর্মর' কবিতাটি কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা :

"হয় ধান নয় প্রাণ" এ শব্দে
সারাদেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।"

স্পষ্টতই এই কবিতায় পূর্বাভাস নয়, ছাড়পত্রের সুর ধ্বনিত। মরীয়া কৃষকের মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প রাজনীতি সচেতনারই পরিচয়।

অতএব পূর্বাভাসের কবিতাগুলোকে নির্বিচারে বারো তেরো বয়সের লেখা বলে গণ্য করা যায় না। এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও বিভিন্ন বয়সের লেখা পাওয়া যায়। মনে হয়, সুকান্তের মৃত্যুর পরে যেমন যেমন কবিতা সংগৃহীত হয়েছে তেমন তেমন করেই কবিতার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সংগৃহীত কবিতাগুলোর মধ্যে সেজন্য কোন ভাবের একীকরণ বা কোন এক বিশেষ 'ঋতু'র ফসল বলে মনে হয় না। সেজন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতি সংযোগের পূর্বে কবির মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন বিশেষ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ না করে বিশেষ বিশেষ কবিতার উল্লেখ করাই শ্রেয় বোধ হয়েছে। তাছাড়া রাজনীতি সচেতন এক বিপ্লবী কবির পূর্বেকার মানসিকতা কিরূপ ছিল সেটা জানবার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহল হতে পারে সেজন্যেই এই প্রকার কবিতাগুলোকে একত্র আলোচনার চেষ্টা হয়েছে।

সুকান্ত প্রথম কখন লিখতে আরম্ভ করেছিল সে কথা ঠিক কেউ বলতে পারেননি। বইয়ের দোকানের বিশ্বস্ত কর্মচারী কালীরতনদাকে উপলক্ষ্য করেই ঘরের দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে লেখা নীচের ছড়াই হয়তো তাঁর প্রথম রচনা :

খাঁদু খালি কলা গেলে
আর কালীরতনদা তাই দেখে ভোলে।

আর মনোজবাবুর লেখা থেকে জানা যায় 'রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন' ছড়ার আঙ্গিকে লেখাই সুকান্তর সম্ভবত প্রথম কবিতা। সহপাঠী শৈলেন সরকারের লেখা থেকে জানা যায়— 'কমলা বিদ্যামন্দিরে'র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই 'সঞ্চয়' নামে এক হাতে লেখা পত্রিকায় সুকান্ত প্রথম একটি হাসির গল্প লেখেন। আর সুকান্তর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৪৭ সংখ্যা 'শিখা' পত্রিকায়— বিবেকানন্দের একটি জীবনী এবং একটি কবিতা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীবিজন গঙ্গোপাধ্যায়।

সুকান্তর তখন বয়স চৌদ্দ। এই বয়সেই মুদ্রিত লেখার সংখ্যা কম হলেও সুকান্তর মোট

লেখা কিন্তু অনেক। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসার পূর্বে রচিত বলে যেগুলো মনে হয় সেগুলো হোল :

হে পৃথিবী, সহসা, স্মারক, নিবৃত্তির পূর্বে, স্বপ্নপথ, সুতরাং, বুদ্বুদমাত্র, আলো-অন্ধকার, প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার মৃত্যুর পর, স্বতঃসিদ্ধ, মুহূর্ত, তরঙ্গভঙ্গ, আসন্ন আঁধারে, পরিবেশন, পরাভব, দেয়ালিকা, তারুণ্য, গীতিগুচ্ছ, সূর্য প্রণাম, চৈত্র দিনের গান, বর্ষবাণী, সুহৃদবরেষু এবং রাখাল ছেলে।

এই কবিতাগুলোর মধ্যে নৈরাশ্যই প্রধান। কবি নিজেকে 'দুর্ভাগা' বলে অভিহিত করে এই পৃথিবীর কাছে ভুল করে হলেও স্মৃতির পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান। এখানে বিলুপ্তি নিশ্চিত। "অশ্বত্থ শাখায় কালো পাখি দুশ্চিন্তা ছড়ায় অবিরত।" অন্তর্মুখী কবি-মন উদাসীনতায় ক্লান্ত হয়ে ওঠে :

মৃত্যুর মৃত্তিকা 'পরে ভিত্তি প্রতিকূল—
সেখানে নিয়ত রাত্রি ঘনায় বিপুল। (স্বতঃসিদ্ধ)

স্বভাবতই কবির এই মানসিকতায় রাত্রির তপস্যা উষার অরুণোদয়ে সার্থকতা লাভ করে না। বরং "রাত্রির বিবর্ণ স্মৃতি" প্রভাতের বুকেও "মলিন হাসি" ছড়িয়ে দেয়।

সুকান্তের প্রাথমিক মানসিকতার এক সুন্দর প্রকাশ পাওয়া যায় 'রাখাল ছেলে' নামক গীতিকাব্যে। "সূর্য যখন লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয় ভোরবেলায়, রাখাল ছেলে তখন গরু নিয়ে যায় মাঠে।" গরুগুলো যখন নদীর ধারের সবুজ মাঠে চরে বেড়ায়, রাখাল ছেলে তখন গাছের ছায়ায় আপন মনে বাঁশী বাজায়। "সেই সুর শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে আর পাখিরা কিচির মিচির করে তাদের আনন্দ জানায়।" বনের অবোধ পশু হরিণী মুগ্ধ হল সেই বাঁশীর তানে। ধীরে ধীরে তার ভয় ভেঙ্গে গেল। সে এসে শুনতে লাগল মন ভোলানো সেই বাঁশীর সুর। হরিণীর মা কিন্তু পছন্দ করত না মেয়ের এই বাঁশী শোনা। তাই সে মেয়েকে সাবধান করে দিতে বলে :

ওরা সব দুষ্টু মানুষ মন ভুলাবে মিষ্টি হাসি
বুঝি বা ফাঁদ পেতেছে ওরা তোকে একলা পেয়ে।।

হরিণী কিন্তু মায়ের নিষেধ শোনে না। সে ধীরে ধীরে সুরের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। রাখাল ছেলের গভীর ভালোবাসায় মনের পাখায় সে স্বপনপুরে উড়ে বেড়ায়। তাই রাখাল ছেলে রোজ হরিণীকে বাঁশী শোনায় আর হরিণী রাখাল ছেলেকে শোনায় গান।

তাদের এই সুখের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে এল। হরিণীর নিত্য স্বপনপুরে আর যাওয়া হোল না। একদিন হরিণী যখন মুগ্ধ হয়ে রাখাল ছেলের বাঁশী শুনছিল তখন এক শিকারী সেই সুযোগে বধ করল হরিণীকে। "মৃত্যুপথযাত্রী হরিণী তখন রাখাল ছেলেকে বললে— বাঁশীতে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই তুমি, বোধহয় মানুষ বলেই, আমার মৃত্যুর কারণ হলে।" তবু মৃত্যুকালে তার একান্ত মিনতি :

বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণ কালে,
মরণ আমার আসুক আজি
বাঁশির তালে তালে।

বাঁশী শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে হরিণীর মৃত্যু হল। সাথীকে হারিয়ে রাখাল ছেলে অসীম দুঃখে বন ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল আর কখনো সে এখানে মরণ বাঁশীর খেলা খেলবে না :

আর কখনো হেথায় আসি
বাজাব না এমন বাঁশি
আবাব আমার বাঁশি শুনে
মরণ হবে কার।

কাহিনীর মধ্যে আছে সেই বিষণ্ণতা। কল্পনায় উদাসীনতা। কিন্তু আবেগে টলোমলো। অদ্ভুত সুরবোধ, নিখুঁত ছন্দজ্ঞান আর পরিমিতিবোধ। ভাবতেই পারা যায় না একটি বালক কবিব হাত দিয়ে এমন লেখা বেরিয়েছে।

সুকান্তর জীবন থেকে জানা যায় সুকান্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত খুব ভালবাসত। রেডিওর কাছে কান পেতে সে তন্ময় হয়ে গান শুনত। এটাই ছিল তাঁর বড় নেশা। শুনতে শুনতে সে আত্মস্থ হয়ে নিজেই গান রচনা করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'গীতিগুচ্ছে'। সঙ্গীতের বাণী রচনায়, ছন্দের লালিত্যে, ভাবের ব্যাকুলতায় স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব বিদ্যমান। "গানের সাগর পাড়ি দিলাম সুরের তরঙ্গে", "হে মোর মরণ, হে মোর মরণ", "ও কে যায় চলে কথা না বলে দিও না যেতে", "শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে", "কিছু দিয়ে যাও এই ধূলিমাখা পান্থশালায়", "সাঁঝের আঁধার ঘিরল যখন শাল-পিয়ালের বন", "মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে—কে তুমি আমাকে ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে?", "কোন অভিশাপ নিয়ে এল এই বিরহবিধুর আষাঢ়" প্রভৃতি গীতগুলো প্রত্যক্ষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের গীত-বিতানের গীতগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পূর্বসূরীকে অনুসরণ কবে বহু কবি বা লেখক নিজের রচনার ডালি পুষ্ট করে তোলেন। সুকান্তও স্বাভাবিক ভাবেই তা করেছেন। সেটা বড় কথা নয়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিশ্ববন্দিত বিরাট কবি যেখানে তখনো প্রত্যক্ষ বর্তমান তখন তাঁকে পাশ কাটিয়ে কিংবা তাঁর প্রভাবমুক্ত হয়ে কাব্য-রচনা করা খুবই কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন হোল এত অল্প বয়সে কী এক আশ্চর্য ক্ষমতায় সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের বাণীচয়ন, বাক্‌বিধি, রচনার কৌশল, সুরজ্ঞান আয়ত্ত করে নিয়েছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। সুকান্তের এই গীতিগুচ্ছকে গীতবিতানের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে অনেকেই হয়ত সেখান থেকে এগুলোকে বেছে আবার বার করে আনতে পারবেন না।

এই গীতিগুচ্ছের মূল সুরও করুণ। বিরহ-বিধুর আষাঢ়ে এখানে শুনতে পাওয়া যাবে অভিশপ্ত বিরহী যক্ষের সব আশার সমাপ্তির সঙ্গীত। শ্রাবণ বাতাসে বাইরে ধূসর দিনে কবির মন ছুটে চলে মদির-বিবশ নিঃশ্বাসে। অকারণে বসন্তের ফুলবন জেগে ওঠে, ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে এখানে কেবল তুষারের ঝড় বয়ে যায়। অন্ধকার প্লাবনে কেবল বিরহের ছবিই অঙ্কিত হয়। তাই মরণকে বরণ করতে গিয়ে কবি বলেন,

তোমার বুকে অজানা স্বাদ,
ক্লান্তি আনো, দাও অবসাদ,
তোমায় আমি দিবসযামী
করিনু বরণ। (গীতিগুচ্ছ-৪)

একই সঙ্গে স্মরণীয় সুকান্তের 'স্মারক' কবিতাটি। এখানে আছে সৌন্দর্য-তন্ময়, স্বপ্ন-মুগ্ধ মনের অপূর্ব সুন্দর স্মৃতিচারণা :

কাহার চকিত-চাহনি-অধীর পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলোয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে
জ্বালে নাই তার বাতি,
কাঁদিয়া কাটায় রাতি।
বিরহিণী তারা আঁধারের বুকে সূর্যেরে কভু হায়
দেখেনিকো কোনো ক্ষণে।
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয়তো পড়িবে মনে,
রজনীগন্ধা বনে।।

কতগুলো ছোট ছোট ব্যঞ্জনাধর্মী রূপকল্পের ব্যবহারে বিবাগী মনের অতীত সৌরভের সুরেলা স্মৃতি আনন্দনিষ্যন্দী হয়ে উঠে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি সুকান্তর কাব্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে মৃত্যু ভাবনাই ছিল প্রধান। এই ভাবনার জন্য নিসর্গ-চেতনার মধ্যেও নিহিত আছে বিষণ্ণতা। কিন্তু এই ভাবনার মধ্যেও যেন একটা আত্ম-গৌরব বিদ্যমান। এখানে আলোর ঔজ্জ্বল্য আঁধার-অঞ্জনে বিলীন হয়ে যায়। তবু কবির ধারণা এই অনুভব মিথ্যে হতে পারে না। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কবি পাঠকের অন্তরে স্পষ্টতা লাভের স্থির বিশ্বাস রাখেন :

আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর। (আমার মৃত্যুর পর)

বহির্বিশ্বে তখন বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে। রাজনৈতিক অশান্তির ঘূর্ণিঝড়ে ঘরে বাইরে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন-মুগ্ধ কবিমন স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হয়ে থাকেন। এমন সময় এল মহামৃত্যুর বিষণ্ণতা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে যখন সর্ব্বব্যাপী শোকের নীরবতা পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল নিমতলার সব শেষের উদ্দেশ্যে তখন রবীন্দ্রভাবনায় বিভোর বালক কবির কলমে লিখিত হোল 'সূর্য-প্রণাম'--ছন্দোবদ্ধ এক অপূর্ব সংগীতালেখ্য।

পূর্ব সাগরের পার হতে "তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর বেশে" উদিত হয়ে দিনের শেষে রাত্রির আহ্বানে সূর্য অস্তাচলে গমন করে। স্বভাবতই সূর্যপ্রণামের দুটি পর্ব : উদয়াচল এবং অস্তাচল। জন্ম এবং মৃত্যু জীবনের দুটি দ্বার। দিনের প্রেক্ষাপটের মতোই জীবনের বিস্তার। এরি মধ্যে জীবনের সমগ্রতা। কবি সুকান্ত তাই এই দুটি পর্বের মধ্যেই রবীন্দ্র-জীবনের সমগ্রতাকে প্রকাশ করেছেন ছন্দের বর্ণনায় গানে আর আবৃত্তিতে।

সূর্যের মতোই রবীন্দ্রনাথ অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে বাণী-বিকাশে এই ধরিত্রীর চিরকালের রূপকে বিকশিত করে তুলেছেন। 'পিলু-বারোয়াঁর' সুরে জাগিয়ে দিলেন হাজার সূর্যমুখীকে। তিনি এনেছিলেন 'নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা'। তাঁর বাণীতে সকল 'প্রাণের নীরব কথা', মনের ব্যাকুলতা ছন্দিত প্রকাশ লাভ করেছে। তাই তো—

"হে বিশ্বলোক তোরে ভালবাসি,
তখনি ধরিত্রী তার জয়মাল্যখানি
আশীর্বাদ সহ তব শিরে দিল আনি—
সস্মিত নয়নে।"

কিন্তু বারে বারে পঁচিশে বৈশাখ সুদূরের তরে ডাক দিয়ে বলে গেল, "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।" "বেলা শেষে শান্ত ছায়া সন্ধ্যার আভাসে" তার যাত্রাশেষে ব্যথাভরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে সুকান্ত অস্তাচলের মহাকবিকে প্রণাম জানান।

কবিতা ও গান রচনায় সুকান্তের বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। এই সংগীতালেখ্যর মধ্যেও তা স্পষ্ট। এখানে রবীন্দ্রনাথের বাণী, বাক্-বিন্যাস এবং রচনারীতিকে সুকান্ত কী নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই হয়তো পড়ছি। "পুব সাগরের পার হতে কোন পথিক উঠলে হেসে", "নৃত্যে কাঁপুক চিত্ত মোদের নটরাজের নর্তনে।" "আলোর সুরে বাজাও বাঁশি/চিরকালের রূপ বিকাশি/আঁধার নাশে সুন্দর হে তোমার বাণীর মূক আবেশে।" "বেলা শেষে শান্তছায়া সন্ধ্যার আভাসে/বিষণ্ণ মলিন হয়ে আসে", "যেথায় পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে অমর অক্ষরে", "আবার সম্মুখপানে যাত্রা করে রাত্রির আহ্বানে", "আজি হতে শতবর্ষ আগে", "ছিন্নবাধা বলাকার মত", "ও কে যায় চলে কথা না বলে, দিও না যেতে" প্রভৃতি বহু পঙক্তি বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে কোন কোন জায়গায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণী হুবহু বজায় রেখেও কী সুন্দরভাবে কাব্যবাণীদেহ সুকান্ত নির্মাণ করেছেন তা দেখবার মত।

নিপুণ শব্দচয়নে, ধ্বনিতরঙ্গে এবং ছন্দবৈচিত্র্যে সূর্যপ্রণাম কখনো গানের সুরে, কখনো অমিত্রাক্ষরের প্রবহমান বর্ণনায় ভাবগম্ভীর সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর হোল আধুনিক কালে রচিত হয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার মতো মননসমৃদ্ধ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া আধুনিক কবিতার স্বধর্ম বলে জাহির করা হোত রবীন্দ্রবিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের মত পথ রুদ্ধ করে আধুনিক কবিদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাইরে নতুন কথা, নতুন কল্পনা, নতুন স্বপ্ন রচনা করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য তারা রবীন্দ্রবিরোধিতার নাম করে বিদেশীয় কবির অনুসরণে দুর্বোধ্যতা, বুদ্ধির কালোয়াতি প্রকাশ করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে হজম করেই যে নতুন ভাবে পাঠকচিত্তে সাড়া জাগানো যায় সেটাই প্রত্যক্ষ অনুভূত হোল সুকান্তের মধ্যে। ভাবের নিটোলতায়, অনুশীলিত সারল্যে সুকান্তের কাব্য অপূর্ব ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে সুকান্তকে একজন সার্থক রবীন্দ্র-অনুসরণকারী কবি বলা যায়।

'সূর্য প্রণাম' কবিতার মধ্যেই প্রথম বহির্বিশ্বের সংবাদ জানা যায়। সূর্য প্রণাম জানাতে গিয়ে সুকান্ত বলেছেন,

"বিশ্বের আজ শান্তিতে অনাসক্তি,
সভ্য মানুষ যোদ্ধা,
চলেছে যখন বিপুল রক্তারক্তি,
তোমারে জানাই শ্রদ্ধা।"

অবশ্য সুকান্তর কবিতাগুলোর রচনার সঠিক দিন তারিখ পাওয়া যায় না। কিছু কিছু কবিতার রচনার তারিখ বলে যেগুলো উল্লেখিত হয় সেগুলোও নিঃসন্দেহ নয়। সেজন্য কবিতার বক্তব্য থেকে যেটুকু অনুমিত হয় তাই নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। কাব্য পাঠেই মনে হয় পশ্চিমী হাওয়াব আগমনী সুকান্তের প্রাথমিক পর্বের শেষ দিকে তাঁর মনেও নাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। উষ্ণ দ্বিপ্রহরে কাব্য রচনার দুঃসহ চেষ্টায় তাঁর মুহূর্ত কাটলেও কবির চোখ কান খোলা। তিনি দেখতে পান পার্কের বেঞ্চিতে কত বেকার যুবক গঞ্জনার তীব্র জ্বালায় বিবাগী হয়ে ওঠে, রেস্তোরাঁর দুর্লভ আসরে অর্থনীতি ইতিহাসের চর্চা চলে, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খবরে সংবাদপত্রের পাতা ভরে। এই বিষণ্ণ বাস্তবতা কবির দৃষ্টি এড়ায় না; কিন্তু তার মধ্যে নতুন কিছু তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। মনে হয় "ভাগ্য সবই মিতে'। সেজন্য রাম আর বারণের মধ্যেও কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। বাস্তবে যে দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব বর্তমান তাকেও যেন ফ্যাকাশে মনে হয়। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন যখন প্রাণে সাড়া জাগায় না তখন বর্তমানের ধূসরতাকেই বেশি বাস্তব বলে মনে হয়। এখানে অনিশ্চয়তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেজন্য কবি বলেন:

চুপ করে বসে থাকো অন্ধকার ঘরে এক কোণে ঃ—
রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ম কশা। (পরিবেশন)

মৃত্যুর চিন্তায় আচ্ছন্ন মন স্বাভাবিকভাবেই থাকে বিবিক্ত। বিবশ জীবনে উদ্যোগ অর্থহীন। তখন কবির স্বতই মনে হয় ঃ

জন্মের প্রথম কাল হতে,
আমরা বুদ্বুদ মাত্র জীবনের স্রোতে।
এ-পৃথিবী অত্যন্ত কুশলী,
যেখানে কীর্তির নামাবলী,
আমাদের স্থান নেই সেথা—
আমরা শক্তের ভক্ত, নহি তো বিজেতা।। (বুদ্বুদমাত্র)

সেখানে আশা শুধু ছলনা, স্বপ্নের অর্থ ভ্রান্তি। শীতল কোমল অন্ধকার যেখানে জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে সেখানে "প্রচ্ছন্ন স্বপন' তো "আক্ষরিক মিথ্যার পাষাণ" হবেই। তাছাড়া কবি যখন বলেন :

অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে ; প্রতিবার
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর বিস্তার। (আলো-অন্ধকার)

তখন আলো আর অন্ধকার ঘেরা পৃথিবীতে আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই বেশি প্রত্যক্ষ এবং সত্য বলে মনে হয়। যদিও তিনি উপলব্ধি করেন আলোর অস্তিত্ব মিথ্যে নয়, "ভুঁই-চাপা সুরভির মরণ অস্তিত্বময় নয়", তবু তাকে স্বীকার করে নিতে যেন প্রতি পদে একটা আশঙ্কা। আলো অন্ধকারের এই দ্বন্দ্বে কবিচিত্ত বিক্ষুব্ধ। অন্ধকারের উর্ধ্বে উঠে আলোয় অবগাহনের একটা প্রচ্ছন্ন আকুতি বর্তমান কিন্তু যেন পথ নির্দেশের একান্ত অভাব।

এক ভীষণ দ্বন্দ্বে কবি যেন বন্দীশালায় আবদ্ধ। দ্বন্দ্ব আছে বলেই অবশেষে তিনি যেন সাময়িকভাবে যুদ্ধে জয়ী হয়ে আত্মঘোষণায় বলে উঠেন ঃ

ঠাণ্ডা হাওয়ায় তীব্র বাঁশির ছন্দ
মনেরে জাগায় সাবধান হুঁশিয়ার!
খুঁজে নিতে হবে পুরাতন হাতিয়ার
পাণ্ডুর পৃথিবীতে। (প্রতিদ্বন্দ্বী)

অবশেষে কিন্তু উপলব্ধি করেছেন পুরাতন হাতিয়ার দিয়ে মনকে সঠিকভাবে জাগানো যাবে না। জগৎ ও জীবন নিরন্তর গতিশীল। নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ এই সমাজ। নতুন আদর্শ, নতুন প্রতীতী ব্যতীত দ্বন্দ্ব মথিত পুরাতনী থেকে স্বপ্নের জগতে উত্তরণ সম্ভব নয়। তিনি উপলব্ধি করেছেন এক বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক মহৎ সত্যকে, মহৎ সম্ভাবনাকে।

মহা ঝড়ের অদৃশ্য আঘাতে মরু-প্রান্তর অবশ হয়ে পড়েছে। চারদিকে অদ্ভুত চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। সেই চাঞ্চল্য জনতার চাঞ্চল্য। জনতার জোয়ারে কবির একক পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

...রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে
ডাক এল —
সভ্যতার ডাক —
নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত পরোয়ানা
আমাকে চিহ্নিত ক'রে গেল।
আমার একক পৃথিবী
ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে। (১৯৪১ সাল)

জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমদিকে সুকান্তের দ্বিধা কাটেনি। চর্তুদিকে ধ্বংসের উন্মত্ততা, বিভেদ বিচ্ছেদের হানাহানি স্বাভাবিক সৌন্দর্যপ্রিয় কবি মনে নানা জিজ্ঞাসা জাগাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতই এর সার্থকতা সম্পর্কে কবির মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল:

আজ জীবনেতে নেই অবসাদ!
কেবল ধ্বংস, কেবল বিবাদ —
এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ।
পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ। (তরঙ্গ ভঙ্গ)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও প্রথম দিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ধনিক রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরেব বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত। এই যুদ্ধে তাদের কোন কল্যাণ নেই, দাবার গুটির মত তারা কেবল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার। তাই আপাত চিন্তায় তাদের কাছে পুরনো দিনকে শ্রেয় বলে মনে হয় ঃ

বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণধারণের শক্তি,
তাইতো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভাল মনে হয় আজ পুরনো দিন,
আমাদের ভালো পুরনো, চাই না বৃথা নবীন।।(ঐ)

এই পলায়নী মনোভাব বেশিদিন থাকতে পারে না। আক্রমণ যতক্ষণ বাইরে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার থেকে দূবে থাকা সম্ভব; কিন্তু যে মুহূর্তে আক্রমণ একবারে দোর গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়, তখন সব চিন্তার জড়তা এক মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। আত্মরক্ষার তাগিদেই নিষ্ক্রিয়তার সব যুক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। গত বিশ্বযুদ্ধ যখন একেবারে ভারতবর্ষের বুকের উপর এসে পড়ল, আসামে, চট্টগ্রামে ফেনীতে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হোল, তখন দিকে দিকে 'জনরক্ষা সমিতি' গড়ে উঠল। কবি তখন নিজের একার গৃহ-কোণ ছেড়ে বলে উঠলেন ঃ

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। (উদ্যোগ)

সুকান্তের কবি-ভাবনায় যুগান্তর সূচিত হোল। তখন দেশী বিদেশী রাজনীতির প্রবল ধাক্কায় ছাত্র আন্দোলন তীব্রাকার ধারণ করেছিল। প্রথম অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি। সেই আলোড়নের প্রবল বেগ সুকান্তের নিষ্ক্রিয়তা, নৈরাশ্য আর উদ্বেগকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সুকান্ত মিশে গেল ছাত্র আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে। স্পষ্টতই সুকান্ত এল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গেল সুকান্তের কবিতার ভাব, ভাষা ও রীতি।

'সূর্যপ্রণাম' -এ যে বিহ্বলতা ছিল 'প্রথম বার্ষিকী'তে আর তা নেই। এখন কবির প্রাণে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের চেয়ে ক্ষোভ জমেছে বেশি। যে রবীন্দ্রনাথ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে একদিন জানিয়েছিলেন চরম ধিক্কার, সেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে — বাইশে শ্রাবণে ব্যথিত জনতার নিঃশব্দ বেদনা— "তুমি হেথা নাই"। ক্লেদক্লিষ্ট পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ না থাকলেও তাঁর উত্তরসাধক আছেন। তাই রাবীন্দ্রিক প্রকাশভঙ্গীতেই সুকান্ত ব্যক্ত করেন ঃ

এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;
স্বার্থের প্রাচীরতলে মানুষের সমাধি রচনা,
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে—
আজিকার মানুষের জয়;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়।। (প্রথম বার্ষিকী)

সুকান্তের নৈরাশ্য আর বিষণ্ণতা সক্রিয় উদ্যোগে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হোল। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা তার পরিচয় পাব।

তৃতীয় অধ্যায়
ফ্যাসিবিরোধী কবিতা

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। এই সংকট মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও কঠোরভাবে আঘাত করে। যুদ্ধের সময় চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে যে সকল পাতিবুর্জোয়া শিল্প ব্যবসায়ের নানা দিকে নিজেদের নিযুক্ত করেছিল যুদ্ধের পরে সেই চাহিদা কমে যাওয়ায় পুঁজিবাদের নানা প্রতিযোগিতা ও কারসাজির ফলে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের যে প্রসারতা দেখা দিয়েছিল যুদ্ধের পরে তাদের অনেকের চাকুরী চলে যায়, ডাক্তারী, আইন ব্যবসায়েও অত্যাদিক ভীড় হওয়ার পূর্বেকার আয় এবং জীবনযাত্রার মান সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, নতুন কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারী বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট এই অবস্থাকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী সংকটের আর্বতে পড়ে মরীয়া হয়ে উঠে। রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাদের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন করে প্রেরণা জোগায়। এই চরম সংকটের সময় পুঁজিবাদ দুটি উপায় অবলম্বন করে। একদিকে তারা নিজনিজ দেশের একচেটিয়া অধিকাবভুক্ত পুঁজিবাদকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশের সুবিধা করে দেওয়ার স্বার্থে এবং মোটামুটিভাবে তাদের সুসংহত হতে সাহায্য করার জন্য ব্যাঙ্ক, বীমা ও কোন কোন শিল্প জাতীয়করণ করে, ভূমিব্যবস্থার রদবদল করে; এমনি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু একচেটিয়াপতি বা পুঁজিবাদকে অসুবিধায় ফেলবে এমন কিছু তারা করতে পারে না। অন্যদিকে নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে তারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে এবং শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার নানা প্রচেষ্টা চালায়। এই ব্যবস্থাকেই সংক্ষেপে বলা যায় ফ্যাসিবাদ।

ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের কপট চাতুরী এবং সন্ত্রাসমূলক শাসনের নীতিবাদ। আসলে নিয়মতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুরনো পদ্ধতিতে যখন শাসন চালিয়ে যেতে অক্ষম হয় তখন তারা নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসমূলক শাসনের নীতি গ্রহণ করে। এর স্বরূপ প্রথম ধরা দেয় না বলেই বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ফ্যাসিবাদের পুঁজিবাদ-বিরোধী চাতুর্যপূর্ণ অস্পষ্ট বাজারী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়। ফ্যাসিবাদ জনগণের জরুরি অভাব ও দাবীগুলি সামনে তুলে ধরে নানা বাকচাতুরীর সাহায্যে জনগণের কাছে আবেদন জানায় এমন কি সময় সময় জনগণের বিপ্লবী ঐতিহ্যের ওপরও আবেদন জানায়।

এই আবেদনে অনেক শ্রমিক নেতা যারা নিজেদের একসময় 'সোসালিস্ট' বলে অভিহিত করত তারাও আকৃষ্ট হয়। হিটলার মুসোলিনীও একসময় 'সোসালিস্ট' বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। পরে তারাই লাগামবিহীন উগ্র স্বাদেশিকতা ও আগ্রাসী যুদ্ধের নীতি নিয়ে অন্যদেশ

এবং মেহনতী মানুষের ওপর সবচেয়ে হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর তাদের নগ্ন আক্রমণ দেখা যায়। বিজ্ঞান, শিক্ষা, যুক্তিতর্ক, সংস্কৃতিব বিকাশ এবং উদারনৈতিকতাকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। তখন তারা প্রচার করে ধর্ম, জাতীয় আদর্শবাদের প্রতি মোহ, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর অস্বীকৃতি, অলৌকিকতা আধ্যাত্মিকতা, কুসংস্কার, আদিমকালের কৃষ্টি, বলপ্রয়োগের নীতি, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বাগাড়ম্বরের ন্যায় সকল প্রকারের সঙ্কীর্ণবাদ। সেজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, পুস্তক পোড়াতে আরম্ভ করে। তারা ইতিহাসকে বিকৃত করে।

তিরিশের দশকে ফ্যাসিবাদ তার নগ্নরূপ ধারণ করে। প্রথমে ইতালিতে দেখা গেলেও পরে এটা আর ইতালির কোন বিশেষ ব্যাপার হয়ে রইল না। অ্যাবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনে তার আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়ে। সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মানুষ ফ্যাসিবাদের হিংস্রতায় আতঙ্কিত হয়ে ১৯৩৩ সালেই সংস্কৃতিরক্ষার বিশ্বলেখক-সম্মেলনে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ম্যাক্‌সিম গোর্কী, রম্যা রঁলা, টমাস ম্যান, আন্দ্রে মাল্‌রো প্রমুখ লেখকেরা। বাংলাদেশের সচেতন মানুষের মনেও তার সাড়া জাগে। ১৯৩৫ সালে কোলকাতায় যুদ্ধবিরোধী দিবস পালিত হয়।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্মৌতে প্রথম প্রগতি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত হিন্দী লেখক প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা।

এমনি করে রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু প্রমুখের নেতৃত্বে যখন বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংঘ গড়ে ওঠে তখন সুকান্ত অনেক ছোট। সেজন্য স্পেনে এবং চীনে ভারতীয়দের উদ্যোগে সক্রিয় সাহায্য পাঠানোর ভূমিকায় তাঁর কোন অবদানের প্রশ্নই উঠে না। সেটা ছিল তিরিশ দশকের কথা। চল্লিশের দশকে জাপ বোমারু বিমানে ফ্যাসিবাদ যখন বীর বিক্রমে ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এল তখন স্বভাবতই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নৈতিক প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ রইল না। তখন আন্দোলন গড়ে উঠল প্রতিরোধের।

সময়টা ছিল ১৯৪১ সালের শেষের দিকে। এবছরের ২২শে জুন নাৎসী বাহিনীর সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকৃতি পাল্টে গেল। গোটা যুদ্ধটাই তখন পরিণত হোল ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের নাম 'জনযুদ্ধ'। তখন রাজনৈতিক জীবনে ভীষণ জটিলতা । দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জ্বালায় 'স্বাধীনতা'র প্রয়োজন একটা বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ দীর্ঘকালের। আপাতদৃষ্টিতে সেই ইংরেজ সরকার যদি বিব্রত বা আক্রান্ত হয়, তার প্রতি আমাদের কোন সমর্থন থাকতে পারে না। তার উপর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল অংশের অন্যতম নায়ক সুভাষচন্দ্র ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে যখন সেই আক্রমণকারীদের পক্ষে যোগ দিলেন এবং দিনের পর দিন যখন সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে জাপানকে মুক্তিদাতা বলে প্রচার করে শত্রুপক্ষের রেডিও ঘোষণা করতে লাগল তখন ইংরেজ সরকারের প্রতি বীতরাগ আরও প্রবল হয়ে দেখা দিল। অনেকেই মনে মনে আক্রমণকারী জাপানকে ভাবী 'লিবারেটর' বলে অভিহিত করতে লাগলেন। কিন্তু ব্যাপারটা যেখানে

আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজোড়া সমস্যা সেখানে ঘরোয়াভাবে তাকে বিচার করা চোরাবালির মধ্যে পা দেওয়ারই নামান্তর। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার কোন মূল্যই স্বীকার করল না।

অথচ ১৯৪১ সালের ২২শে জুনের পর বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি হোল বিশ্বগ্রাসী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবমুক্তির যুদ্ধ। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তখন (ডিসেম্বর, ১৯৪১) সঠিকভাবে এক প্রস্তাবে বলেছিল, "The Soviet Union has stood for certain human, cultural values and social values which are of great importance to the growth and progress of humanity. The Working Committee considers that it would be a tragedy if the cataclysm of war involved the destruction of this endeavour and achievement." ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েতের মানবমুক্তির মহান সংগ্রামী ভূমিকাকে দেশের সামনে বিরাট প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরল। জওহরলাল নেহেরু যারা জাপানকে লিবারেটর বলে মনে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দাস-মনোভাব বলে ধিক্কার দিলেন। তিনি বললেন, "It is a slave's sentiment, a slave's way of thinking to imagine that to get rid of one person who is dominating us we expect another person to help us and not dominate later. Free men ought not to think that way. It distreses me that any Indian should talk of the Japanese liberating India."

হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করবার কয়েকদিন পরেই (৩রা জুলাই, ৪১) স্তালিন বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তিত ভূমিকা সম্পর্কে বলেছিলেন, "ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশাত্মক যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপম্মুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিজমেব পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইওরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।

'ইওরোপ ও আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সংগ্রাম চালাইতেছে, মাতৃভূমির মুক্তিসাধনের জন্য আমাদের এই সংগ্রাম উহার সহিত একযোগে পরিচালিত হইবে। মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলার ফ্যাসিস্ট বাহিনীর এই অভিযানের যারা বিরোধী ও স্বাধীনতার যারা সমর্থক, তারা সকলেই এই দলে সম্মিলিত হইবে।"

বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর সঙ্গে একযোগে জাপানের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা থাকলেও জাপান যুদ্ধের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে নিজের আধিপত্য বিস্তারের নানা কূট কৌশল নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করে কালক্ষেপ করছিল। অবশেষে নভেম্বরে জাপান এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ডিসেম্বর থেকে তারা বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। সে অনুযায়ী তারা সাতই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রমণ করে। তারপর দ্রুত গতিতে জাপানের সৈন্য বাহিনী থাইল্যান্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মার দিকে এগিয়ে চলে। 'আটই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এগারোই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তারাও তার বিরুদ্ধে পাল্টা

যুদ্ধ ঘোষণা করলো।" একই দিনে অক্ষ শক্তি বর্গ অর্থাৎ জার্মানী, ইতালি ও জাপান এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বলল, "বর্তমান যুদ্ধের বিজয় গৌরবমণ্ডিত পরিসমাপ্তির পরে ইতালি, জার্মানী ও জাপান সমগ্র বিশ্বে একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য, সাতাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির আদর্শ অনুযায়ী পরস্পর একযোগে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সচেষ্ট হবে।" অর্থাৎ তিন ফ্যাসিস্ট শক্তি যে সমগ্র বিশ্বকে পদানত করতে চায় সেটা আর তারা গোপন রাখল না।

সারা পৃথিবীব্যাপী যে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গিয়েছিল সে দিকে আর কোন সচেতন মানুষ নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। বিশ্বব্যাপী উদ্বেগে বালক কবি সুকান্তের স্বপ্নমুগ্ধতাকে নাড়া দিল। সত্য যে কঠিন তারই পূর্বাভাস এল সুকান্তের কবিতায় :

দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ—
বিস্ফারিত হিংস্র-বেদনায়। (পূর্বাভাস)

জাপ বাহিনীর দ্রুত সাফল্যে সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দারুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ৮ই ডিসেম্বর জাপানীদের মালয় উপদ্বীপে অবতরণ : ১০ই ডিসেম্বর Prince of Wales ও Repulse নাম বিখ্যাত দুটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস, ১৩-২৫ শে ডিসেম্বর ফিলিপিনের কয়েকটি বড় ঘাঁটি দখল, ২রা জানুয়ারি (১৯৪২) ম্যানিলার পতন, ৩১শে জানুয়ারি মালয়ের পতন, ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন জাপানের ঝটিকা বিজয়েরই প্রমাণ।

সিঙ্গাপুরের পতনের চারদিন পর ১৯শে ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র 'আজাদহিন্দ রেডিও' থেকে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন :

"The fall of Singapore means the collapse of the British Empire, the end of the iniquitious regime which it has symbolised and the down of a new era in India history... And the enemies of British Imperialism are the natural allies of india-- just as the allies of British Imperialism are to-day our natural enemies."

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার শাখা সংগঠনগুলো তখন ফ্যাসিবাদের স্বরূপ, সোভিয়েতের সমাজতন্ত্র, জনযুদ্ধ, মিত্রপক্ষের জয়ের তাৎপর্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে জনগণকে বাস্তব উপলব্ধির করাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তারই অনুষঙ্গ হিসেবে গল্প, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক তখন প্রচারিত হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ বলে টোকিও-বার্লিনের বেতার ভাষণ তখন জনমনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। সুকান্ত বয়সে ছোট হলেও তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির আন্তর্জাতিক চেতনায় এতে বিভ্রান্ত হলেন না। তিনি জনৈক বন্ধুর প্রতি এক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে সেই

মনোভাব প্রকাশ করেছেন :

ভাল কথা, আমি প্রতিদিন
টোকিও, বার্লিন
শুনি—
আর জাপানের পদধ্বনি শুনি।...
আমাদের যখন দরকার
জাপান সরকার
ইংরেজ নিধনকারী পাঠাবে সৈনিক,
কিন্তু ক-টা অবাধ্য চৈনিক
অন্তরায়
আমাদের স্বরাজ পাওয়ায়।
আর অন্তরায় শুধু সাম্যবাদী দল
স্বাধীনতা দেওয়া নাকি জাপানীর ছল।
—এই কথা রাষ্ট্র করে তারা
ব্রিটিশের গৌরীসেনী অর্থে পুষ্ট যারা।

এই কবিতায় মধ্যে কাব্যের চেয়ে তখনকার দিনের পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট কর্মীর বক্তব্যই স্পষ্ট প্রকাশ লাভ করেছে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যারা ফ্যাসিস্ত বাহিনীর মাধ্যমে মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন তারা বাস্তবকে অস্বীকার করেছিলেন। বিপদ যখন অতি দ্রুত কাছে এসে পড়েছে তখন আর যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই। অবকাশ নেই ইনিয়ে বিনিয়ে কাব্য লেখার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে লাভ করেছিলেন বলেই সুকান্ত লিখেছিলেন :

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে ;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া ছবি ভাসছে—
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশি জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।
আজকের দিন নয় কাব্যের—
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের। (জাগবার দিন আজ)

এই কবিতায় কাব্যের সোনালী পাড় বোনা নেই। জনতার জোয়ারে কবি কল্পনার একাকীত্ব পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। তিনি জনতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্যকথার দ্বারা উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, "চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেত না।" লাঞ্ছিত মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দানবের মরণযজ্ঞের পার্থক্য দেখিয়ে তাদের চেতনা উদ্রেক করতে বলেন :

পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই একসঙ্গে ;

সংগ্রাম শুরু করো মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ করো সকলে
বাঁচাব আমার দেশ, যাবে না শত্রুর দখলে। (ঐ)

কবির এই আবেদন নিষ্ফল হয়নি। তখন সত্যি সাধারণের মধ্যে প্রবল জাগরণ দেখা দিয়েছিল। ১৯৪২ সালে অখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশন, কিষাণ সভার নাগপুর অধিবেশন, পাটনায় ছাত্র সম্মেলন সেই জাগরণেরই দ্যোতক। জনতার জাগরণ যত উদ্বেল হয়ে ওঠে তত শত্রুরা অতিস্কিত হয়ে পড়ে। তখন তারা সেই জাগরণকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য চোরা গলির পথ আশ্রয় করে গুপ্তঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হয় জাপানীদের হাতে। আর সেদিনই একদল গুণ্ডা ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলনে শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকায় সাহিত্যিক ও কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। রেঙ্গুনের পতনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই হত্যাকারীদের চিনতে ভুল হয় না। প্রথমদিকে মনে হয়েছিল এরা ভ্রান্ত। সত্যি সত্যি দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য তারা ব্যগ্র। সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করিয়ে দিল ওদেব পিছনে ছিল আসলে বিদেশী চর। ছুরির আঘাত যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি প্রত্যক্ষ ভাষায় সুকান্ত লিখেছেন :

শংকাকুল শিল্পীপ্রাণ, শংকাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি।
হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত,
দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা তো নয় ভ্রান্ত
বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্-বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে। (ছুরি)

শহীদের খুনে দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করা হলো দেশরক্ষার এবং অপরদিকে দেশকে বিদেশী-চর শূন্য করবার। সোমেন চন্দের মৃত্যুতে দলমত নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক দৃঢ়ভাবে হত্যাকারীদের নিন্দা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'। ১লা এপ্রিল থেকে পাক্ষিক "জনযুদ্ধ" প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু সংবাদপত্র প্রকাশ করে নয়, গল্পে উপন্যাসে নাটকে কবিতায় গানে অভিনয়ে ছবিতে পোস্টারে ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধের তাৎপর্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। স্বভাবতই শিল্প-সাহিত্যে তখন বিরাট উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল।

তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও পুরোদমে চলছিল। ইংরেজ সরকার অবস্থা প্রতিকূল দেখে নেতাদের সঙ্গে আপোষ আলোচনার জন্য ক্রিপস মিশন নিয়ে আসে। আলোচনা চলবার সময়েই (৬ই এপ্রিল, ১৯৪২) কোকোনদ ও ভিজাগাপত্তম বন্দরে জাপানী বিমান আক্রমণ হয়। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হবার পরে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে, কংগ্রেস বেআইনী

ঘোষিত হয়। আগস্ট আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে দেশের বহু স্থানে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড চলে। আর সেই সময়ে আবার জাপানীরা চট্টগ্রামে এবং ফেনীতে বোমাবর্ষণ করে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)। সুকান্ত এই ঝড়ের দিনেই কমিউনিস্ট পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মী হিসেবে জনযুদ্ধ সম্পর্কে, জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে তোলাই ছিল তখন সর্বপ্রধান কাজ। এই কাজ করতে গিয়েই সুকান্তের কবিতার কেবল গতি বদল হোল না রূপও বদল হোল। কাব্যের মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে জোরালোভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর কাব্য হয়ে পড়ল জনতার কাব্য। জাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৯৪২ এর জুলাই মাসে 'জনযুদ্ধের গান' নামক একটি সঙ্গীতের সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে বিনয় রায়ের চাষী গেরিলার গান 'হোই হোই হোই', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান', মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোভিয়েত ভূমি বিশ্বশ্রমিক প্রিয়', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বজ্র কণ্ঠে তোলো আওয়াজ' প্রভৃতি গান ছিল। এগুলো নিশ্চয়ই সুকান্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই দু-মাস পরে যখন এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল তখন তাতে সুকান্তের 'জনযুদ্ধের গান' সংযোজিত হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন :

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ
শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ,
জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন
মিলছে ভারত আর বীর মহাচীন।
... ...
জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই,
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।

এই ভয়ানক দুর্দিনে অনেক অকমিউনিস্টও সচকিত হয়ে উঠলেন। বুদ্ধদেব বসুর মত কমিউনিস্ট বিদ্বেষীও তখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ছিলেন। 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' নামক এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর উদ্বেগের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন :

"তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ মুখোস খসে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইলো না। জলে স্থলে আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী. শুধু যোদ্ধ হত্যা নয়, নারী হত্যা, শিশু হত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তা ছাড়া সত্যের সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌচেছে। আজ একথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। আমি তো অতি ভালোমানুষ সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নিরিবিলি ঘরের কোণে কোণে বসে পড়াশুনো করতে চাই আর মাঝে মাঝে এক আধটা কবিতা লিখতে চাই কিন্তু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্তে আমার বাসস্থান, প্রিয়জন আমার সমস্ত আশা ভালোবাসা

সুদ্ধ আমি একেবারে লোপাট হয়ে যেতে পারি। কিংবা কোনো আসুরিক শক্তি হয়তো কেড়ে নেবে আমার কলম, থামিয়ে দেবে সমস্ত কর্মোদ্যম, পাথর চাপা দেবে আত্মপ্রকাশের আবেগে — তাহলেই বা আমার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে আমার ঘরে বসে আপন কাজ করবার অধিকার, যার ওপর আলো-হাওয়ার মতোই মানুষের জন্মগত দাবি, এও বিশ্বের রাজনীতির জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা। আমার পক্ষে এবং অনেকের পক্ষেই—এ উপলব্ধি অতি মর্মান্তিক। কখনো ভাবিনি মানুষের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এ-অধিকার থেকে যুগে যুগে তারাই বঞ্চিত হয়েছে যারা বীজ বোনে, যারা তাঁত চালায়, যারা ধান কাটে, যারা তাদের পেশী-বহুল দৃঢ় স্কন্ধে সমস্ত জীবনের ভার বহন করে আসছে। আজকের দিনে এমন এক রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকেই স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, এবং সকল মানুষকেই লৌহ শাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না করলে যাদের চলে না। তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখ বন্ধ করা তাদের দরকার, কেননা কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক। এরই নাম ফ্যাসিজিম। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজিম-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেই জন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।"

বুদ্ধদেব বসুর মত তখন অনেকেই অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজম-এর ব্যাখ্যা করতে না চাইলেও মাথার ওপর সমূহ বিপদের কালো-ছায়া দেখে তার বিরুদ্ধে স্বভাব-বিরোধী শিবিরে সমবেত হয়ে ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছিলেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যের কপচানি থেকে প্রত্যক্ষ বাস্তব তখন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন জাতীয় সরকারের জন্য জাতীয় ঐক্যের শ্লোগান দিয়ে বলেছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে যদি আপনি ইচ্ছুক, বৈদেশিক শাসন পাশ হইতে স্বদেশের মুক্তি যদি আপনার কাম্য, জাপ আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে যদি আপনি বদ্ধপরিকর, তাহা হইলে কমিউনিস্ট পার্টির সহিত একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করুন, কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তির জন্য জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করুন, ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের চেষ্টা হইতে দেশ-প্রেমিকদের ফিরাইয়া আনুন, কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, এবং জাতীয় আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন।"

তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংশয়, দোদুল্যমানতা, জাগ্রত চেতনা প্রভৃতির সুন্দর আলেখ্য সুকান্ত রচনা করেছেন "মধ্যবিত্ত '৪২" কবিতায়। তার আগে কলকাতায় জাপানীরা চারদিন ধরে বোমা ফেলেছে (ডিসেম্বর, ১৯৪২) চট্টগ্রামে ফেনীতে জাপানী বোমা পড়েছে। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমান বন্দর আক্রান্ত হয়েছে, আসামে এবং আবার চট্টগ্রামে জাপানী বিমান আক্রমণ করেছে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩) সুকান্ত লিখেছেন :

পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে,
এখানে খানিক তারই পূর্বাভাস
পাচ্ছি, এখন বইছে পুব-বাতাস।
... ...
সভয়ে এদেশে কাটছে রাত্রিদিন
লুব্ধ বাজারে রুগ্ন স্বপ্নহীন।
সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে।
প্রথমে তাদের অন্ধবীর মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতিপদে ;
দেখেছি সুবিধা নেই এ কাজ করায়
একক চেষ্টা কেবলই ভুল ধরায়।
এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
আবার বোমারু রক্ত পান করে,
ক্ষুব্ধ জনতা আসামে চাটগাঁয়ে,
শাণিত-দ্বৈত-নগ্ন অন্যায়ে ;
তাদের স্বার্থ আমার স্বার্থকে,
দেখছে চেতনা আজকে এক চোখে। (মধ্যবিত্ত '৪২)

এই কবিতায় অতি সংক্ষেপে সংবেদনশীল ভাষায় ১৯৪২ সালে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে উদ্বেগ, সংশয় এবং চেতনা বর্তমান ছিল তা স্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে। ঐ সময়কার মানুষের মনের প্রতিটি কথা জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে সুকান্তের কবিতায়। তাঁর 'উদ্যোগ' কবিতায়ও ফেণীতে, আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতার গর্জনের কথা আছে :

মূল শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখ কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
... ...
সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব-দরজায়,
ফেণী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।
বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সু-তীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। (উদ্যোগ)

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমানঘাঁটিতে জাপানীরা আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করেছিল। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত কিন্তু গভীর চেতনাদৃপ্ত মনে আতঙ্কের চেয়েও ক্রোধ প্রবল,

দৃঢ় হয় প্রতিরোধের শপথ। সার্থক প্রতিরোধ শ্রমিক কৃষকের সংগঠিত শক্তির দ্বারাই সম্ভব। সেজন্য পতেঙ্গার জবাব দেবার জন্য কারখানায় কারখানায় শ্রমিক এবং মাঠে মাঠে কৃষকেরা যে দৃঢ় শপথ নিয়ে প্রতিরোধের প্রতীক্ষায় আছে তার কথাই কবি সুকান্ত ঘোষণা করে জনমনে সাহস সঞ্চার করেছেন :

আশংকা নয় আসন্ন রাত্রিকে
মুক্তি-মগ্ন প্রতিজ্ঞা চারিদিকে
হানবে এবার অজস্র মৃত্যুকে ;
জঙ্গী-জনতা ক্রমাগত সম্মুখে।

... ...

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।
তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির। (জবাব)

কয়েকমাস পরের লেখা 'চট্টগ্রাম ঃ ১৯৪৩' কবিতায় তাৎক্ষণিক বীতরাগ বিদূরিত। ঐতিহাসিক চেতনায়, অনুভবের প্রগাঢ়তায়, সার্থক রূপকল্পের ব্যবহারে অথচ সময়ের প্রোজ্জ্বল উপস্থিতিতে এই কবিতাটি কবি সুকান্তের প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই কবিতায় তিনি বীর-ভূমি চট্টগ্রামের অতীত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নাৎসীবাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ স্তালিনগ্রাদের মতো লৌহ শপথে জাপ আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানান। লোহার গরাদ বিদীর্ণকারী চট্টগ্রামের সংকল্পের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।"

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টগ্রাম!
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন।

... ...

তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দুলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয়নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—

যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।।

(চট্টগ্রাম ঃ ১৯৪৩)

১৯৪২-এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে (২০-২৫শে) কলকাতায় পরপর কয়েকদিন জাপ বিমান বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে। ঠিক ঐ সময়েই (১৯-২০শে) কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয়। অনেকদিন ধরেই কলকাতায় জাপ বিমানের আশঙ্কায় বহু লোক কলকাতা ছেড়ে দূর গ্রামে বা শহরে পালিয়ে গিয়েছিল। এবার প্রত্যক্ষ বিমান আক্রমণের পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল দারুণ আতঙ্ক, ত্রাস এবং অস্থিরতা। সুকান্তের মনে কিন্তু এখন আর ভয় নেই। এ সময়ে তাঁর মনোভাব জানিয়ে তিনি বন্ধুকে লিখেছেন, "গত বছরে এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল, ...এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। ...এখন বর্তমান বিপদ।" তা ছাড়া তিনি এখন রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত। বিশেষ করে মার্কসবাদী চিন্তাধারায় শিক্ষিত। অতএব দুইয়ে দুইয়ে চারের মত কোন কার্য কারণের ব্যাপার বুঝতে তাঁর এখন বেশি সময় লাগার কথা নয়। তাই তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন, পলায়নের পথে মুক্তি নেই। মুক্তি আছে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে, শ্রমিক কৃষক জাগরণে। তাই তিনি লেখেন ঃ

পালাবে বন্ধু ? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়
পথ নির্জন, রাত্রি বিছানা অন্ধকারে।
চলো, আরো দূরে? ক্ষুধিত মরণ নিরন্তর,
পুরনো পৃথিবী জেগেছে আবার মৃত্যু পারে। (পরিখা)

সেজন্য ঃ

নৈঃশব্দ্যের তীরে তীরে আজ প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্রহাতে।। (ঐ)

এই সহস্র প্রাণ কারা তাও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন :

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।
তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির। (জবাব)

ফ্যাসিবাদী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে দেখা দিয়েছিল কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর দিনগুলো। "রাজ পথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে", "পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু

আক্রমণ করে।'' তার ওপর ''নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন।'' সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর দুর্দিন। রাত্রির তপস্যার মধ্য দিয়ে যেমন ঊষার অরুণোদয় দেখা দেয় তেমনি মৃত্যুর পরোয়ানার মধ্য দিয়েই আসবে 'জীবনের জয়োল্লাস।' তাই কবি দৃঢ় কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ে আহ্বান জানান :

রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল। (বিবৃতি)

কারণ, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কারখানায় কারখানায় শ্রমিকের গভীর ঐক্যতান আর :

''অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে। (ঐ)

সেজন্য জাপ আগ্রাসন যখন বার্মা জয় করে ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়ে মণিপুর আক্রমণ করল তখন আর কবির ক্ষোভের সীমা রইল না। তখনো যারা জাপানের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তাদের প্রতি কবি কঠোর প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা বিধ্বস্ত বাংলাকে? (মণিপুর)

এই শত্রুদের সম্পর্কে তাঁর ঘৃণার শেষ নেই। এদের প্রতি মোহ থাকা অন্যায়, দেশদ্রোহিতা। কারণ ''শত্রুরা নিয়েছে আজ দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশ।'' ঐতিহাসিক চেতনা থেকে কবির দৃঢ় আস্থা শ্রমিক কৃষক এবং বিপ্লবী মানুষের ওপর। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় :

এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি
এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।
ওদের দুচোখে আজ বিকশিত আমার কামনা,
অভিনন্দন গাছে, পথের দুপাশে অভ্যর্থনা।
ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে। (ঐ)

সেজন্য সুকান্ত স্থির সংকল্পে বলতে পারেন ''ওদের দু চোখে আজ বিকশিত আমার কামনা।'' ওরা মুক্তির সংগ্রামকে সার্থক করে জয় পতাকা নিয়ে ফিরে আসে। পথের দুপাশে মানুষ প্রকৃতি সকলেই তাদের অভ্যর্থনা জানায়। কবির এ কামনা কেবল স্বপ্ন দেখা নয়। ইওরোপে তখন ফাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় শুরু হয়েছে। লালফৌজ দৃপ্তগতিতে এগিয়ে চলেছে। ফ্যাসিবাদের প্রথম নাটের গুরু ইতালির মুসোলিনী। তারই প্রথম পরাজয় শুরু হোল। আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরীয় ও বলকান অঞ্চলে 'মিত্র বাহিনী'র হাতে চরম পর্যুদস্ত হওয়ার পর ১৯৪৩-এর মার্চ মাসে সারা ইতালিতে শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভের ধাক্কায় মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির সেই গণঅভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়ে সুকান্ত লিখেছেন :

"ভেঙেছে সাম্রাজ্যস্বপ্ন ছত্রপতি হয়েছে উধাও ;
শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর। ...
ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ
বিক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎপাতে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।
যে উদ্ধত একদিন দেশে দেশে দিয়েছে শৃঙ্খল
আবিসিনিয়ার চোখে আজ তার সে দম্ভ নিষ্ফল। (রোম ঃ ১৯৪৩)

ওদিকে হিটলালের সোভিয়েত বিজয়ের দুঃস্বপ্ন অচিরে ব্যর্থ হোল। ১৯৪৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারি ভল্‌গায় জার্মানীর পরাজয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। জার্মানদের বাছাই করা তিন লক্ষ তিরিশ হাজার সৈন্য নিহত বা বন্দী হোল। সারা হিটলার-জার্মানীতে নেমে এলো শোকের ছায়া। নাৎসীদের পরাজয় যে অনিবার্য তারই যেন ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ইঙ্গিত পাওয়া গেল ফ্যাসিবিরোধী মোর্চার চূড়ান্ত বিজয়লগ্নের। ভল্গাতীরের শহর স্তালিনগ্রাদের কথা বলতে গিয়েই রাশিয়ার বর্তমান শাসকরা ভল্গা বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা স্তালিনগ্রাদের নামের বদলে ভোলগোগ্রাদ বলাই পছন্দ করেন। স্তালিন নামটাকে তারা ঐতিহাসিক তাৎপর্য থেকেও মুছে ফেলতে চান। যাই হোক, সুকান্তের 'চট্টগ্রাম, ১৯৪৩' কবিতায় এই স্তালিনগ্রাদের মুক্তি ফৌজের অজেয়-সংগ্রামের উল্লেখ আছে। স্তালিনগ্রাদের জয়ের মধ্যে তো রণকৌশলেরই জয়বার্তা নেই, আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জয়বার্তা। লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সর্বহারার যে নতুন যুগের সুচনা হোল সারা পৃথিবীর উৎপীড়িত ও শোষিত মানুষের কাছে তা আদর্শ হয়ে রইল। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হোল শোষণমুক্ত এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লেনিনের আদর্শকে সেজন্য সর্বহারা মানুষ চোখের মণির মত রক্ষা করে। সুকান্তের কবিতায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ। (লেনিন)

শুধু রাশিয়ায় নয়। "যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।" স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পরে ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে পার্টিজান আন্দোলন ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। আর সমস্ত দেশেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে পরিচালিত করেছে সেই

সেই দেশেব কমিউনিস্ট পার্টি। মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষায় এবং পথে যে পার্টি পরিচালিত। তাই কমিউনিস্ট কবি সুকান্ত আত্মঘোষণায় দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারেন :

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।। (ঐ)

সুকান্তের ইতিহাস চেতনা, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রতীতি এবং তার সঙ্গে কবি-কল্পনার সমাহার বিস্ময়কর। তাঁর চিন্তাধারায় কোন অস্পষ্টতা নেই, তার প্রকাশেও নেই ঋজুতার অভাব। তাঁর বক্তব্য প্রত্যক্ষ, ভাষা সহজ এবং ব্যঞ্জনা উদ্দীপ্ত। বাংলা কবিতার ভাষাকে অতি সহজে তিনি জনগণের ভাষার সঙ্গে একাত্ম করতে পরেছেন। কবি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য ছিল তা তিনি অপসারিত করতে পরেছেন।

চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে হিটলার ও গোয়েবলস ১৯৪৫ সালের ২রা মে আত্মহত্যা করে। ৮ই মে শেষরাত্রে নাৎসী বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। সুকান্তের 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশ্যে' কবিতায় সেই জয়ধ্বনি শোনা যায়। এই জয়ধ্বনি শান্তির, সভ্যতার, জনগণের সংগ্রামের, জনযুদ্ধের ঃ

ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,
পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।

যুদ্ধের বীভৎসতা ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (৩১শে মে, ১৯৪০)

"দাদামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়--
নইলে কেন এত অপব্যয়।"

বার্লিন পতনের পর সুকান্ত শুনতে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী। দিনবদলের পালা যখন সত্যই অনেক রক্তক্ষয়ের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে নেই। অথচ তাঁর মত কবির আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তাই সুকান্ত কামনা করেন ঃ

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণসংগীতের সুর ;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে। (ঐ)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি কিন্তু তখনো হয়নি। প্রাচ্য রণাঙ্গনে জাপ ফ্যাসিবাদ তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসোলিনী হিটলারের পরাজয়ের পর সেই যুদ্ধ কোমর-ভাঙা জাপানকে বেশিদিন চালাতে হয়নি। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ জাপানও আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর

করতে বাধ্য হোল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। শুরু হোল নতুন যুদ্ধ। এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সারা বিশ্বে দিকে দিকে সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় যুদ্ধের রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে স্বদেশে প্রত্যাবনর্তকারী বীর সৈনিকের অনুভবে আর প্রত্যয়ে সেই কথাই ঘোষিত হয়েছে। "যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে।" সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে ছিল দেশ বিদেশে। সৈনিক যুদ্ধ বলতে বিশ্বযুদ্ধের কথাই বুঝিয়েছে। কিন্তু আসল যুদ্ধ তখনো বাকী।

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।

কারণ,

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।।

সেই অন্ধকার দূরীকরণের জন্য চাই স্বাধীনতা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। যেখানে দারিদ্র্য থাকবে না, শোষণ থাকবে না। তার জন্য 'শেষ যুদ্ধ' শুরু করতে হবে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব দ্রুত পরিণতি লাভ করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। যেমন লাভ করেছে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মান, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, কোরীয় জনগণতন্ত্রী-সাধারণতন্ত্র, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভাকিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে।

কমিউনিস্ট সুকান্ত মার্কসবাদী চিন্তাধারায় সেই পরিণতিই চিন্তা করেছিলেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। এবার শুরু হবে 'দিন বদলের পালা' ঃ

আর এক যুদ্ধ শেষ,
পৃথিবীতে তবু কিছু জিজ্ঞাসা উন্মুখ।...
... ...
দিগ্বিজয়ী দুঃশাসন!
বহু দীর্ঘ দীর্ঘতর দিন
তুমি আছ দৃঢ় সিংহাসনে সমাসীন,
হাতে হিসেবের খাতা
উন্মুখর এ পৃথিবী ঃ
আজ তার শোধ করো ঋণ।
অনেক নিয়েছ রক্ত, দিয়েছ অনেক অত্যাচার,
আজ হোক তোমার বিচার।...

পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা ঃ
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এ জয়মালা ;
জানো না এখানে যুদ্ধ—শুরু দিনবদলের পালা।। (দিন বদলের পালা)

সেই যুদ্ধ শুরু হয়েছে নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে। আজাদহিন্দ দিবসে, রসিদ আলি দিবসে, নৌবিদ্রোহে, সারা ভারত ডাক তার ধর্মঘটে, তেভাগা আন্দোলনের অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে ; তবু দিন বদলের পালা শেষ হয় নি। কবি ১৯৪৬ সালে অনুভব করেছিলেন, "বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারিদিকে।" সেই বিদ্রোহ বিপ্লবের এখনো শেষ হয়নি। অসমাপ্ত বিপ্লবে তিনি শহীদ হয়েছেন। সেই বিপ্লবকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব রয়ে গেছে উত্তরসূরীদের ওপর। সুকান্তের কবিতা সেই বিপ্লবকে সমাপ্ত ও সার্থক করার প্রেরণা জোগাবে অনেক অনেকদিন ধরে।

সুকান্তের ফ্যাসিবিরোধী মনোভাবের কবিতাগুলো হোল ঃ বিবৃতি, চট্টগ্রাম, মধ্যবিত্ত, ৪২', জবাব, পরিখা, ছুরি, মণিপুর, ১৯৪১ সাল, রোম ঃ ১৯৪৩, পূর্বাভাস, উদ্যোগ, পরাভব, বিভীষণের প্রতি, জাগবার দিন আজ, হদিশ, দেয়ালিকা, প্রথম বার্ষিকী, তারুণ্য, মৃত পৃথিবী, জনযুদ্ধের গান, পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে, দিনবদলের পালা, প্রিয়তমাসু প্রভৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়
দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের কবি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বীভৎসতার কথা আমরা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে পড়েছি। ১১৭৬ সালে পদচিহ্ন গ্রামের শ্মশান হয়ে যাওয়ার কাহিনী মর্মন্তুদ ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন- "রাজপথে লোখ দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর।"

এক বৃহৎ অট্টালিকার ঘরের মধ্যে অন্ধকারে "এক দম্পত্তি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।"

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।" পঞ্চাশের মন্বন্তর তাকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুকান্ত লিখেছেন, "সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।"

প্রথম অধ্যায়ে এই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে তখন বিরাট সংকট। দেশের দোরগোড়ায় জাপানী আক্রমণ, দেশের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, 'ভারত ছাড়' হুমকি দিয়ে কংগ্রেসের নেতারা কারারুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের করুণ আর্তনাদ। বাঙলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে তখন কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যান্য দলীয় কর্মীরা তখন বিভ্রান্ত। অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধিতায় তারা সোচ্চার। একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উত্তেজনা, অন্যদিকে যুদ্ধ, মন্বন্তরে পীড়িত মানবিকতার প্রতি কর্তব্যবোধ তৎকালীন সচেতন তরুণকে নাড়া না দিয়ে পারলো না। রাজনীতিটা তাদের কাছে প্রত্যক্ষরূপে ধরা দিল। জনযুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষীয় প্রচারে তাদের পথ বেছে নিতে অসুবিধা হোল না। তাদের রাজনীতি একটি সম্পূর্ণ জীবনবোধ এবং আচরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দলে দলে কমিউনিস্ট কর্মীরা যেমন জাপবিরোধী প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠল অন্যদিকে তেমনি তারা আর্ত মানুষের সেবায়

এবং সাহায্যে লঙ্গরখানায় রেশনের লাইনে অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগল। একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি তখন তার সাংস্কৃতিক শাখাকে দিকে দিকে উজ্জীবিত করে তুলল। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কিশোর, লেখক, শিল্পী প্রত্যেকের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল।

"কিশোর সুকান্ত এই রাজনীতির অংশীদার হয়েছিল, সে সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এই রাজনীতির প্রেরণায় একেবারে গোড়া থেকেই সে ছিল সর্বক্ষণের কর্মী এবং তার কর্ম ছিল তার কবিত্বের পরিপূরক। রেশনের লাইনের তিক্ত অভিসম্পাতে লঙ্গরখানার করুণ কোলাহলে, মিছিলের উল্লাসে-চিৎকারে যে-ক্ষোভ যে-বেদনা যে-আশা যে-উদ্দীপনা, তাকে কেমন করে ভাষা দিতে পারা যায়? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অতি-প্রত্যক্ষ এই ক্ষোভ-বেদনা-আশা-উদ্দীপনাকে কোন তির্যক বক্রভাষণে প্রকাশ করা সম্ভব? অনুভব যেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ ভাষাকে সেখানে অবশ্যই স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হতে হবে।" (সুকান্ত স্মৃতি—অবন্তী সান্যাল) তাই স্বভাবতই সুকান্তর ভাষা হোল স্বতন্ত্র। এখানে কোন তির্যকতা দিয়ে তাকে অত জীবন্ত করা যাবে না। যাদের কথা তারা যেমন করে বলতে চায় তেমন করেই লিখতে হবে ; যাদের জন্য বলা, তারা যেমন করে বোঝে তেমন করেই বলতে হবে। প্রত্যক্ষ অনুভবকে প্রত্যক্ষ ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে সুকান্তর পক্ষে পূর্ববর্তী কোন কাব্য-সংস্কার বা কোন কাব্য-শর্তকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এগুলো তার পক্ষে আর্শীবাদই হয়েছিল। "প্রত্যক্ষ ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে সুকান্ত এমন কিছু লাইন লিখে ফেলেছিল যা সত্যিই অবাক করা।

...সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান আছে, তার কারণ কিশোর সুকান্ত দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান লিখতো ; মিছিলে মিছিলে শ্লোগান দিতো। কিন্তু সুকান্তর কলমেই সর্বপ্রথম খাঁটি শ্লোগান খাঁটি কবিতা হয়ে উঠেছিল। একমাত্র সুকান্তর কবিতা থেকে এমন প্রচুর শ্লেগান জড়ো করা যায় যা দিয়ে একটা পুরো মিছিলকে সাজানো চলে আর সে শ্লোগানগুলির বেশির ভাগ অব্যর্থ বলেই কবিতা অথবা কবিতা বলেই অব্যর্থ। শ্লোগান লিখতে গিয়েই সকান্ত লিখেছে এমন আশ্চর্য লাইনটি ঃ

রক্তে আনো লাল
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল। (বিবৃতি)

সুকান্তর মানসিকতায় রাজনীতি ও কবিতায় কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। সমকালের রাজনীতির ছোট বড় সকল কিছুই তার প্রেরণার বিষয় ছিল। আজকের দিনের রাজনীতি-সচেতন তরুণদের পক্ষে সেই সাময়িকতার প্রসঙ্গ অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন।" (ঐ) কঠিন বলেই তারা সুকান্ত, রমেশ শীল, নিবারণ চক্রবর্তী প্রভৃতির যথার্থ উত্তর সাধক হতে পারলেন না।

উপরোক্ত কবিরা তৎকালীন রাজনীতি এবং জনশক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই আজকের দিনেও জনমনে তারা বিরাট স্থান করে নিয়েছেন। কলকাতা-নিউইয়র্ক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অবিরাম মনোবিহারী কবিদের কাছে সুকান্ত রাজনীতির জন্যই সীমাবদ্ধ কবি মনে হলেও একথা সর্বজনস্বীকৃত যে সুকান্তর মতো জনপ্রিয়তা আধুনিক কোন

বিদগ্ধ বা পুরস্কৃত কবি লাভ করতে পারেননি বা পারবেন না।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিপর্যস্ত জনজীবন আধুনিক কবিদের মনেও নাড়া দিয়েছিল। তেরশ পঞ্চাশ সালে লেখা আঠার জন কবির 'আকাল' সম্বন্ধীয় কবিতার এক সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন সুকান্ত। সেই সংকলনের দিকে তাকালেই সুকান্তর চিন্তা, প্রকাশ ও প্রেরণার সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্য ধরা পড়বে। ঐ সম্পাদনার 'কথা-মুখ'-এ সুকান্ত কতগুলো প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেগুলো হোল ঃ "বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশ ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব-অনাহার পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবল-ভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র? তাদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত? এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি?" এই জাতীয় প্রশ্ন করা তাঁকেই সাজে যিনি তার কাব্যজীবনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ব্যয়িত করেছেন। যিনি অনায়াসে বলতে পারেন ঃ

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

কবির বিস্ময় আরো গভীর হয় যখন তিনি দেখেন, "সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে।" প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় দেখতে পান আহার্যের অন্বেষণে নগ্ন সমারোহ। "বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু'পাশে,/প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।"

"পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে।
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল ;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।" (বিবৃতি)

একদিকে "পথে পথে চলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা", অন্যদিকে বিদেশী হিংস্র শত্রুর আক্রমণ, দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে দেশপ্রেমিকের মৃত্যু। তবু কবির চিত্ত নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ নয়, নিরন্ন দেশেও তিনি উদ্ধত জেহাদ প্রত্যক্ষ করেন। উপলব্ধি করেন, এই ক্ষুধার আগুনের মধ্য দিয়েই রক্তাক্ত সূর্যোদয় সম্ভব। ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল এবং কাতারে কাতারে মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই বিরাট ধ্বংসের পেছনে আছে এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার শবযাত্রা। সচেতন মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনমনে নবজীবনের যে ব্যাকুল প্রত্যাশা জেগেছে তা

কবি শুনতে পেয়েছেন। তাই তিনি সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠে ভাষা দিয়ে বলেছেন ঃ

রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এ দেশ,
আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ।
আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।
... ...
নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলোমলো এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বনিয়াদ।
তাইতো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি
বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী ঃ (বিবৃতি)

পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে তিনি ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন করেন, "কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?" এ প্রশ্ন কবির দেশবাসীর কাছে। তাদের বিবেক, তাদের ঐতিহ্যের কাছে। আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত বলেই তাদের লৌহদৃঢ় সংহতি গড়ে ওঠেনি। চাল-চিনি, কয়লা-কেরোসিনের মত মুক্তির জন্যও তাদের আরো বড়, আবো সংহত, অবিচ্ছিন্ন লাইন দিতে হবে ঃ

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।
(ঐতিহাসিক)

কবির দৃষ্টিতে কোন অস্বচ্ছতা নেই, কোন দিকে কোন ভ্রান্তি নেই। তাই তিনি বলতে পারেন ঃ

আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু ঃ এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ। (শত্রু এক)

সমকালীনতায় এই শপথের শেষ হয়নি। যতদিন ক্ষুধার্ত মানুষ থাকবে আর থাকবে

মানুষকে ক্ষুধার্ত রাখার অপকৌশল ততদিন এ কবির বাণী ক্লাসিক হয়ে থাকবে। ক্লাসিক হয়ে থাকবে তার 'বোধন' কবিতা। রৌদ্ররসের এই কবিতায় ক্রোধই স্থায়ীভাব। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত এই কবিতায় মজুতদার, মুনাফাখোর আব শাসকশক্তির প্রতি আছে দারুণ ক্রোধ আর সঙ্গে সঙ্গে আছে জনগণের প্রতিশোধ কামনা এবং সংগ্রামস্পৃহা, এখানে আছে অন্যায়কারী আর প্রবঞ্চকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর আগ্নেয় জেহাদ। যারা অন্যায়কারী, যারা সেদিন গ্রাম-বাংলাকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছিল আর যারা নীরবে এই অন্যায়কে সহ্য করেছিল তারাও ঐ সর্বনাশের জন্য সমান দায়ী। অন্যায়কারীর প্রতি সহনশীলতায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন:—

ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ। (বোধন)

অন্যায়কে সহ্য করলে অন্যায়কারীর শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করা হয়। এ কথা যারা বোঝে না তাদের ঘুম এ জীবনেও ভাঙবে না। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানানোই অন্যায়। কবি তো জীবন সচেতন, সমাজ সচেতন, বাস্তব সচেতন। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তো তাঁর কাছে স্পষ্ট। তাই তিনি কোন ভুল করবেননা। বরং সকলের হয়ে তিনিই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন অন্যায়কারীর প্রতি ঃ

শোন রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার।
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই। (ঐ)

এখানে আমি কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। বিরাট জনগণের এক সংগ্রামী চেতনা। এই আমির মধ্যে ঐ যুগের সর্বরিক্ত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ যেন ফেটে পড়ছে। তাই এই কবিতায় নান্দীমুখে কবি আহ্বান করছেন এক মহামানবকে যিনি অসীম শক্তিধর, যিনি যুগে যুগে অন্যায়ের প্রতিকার করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আর উপসংহারে মহামানব নয়, যুগসন্ধিকালের চেতনা, শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনগণের একত্রিত সংহতিকেই উদ্বোধন করেছেন। যারা এই চেতনার অংশীদার নন তারা ঐতিহ্য-বঞ্চিত দেশদ্রোহিতারই পতাকাবাহী। এই কবিতায় আছে ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।

সুকান্তর বহু কবিতায়, গল্প ও নাটকে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি হোল ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতি, ইওরোপের উদ্দেশ্যে, বিবৃতি, চট্টগ্রাম ১৯৪৩,

ঐতিহাসিক, শত্রু এক, ডাক, বোধন, মৃত্যুঞ্জয়ী গান, ফসলের ডাক ঃ ১৩৫১, কৃষকের গান, এই নবান্নে, উদ্বীক্ষণ, মণিপুর, চিরদিনের, মহাত্মাজীর প্রতি, পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে, ভেজাল, বিয়েবাড়ির মজা, রেশন কার্ড, খাদ্য সমস্যার সমাধান, পুরনো ধাঁধা, ব্ল্যাক মার্কেট, ভাল খাবার, নবজ্যামিতির ছড়া, চরমপত্র, ক্ষুধা, দুর্বোধ্য, কিশোরের স্বপ্ন, দরদীকিশোর, এবং 'অভিযান' নাটিকা।

সুকান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন স্বজন হারানোর বেদনাময় কাহিনী, তারই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই কবির মনোবল হতাশায় ভেঙে পড়ে না, বরং নগরে ও গ্রামের ভগ্ননীড় ক্ষুধিত জনতার ভীড়েব মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন, "সমুদ্রে জাগে বাড়বানল।"

খাদ্যের দাবীতে, রেশনিং প্রথা চালু করার দাবীতে শহরে গ্রামে তখন মিছিল চলে। জনতার দাবীতে অবশেষে রেশনিং চালু হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল এবং চোরাকারবারও চলে পুরোদমে। কিশোর কবির ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায় তা-ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঃ

ভেজাল পোশাক ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা। (ভেজাল)

কিংবা 'ব্ল্যাক মার্কেট' কবিতায় ধনীরাম পোদ্দার ব্ল্যাক মার্কেট করে, গরীব চাষাকে মেরে বালিগঞ্জে খান ছয়েক বাড়ি হাঁকিয়েছে। একদিন তিনি দেখলেন তার চাকরটা রোজ বাজারে গিয়ে পয়সা চুরি করে। তিন চাকরটাকে আচ্ছামত ধমকে দিলেন। তখন,

খানিকটা চুপ করে বলল চাকর হরি ঃ
আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি।।

দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের তাণ্ডবনৃত্য সারাবছর ধরেই চলে। 'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য' গল্পে সুকান্ত তার মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ক্ষুধার জ্বালায় হারু নীলু এবং যশোদার মত কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে! অন্ধের স্ত্রীর মতো কতো স্ত্রী ক্ষুধার জ্বালায় স্বামী ত্যাগ করে বাঁচার জন্য অন্ধকার পথ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সুকান্তর বৈশিষ্ট্য হোল তিনি কেবল মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিপর্যয়ই প্রত্যক্ষ কবেন নি, তিনি অনুভব করেছেন "আগ্নেয়গিরির অভ্যান্তরে লাভার মতই তলে তলে উতপ্ত হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, প্রতীক্ষা করছে বিপুল বিস্ফোরণের।" প্রতিদিনকার রেশনের লাইনে দাঁড়ানোর ধৈর্যের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষ সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে তুলছে আগ্নেয় বিপ্লবের অনিবার্য সম্ভাবনাকে। খাদ্য মিছিলের হাজার হাজার কণ্ঠের সঙ্গে ক্ষুধার যন্ত্রণাকে মিশিয়ে দিয়ে চেতনার আগুনকেই জ্বালিয়ে তুলল।

পরের বৎসরে (১৩৫১) কৃষক সমিতি এবং কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়। সেখানেও অনেক সমস্যা। প্রথমত জমি. বীজ, লাঙ্গল গরু সব কিছুর অভাব। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষের তাড়নায় এবং ক্ষুধার জ্বালায় একই পরিবারের মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা যখন আবার ফিরে আসতে লাগল তখন নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিল। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন উঠল। সেসব দিনেও কমিউনিস্ট কর্মীরা ছিল তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৃষকরা নতুন সত্য লাভ করল। তারা রাষ্ট্র ও

জমিদারের শোষণের রূপ বুঝতে পারল। কবিকণ্ঠে কৃষকের সেই উপলব্ধি কাব্যরূপ লাভ করল ঃ

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর—
যে কাস্তে ঝল্‌সাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে,
যে কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারালো। (ফসলের ডাক)

কৃষকের মনে তখন দারুণ প্রত্যয়। যদিও সে ভুলতে পারে না—

গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন ; (এই নবান্নে)

তবু তারা জানে, "পৌষপার্বণে প্রাণকোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।" তাই তারা গোপন প্রতিজ্ঞা নেয় ঃ

এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন ফসল। (কৃষকের গান)

তাদের এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়নি। বছর দুই পরে এই অগণিত পল্টনের কাস্তে ঝলসে উঠেছিল বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামান্তরে তেভাগা আন্দোলনে। "হয় ধান নয় প্রাণ" এ শব্দে ঃ

সারাদেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা। (দুর্মর)

কবির প্রাণ কৃষকের এ নব জাগরণে উল্লসিত হয়ে ওঠে। হিমালয় থেকে সুন্দরবন সংগঠিত কৃষকের উত্তাল বিক্ষোভে বাংলা দেশ কেঁপে ওঠে। অহল্যা গৌতমী বাতাসীর রক্তে রাঙা বাংলায় হিন্দু-মুসলমান কৃষকের মিলিত বিদ্রোহে শোষণমুক্তির দৃপ্ত শপথ দেখা যায়। আকালের মৃত্যুকে মুছে বাংলাদেশে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। অবদমিত সেই কৃষক আন্দোলনের শপথ কবিকণ্ঠেও শোনা যায় ঃ

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ। (ঐ)

'চিরদিনের' শীর্ষক কবিতায় দুর্ভিক্ষ লাঞ্ছিত গ্রাম বাঙলায় কৃষক জীবনে যে নতুন স্বপ্ন ঘনায় আর একটি সুন্দর আলেখ্য কবি রচনা করেছেন। কী মিষ্টি মধুর কবিতা। শব্দে, ছন্দে, ভাবে, কল্পনায় এবং স্বপ্নময়তায় সার্থক এই কবিতা কালাশ্রয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরদিনের ব্যাপ্তি লাভ করেছে। শেষ স্তবকে এসে কৃষকবধূর এক ফাঁকে সলজ্জ চাহনিতে তা প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে ঃ

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,

ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে।।

গোছা গোছ ক্ষেত ভরতি ফসলের ক্ষেতের মধ্যে কৃষক বধূ কেবল প্রাচুর্যের স্বপ্নই দেখে না, দেখে এক সুখ ও আনন্দঘন ভবিষ্যৎকে, সুন্দর ও সম্ভাবনাময় আগামীদিনকে। তবে, কবি সুকান্ত বেশিদিন আমাদেব এই স্বপ্ন দেখাতে পারেননি। মৃত্যু-বিজয়ী আশার কথা, স্বপ্নের কথা শোনাতে শোনাতে একদিন অকালে মৃত্যুর কোলে তিনি নিজেই আশ্রয় নিলেন। উপোসী মানুষের কথা, ক্ষুধার্ত মানুষের মনে সম্ভাবনাময উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা শোনাতে গিয়ে কবি নিজেব ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়েছেন, নিজেকে উপোসী রেখে রক্তপায়ী কীটের আক্রমণে আক্রান্ত হলেন। মাত্র একুশ বছরে মৃত্যু বরণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, উচ্চতর আদর্শের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দান করতে হয়, শহীদ হতে হয়। সুকান্ত না থাকলেও জনতার স্রোত এখনো আছে। অসহায় যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক কবি বিগত দুর্ভিক্ষে এক অনাগত রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায়। তিনি আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নতুন রূপে দেখা দেবেন যার "বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণসংগীতের সুর।" অসহায় যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক আমরাও আজ সুকান্তর মত প্রত্যাশা করে আছি এক নতুন রবীন্দ্রনাথের যিনি উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে জনতার পাশাপাশি চলবেন। কারণ আমরা জানি "কবি ছাড়া জয় বৃথা।"

পঞ্চম অধ্যায়

কিশোর বাহিনীর পরিচালক কবি

দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে কিশোবদের জন্য একটি বিভাগ থাকে। ছোটদের পাতা, সব পেয়েছির আসর, মণিমালা প্রভৃতি নামে তাদের সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এগুলোর সঙ্গে কিশোর বাহিনীর কোন মিল নেই। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন ছাত্র যুবক, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক সকলের মধ্যেই এক বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছিল তখন ছোটরাও পিছিয়ে ছিল না। অবশ্য এ কাজটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেনি। এর পিছনে সংগঠিত উদ্যোগ ছিল। জাপানী আক্রমণের সময় যখন তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হয় তখন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পুরানো প্রগতি লেখক সংঘের কিছু সমর্থক এবং নতুন এগিয়ে আসা কিছু লেখক শিল্পী নিয়ে ২৮শে মার্চ, ১৯৪২ গঠিত হোল ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১লা এপ্রিল থেকেই প্রকাশিত হোল পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম কিশোবদের সংগঠিত করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। ২৪শে মার্চ, ১৯৪৩ তারিখের এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়, 'ছেলের দল' পিছিয়ে নেই।' ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ 'জনযুদ্ধ' সম্পাদকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো– "ছোটদের জন্য লেখা চাই ও খবর চাই... দেশের কাজে আজ ছোট ছেলেমেয়েদের অবদান কম নয়। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সংগঠনের রূপ দিতে হইবে। তাদের সজীবমনে সত্যিকারের দেশপ্রেমের বীজ বপন করিতে হইবে। ৭ই এপ্রিলেব 'জনযুদ্ধ'-এ বলা হোল "এমনিভাবে তোমরাও দল গড়ো।"

এই দল গড়ার তাৎপর্য বোঝা যাবে তখনকার অন্যান্য ছোটদের সংগঠনগুলোর কথা জানলে। তারা বলত আমরা রাজনীতি করি না। তারা বিশ্বাস করত ঐন্দ্রজালিক শক্তি। যা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় সেই কাজই অনায়াসে কোন অলৌকিক শক্তি করে দিতে পারে। তখন 'মৌমাছি' ছদ্মনামে একজন (বিমলচন্দ্র ঘোষ) মণিমালার আসর পরিচালনা করতেন। তখন দেশের অবস্থা ছিল অগ্নিগর্ভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মাথার উপরে জাপানী আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে দেশ শ্মশানে পরিণত। এমন সময় স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন ছিল দেশাত্মবোধ। ৪২এর আগস্ট আন্দোলন দেশের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচার। এই পরিপ্রেক্ষিতে অলৌকিক শক্তির কথা বলে দেশের কিশোর মনকে বিপথগামীই করে তুলেছিল। অথচ তখন দেশের মধ্যে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনা এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিশোরদেরও এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল।

প্রকৃতপক্ষে তখন কমিউনিস্ট পার্টি কিশোরদেরও একটি আদর্শে সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী শহরে গ্রামে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত কিশোর বাহিনী গড়ে ওঠে। ছোটদের পক্ষ থেকে জনযুদ্ধের সম্পাদকের কাছে কিশোর বাহিনীর জন্য পৃথক একটি বিভাগ খোলার জন্য ক্রমাগত দাবী আসতে থাকে।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৩ বাংলা নববর্ষের দিন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কিশোর বাহিনীর সম্ভবত প্রথম সমাবেশ হয়। এই সমাবেশের বিস্তৃত রিপোর্ট ছবিসহ 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই সভায় সভাপতিমণ্ডলীতে ছিল কিশোর হরপ্রসাদ, বীরেন আর ছোট্ট মেয়ে শেফালিকা। বিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সভার উদ্বোধন করেন। মধ্য কলকাতার কিশোর বাহিনীর মেয়েরা গাইল 'বাঁধ ভেঙে দাও' গান। ছোট্ট ছেলে দীপঙ্কর গাইল 'বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ'। সভাপতিমণ্ডলীর হরপ্রসাদ বললো, 'দেশের অবস্থা যখন বদলে যাচ্ছে, তখন আমাদেরও আর পুরানো কায়দায় দিন কাটানো চলে না। তাই নতুনভাবে জীবন গড়ে তুলবার জন্য আজ থেকে সবাই সংঘবদ্ধ হবো।" শেফালিকা বললো "আমাদের আনন্দ, গান, হাসি, অভিনয়ে সবার মনে জাগিয়ে তুলবো জ্বলন্ত দেশপ্রেম।" বীরেন বললো, "সোভিয়েতের বীরশিশুদের কাহিনী আমাদের বুকে সাহস এনে দিয়েছে। আমরাও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক হিসাবে গড়ে উঠতে চাই।"

"এই সভা থেকেই কিশোর বাহিনীর ঘোষণাপত্রের প্রস্তাব গৃহীত হল। কিশোর বাহিনীর আদর্শ ঘোষিত হলো—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, স্বাধীনতা। শপথ গ্রহণ করা হলো দেশের উপযুক্ত হতে হলে আমাদের জীবনকে সকল দিক থেকেই ভাল করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য দেহে চাই শক্তি ও স্বাস্থ্য, খেলাধূলায় ওস্তাদ হওয়া চাই, মন নির্মল হওয়া চাই, সাহস বাড়িয়ে তোলা চাই, বাপ-মাকে ভালবাসা চাই, পড়াশুনায় ভাল হওয়া চাই, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। একজন অরেকজনকে সাহায্য করা চাই এবং সবার উপরে চাই এক হয়ে একসঙ্গে কাজ করতে শেখা। সেজন্যই আমরা সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিশোরবাহিনী গড়ছি। আমাদের কিশোর বাহিনীর সভ্যদের জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থার চেষ্টা করবো? ১) নানারকম খেলাধুলা ২) আমোদ-প্রমোদে ৩) গান-শেখা ৪) বনভোজন ও ভ্রমণ ৫) হপ্তায় একদিন বা দু'দিন একত্রে বসে দেশের কথা আলোচনা করা। ৬) কুচকাওয়াজ, লাঠি ও ছোরা খেলা শেখা ৭) হাতে লেখা বা ছাপানো পত্রিকা বার করা, পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি করা। রচনা প্রতিযোগিতা চালানো ৮) পাড়ার লোকের সাহায্যের জন্য চালের লাইনে ভলান্টিয়ারী করা এবং ঐ ধরনের অন্য সমাজ সেবার কাজ, ছাত্রদের সভা সমিতি ও অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে সাহায্য করা।

কিশোর ভাইবোন তোমরা এস! আমাদের সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়াও! এক হয়ে প্রতিজ্ঞা কর — আমরা অন্ধকারে থাকবো না। আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল এবং সুন্দর করে গড়ে তুলবো।

তিন সপ্তাহের মধ্যে ৪৮ জায়গায় কিশোরবাহিনী গড়ে উঠলো। যার সভ্যসংখ্যা ৩,৩২৮ জন। আর তিনমাসে এই সংখ্যা নয় হাজারে গিয়ে দাঁড়ালো। ৭ জুলাই, ১৯৪৩, আবার নতুন করে ঘোষিত হলো আদর্শ ঃ কিশোর হবে লেখাপড়ায় ভাল, শিল্পকলায় উৎসাহী-খেলাধুলায় দক্ষ, পরের সেবায় ব্রতী এবং দেশের কাজে সাহসী। দিনাজপুর, রংপুর, বরিশাল, মৈমনসিং, খুলনা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ২৪ পরগনা, কলকাতা, মেদিনীপুর ছাড়িয়ে ত্রিপুরা, ডিব্রুগড়, ধুবড়ী,

এমনকি কানপুরেও কিশোববাহিনীর শাখা সম্প্রসারিত হলো।''

কিশোর বাহিনীর সভ্যরা পাড়ায় পাড়ায় মিছিল করে মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগ্রহ করত। তা দিয়ে ফ্রি কিচেন চালানো হতো। বড়দের সাহায্যে পাঠশালা খোলা হতো, দুধের আন্দোলন করে পাড়ায় পাড়ায় দুধ বিতরণী কেন্দ্র পরিচালনা করতো। (হুগলীর শ্রী মদন সাহার একটি রচনা থেকে এই সব তথ্য নেওয়া হয়েছে।)

তাব কিছুদিন পরেই ২৮শে এপ্রিল তারিখের জনযুদ্ধের পাতায় প্রথম দেখা গেল সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি গল্প ''দরদী কিশোর''। সুকান্তর-র পরিচয় হিসেবে লেখা ছিল 'কিশোর বাহিনীর সভ্য'। এই গল্পের নায়ক শতদ্রু রায়ের মধ্য দিয়ে তখনকার কিশোর সুকান্তরই যেন পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ঃ

''দোতলার ঘবে পড়ার সময় শতদ্রু আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে সে দেখতে পায় তাদের বাড়ির সামনের বস্তিটার জন্যে যে নতুন কন্ট্রোলের দোকান হয়েছে, সেখানে নিদারুণ ভীড়, আর চালের জন্যে মারামারি কাটাকাটি। মাঝে মাঝে রক্তপাত আর মূর্ছিত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্কুলের পড়া ভুলে যায়, অন্যায় অত্যাচার দেখে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তবু সে নিরুপায়, বাড়ির কঠোর শাসন আব সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। যারা চাল না পেয়ে ফিরে যায় তাদের হতাশায় অন্ধকার মুখ তাকে যেন চাবুক মারে, এদের দুঃখ মোচনের জন্য কিছু করতে শতদ্রু উৎসুক হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে মনে প্রাণে। তারই সহপাঠি শিবুকে সে পড়া ফেলে প্রতিদিন চালের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দ্যাখে। বেচারার আর স্কুলে যাওয়া হয় না, কোনো কোনো দিন চাল না পেয়েই বাড়ি ফেরে, আর বৃদ্ধ বাপের গালিগালাজ শোনে, আবার মাঝে মাঝে মারও খায। ওর জন্যে শতদ্রুর কষ্ট হয়। অবশেষে ঐ বস্তিটার কষ্ট ঘোচাতে শতদ্রু একদিন কৃতসংকল্প হল।

...সে একজন কম্যুনিষ্টের সঙ্গে মিশে অনেক কিছুই জানতে পেরেছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে একটা কিশোর বাহিনীর ভলান্টিয়ার দল গড়ে, বাড়ির সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করতে লাগল। ...সে গোপনে কাজ করতে করতে অনুভব করল, সেও তো একজন দেশকর্মী। শতদ্রু ভবিষ্যৎ নেতা হবার স্বপ্নে রাঙিয়ে উঠল আর সে খুঁজতে লাগল কঠিন কাজ, আরো কঠিন কাজ, তার যোগ্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। সে আজকাল আর আগের কালের 'শতু' নয়, সে এখন 'কমরেড শতদ্রু রায়'। রুশ কিশোরদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব শতদ্রুকে অস্থির করে তোলে ; সে মুখে কিছু বলে না বটে কিন্তু মনে মনে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলো একটা কঠিন কাজ, একটা আত্মত্যাগের সুবর্ণ সুযোগ।''

দরদী কিশোর একটি অপরিণত রচনা। এ'তে গল্পরস থাক আর নাই থাক তখনকার দিনে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা একটি কিশোর মনের গভীর আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। চারদিকে যখন বিপন্ন মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য একটা বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছে তখন সেখানে কিশোররাও চুপ করে থাকতে পারে না। তারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। সেজন্য কয়েক মাস পরেই ৬ই অক্টোবর জনযুদ্ধ পত্রিকায় আর একটি গল্প লিখল কিশোর সুকান্ত। তার নাম

'কিশোরের স্বপ্ন'।

হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়া কিশোরের মনে স্বামী সত্যানন্দের মতই 'মা' কি হয়েছেন তার বাস্তবচিত্র তার দেশপ্রেমকে উদবুদ্ধ করে তুলেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ দিনগুলোতে কিশোর জয়দ্রথকেও রিলিফ কিচেনে কাজ করতে হয়। সেখান থেকে কাজ সেরে ক্লান্ত জয়দ্রথ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার দেশমাতা বাংলাদেশ। তার দেহ শতচ্ছিন্ন কালো কাপড়ে ঢাকা। ভয়ঙ্কর তার চেহারা। কারণ মাতৃভূমি বলেন, "সুসন্তান বলে আমার মুখে দুটি অন্ন দেবে ব'লে যাদের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেই ছেলেরা আমার দিকে তাকায় না, কেবল মন্ত্রী হওয়া নিয়ে দিনরাত ঝগড়া করে, আমি যে এদিকে মরে যাচ্ছি, সেদিকে নজর নেই, চিতার ওপর বোধ হয় ওরা মন্ত্রীর সিংহাসন পাতবে।..."

এই বাংলা মায়ের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের মতো বয়ে গেল আগস্ট আন্দোলন, জাপানী আক্রমণ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর। তার ফলে বাংলা-র দেহ কৃশ, কাপড় শতচ্ছিন্ন, মুখে বহু আঘাতের চিহ্ন, পা রুধিরাক্ত। বড়রা মায়ের প্রতি তাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করছে না দেখে ছোটরা এগিয়ে এসেছে মাকে বাঁচাতে। কিশোর জয়দ্রথ বলে, "বড়রা কিছু না করে তো আমরা আছি।"

বাংলা বলে, "তুমি যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, তা হলে তোমায় সাহায্য করবে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার মজুর কিষাণ ভাইরা। তারা আমায় তোমার মতই বাঁচাতে চায়, তোমার মতোই ভালবাসে। আমার কিষাণ ছেলেরা আমার মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্যে দিনরাত কী পরিশ্রমই না করছে ; আর মজুর ছেলেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে আমার কাপড় যোগাবার জন্যে।"

এমনি করে তখন কিশোর প্রাণে সমসাময়িক সমস্যা এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আদর্শের প্রেরণা সঞ্চারিত করা হয়েছিলো। সুকান্তও তখন কিশোর। নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে তখন কিশোর বাহিনী গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, কিশোরদের উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য, সচেতন করার জন্য নতুন নতুন লেখা লিখে চলল। ১৯৪৩ সালের ১৪ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রীয় সমাবেশ হল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিশু সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. জোশী কিশোরদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারাও দলে দলে সমবেত হয়। দেশের কাজে তাদের অবদানও কম নয়। তাদের সজীব মনে সত্যিকারের দেশপ্রেমের বীজবপণ করার জন্যই কিশোর বাহিনী গঠনের বিরাট সাড়া পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে কিশোর বাহিনী গড়ে ওঠে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই কিশোর বাহিনীর যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একজন কিশোর, তখনকার দিনের উদীয়মান কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। ১৯৪৩ সালেই শুরু থেকে কবি সুকান্ত ছিলেন কিশোরবাহিনীর কর্মসচিব।

কিশোর বাহিনীর করণীয় কাজ সম্পর্কে বাংলার কিশোর বাহিনীর কর্মসচিব সুকান্ত ভট্টাচার্যের এক চিঠি (৭.১০.৪৪) থেকে জানা যায় ঃ "তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া

ও আচার ব্যবহার চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে। নিজের পাড়ায় বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে।"

কিশোর বাহিনীর সংবাদ তখন প্রথমে জনযুদ্ধ এবং পরে স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রায়ই থাকত। তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় কিশোর বাহিনী থেকে নিয়মিত চিঠি লেখা হত। এই সব চিঠি .সুকান্তই লিখত। কর্মসচিব হিসেবে ঐ সব চিঠিতে সুকান্তর স্বাক্ষর থাকত।

কিশোর বাহিনীর সংবাদের একটি দৃষ্টান্ত হল ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ পত্রিকায় সংবাদ বেরলো— "ঢাকার দেওয়ান বাজারে ৫১ জন মেয়ে গড়া কিশোর বাহিনী। মুষ্ঠিভিক্ষার যে চাল ওঠে, তাতে ২০টি দুঃস্থ পরিবার প্রাণ বাঁচায়। স্কুলের মাঠে মেয়েরা সজ্জি লাগিয়েছে। সজ্জি বিক্রির টাকা দিয়ে তারা স্কুলের গরীব মেয়েদের সাহায্য করবে। বর্দ্ধমানের বন্যাপীড়িতদের জন্যও তারা চাঁদা তুলছে। ঢাকার নরসিংদি গ্রামের কিশোর বাহিনী রোজ ১৫০ দুঃস্থ শিশুকে খাওয়াচ্ছে। কলকাতার প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের কিশোর বাহিনী সরস্বতীপুজোর দিন ৩০০ জনকে খাওয়ালো। তারা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বিনয় রায়ের 'দুর্ভিক্ষ' নৃত্যনাট্যের অনুকরণ করলো। তবে নতুনত্ব এই যে, এরা দেখালো, ধ্বংসই শেষ নয়। কিশোরদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীকেই শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হতে হলো। ফার্ণ রোডের কিশোর বাহিনী বস্তির ৩৬ জন ছেলেমেয়েকে জামা কাপড় দিল।" এইসব সংবাদে সারা দেশের কিশোররা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতো।

কিশোর বাহিনীব একটা নিজস্ব পতাকা ছিল। তা ছিল লাল বর্ডার দেওয়া সাদা কাপড়ে এক কোণে তারকা, মধ্যস্থলে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ১লা বৈশাখকে কিশোরবাহিনী দিবস হিসেবে পালন করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। ঐ দিবসে প্রত্যেক কিশোর বাহিনী তাদের নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করত।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ কেন্দ্রীয় কিশোর বাহিনীর পক্ষ থেকে "কিশোর বাহিনী শোনো" নামে এক আহ্বান রাখা হলো ঃ

"কিশোর বাহিনীর বয়স এক বছর হতে চললো। এই এক বছরে কিশোর বাহিনী বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার সভ্য হয়েছে। আবার এই এক বছরে আমাদের এই বাংলাদেশে যে বিরাট দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা চলেছে তার তুলনা কোনও ইতিহাসে নেই। শুনলে অবাক হবে— গত চার বছরে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে যত না লোক মরেছে, তার চেয়েও বেশি লোক এই এক বছরে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশেই মরেছে ! এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি মরেছে কারা জানো? বাংলার ভবিষ্যৎ যাদের উপর নির্ভর করছে, সেই কিশোরেরা। গ্রামের যারা তারা তো জানোই, শহরের বাহিনীরাও জেনো যে দুধের অভাবে, শীত বস্ত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদের জামা নেই, কাপড় নেই, ঔষধ নেই, খাবার নেই, লেখাপড়া শেখার পয়সা নেই।

এই বছর আবার যে দুর্ভিক্ষের ঢেউ আসছে তাতে এদের যে কি হবে, তা কল্পনাও করা

যায় না। তাই কিশোর বাহিনীর ওপরই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাংলার কোটি কোটি অনাথ ও অসহায় কিশোরদের দেহ ও মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশের ভবিষ্যতের অমূল্য সম্পদ এই কিশোরদের রক্ষা করতে আজ কিশোরদেরই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আসতে হবে। অনেক জায়গায় কিশোরবাহিনী এই কাজে এগিয়ে চলেছে — অন্যসব বাহিনীও এসো।"

" 'কিশোর বাহিনী'র সাংগঠনিক মুখপত্র ছিল 'স্বাধীনতা'য় সাপ্তাহিক 'কিশোর সভা'র পৃষ্ঠাটি। এতে দেশী বিদেশী সংবাদ, গল্প, ছড়া ও কবিতা ছাড়াও থাকত সুকান্তের লেখা চিঠি। এগুলোই কিশোর বাহিনীর সভ্য সভ্যা ও সংগঠকদের পথ দেখাত, প্রেরণা দিত।"

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ কলকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন হলে কিশোরবাহিনীর শারদোৎসব সুকান্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস।

কিশোর বাহিনী ছিল সুকান্তের স্বপ্ন, তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তাঁর চোখে ছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন— শোষণ দারিদ্র্যহীন দেশ গড়ার আদর্শ। একদিন যে ছেলেটি দেওয়ালে এক ছড়া লিখে তার মনের কথা প্রকাশ করেছিল ঃ

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা।
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা।

সেই ছেলের যখন ষোল সতের বয়েস হোল তখন বাংলা দেশের অসংখ্য ছেলেমেয়ের মনে প্রেরণা যোগানোর স্বাধীনতা সে পেয়ে গেল। সে তখন শুনেছে রাশিয়ার পাইওনিয়ার্সের কথা। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল। নিজেরাই নিজেদের কাজের প্রেরণা জোগায়, নিজেরাই নিজেদের কাজের বিচার করে, শাস্তি দেয়, সমাজতন্ত্রের ভাবী সমাজ গড়ে তোলে। সুকান্তের স্বপ্ন ছিল এই দেশেও পাইওনিয়ার্সের মতো কিশোর বাহিনী গড়ে তুলবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনের মাঝে নতুন চিন্তা আনতে হবে, যাতে তারাই একদিন এই ধনিকদের শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করবে। দারিদ্র্যকে তারা ভেঙে ফেলবে, এমন সমাজ গড়বে যেখানে খাওয়া-পরা-থাকা ও শিক্ষার দুঃখ থাকবে না। কিশোর বাহিনী হবে ছেলেদের শিক্ষা ও আনন্দের একটি সুন্দর সংগঠন।

সেই সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য তাঁকে অনেক উদ্দীপক লেখা লিখতে হয়েছিল। 'কিশোরের স্বপ্ন' নামে লেখাটি সুকান্ত লিখেছিলেন ১৯৪৩ সালের ৬ই অক্টোবরের সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায়। কিশোর বাহিনী যখন গড়ে ওঠে তখন এই দেশে জাপ-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ এবং দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের করাল ছায়া পড়েছে। সুকান্তের 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্পেও আছে দুর্ভিক্ষের কথা। তাঁর গল্পের নায়ক কিশোর জয়দ্রথের স্বপ্নের মধ্যে দেখা হয়েছে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত বাংলাদেশের সঙ্গে। সারা দেশের মধ্যে এই সংকটপূর্ণ অবস্থা কেন, তাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন সুকান্ত। আপন শীর্ণতার কারণ হিসেবে বঙ্গমাতা সরকারকেই

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। জয়দ্রথকে তার দেশ বলেছে, "কোনদিন সে (সরকার) দিয়েছে খেতে? আমাকে খেতে দেওয়া তো তার ইচ্ছা নয়। চিরকাল না খাইয়েই রেখেছে আমাকে। আমি যাতে খেতে না পাই, তার বাঁধনের হাত থেকে মুক্তি না পাই, সেজন্যে সে আমার ছেলেদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে তাকে টিকিয়ে রেখেছে।"

বিষণ্ণ দেশের মুখ দেখে শিউরে উঠেছে জয়দ্রথ। দেশ আর্তনাদ করেছে, "সুসন্তান বলে আমার মুখে দুটি অন্ন দেবে বলে যাদের ওপর ভরসা করেছিলাম তারা বোধ হয় আমার চিতার ওপর মন্ত্রীর সিংহাসন পাতবে...।"

দেশের এই বিপন্ন অবস্থা থেকে প্রকৃত মুক্তির স্বাদ আনতে গেলে মানুষকে নিজের হাতেই ক্ষমতা তুলে নিতে হবে এবং সেই মহামুক্তির প্রধান নায়ক হবে শ্রমিক কৃষক। শ্রেণী সচেতন লেখক সুকান্ত নির্দ্বিধায় সেই প্রত্যয়কেই গল্পে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

জনযুদ্ধের পাতায় কিশোর বিভাগে প্রকাশিত (২৮শে এপ্রিল ১৯৪৩) সুকান্তের আরেকটি গল্প 'দরদী কিশোর'। এ গল্পের নায়ক কিশোর শতদ্রু। সহনুভূতিশীল তার মন। সে দেখে তার সহপাঠী শিবুকে দিনের পর দিন চালের লাইনে দাঁড়াতে। এই অবস্থায় সে পড়াশুনা করবে কখন। তারপরেও চাল না পেয়ে শিবুকে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বাড়ির সামনের বস্তির মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে শতদ্রু বিচলিত হয়। সে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এ জন্য শতদ্রু কিশোর বাহিনী গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। স্বভাবতই এ কাজ খুব সহজ নয়। প্রথম পর্যায়েই বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তাকে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু কোন বাধাই শতদ্রুকে দমাতে পারে না। তার আদর্শই তাকে মহান লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সেখানে পৌঁছতে গিয়ে পিতার সঙ্গেও বিরোধ বাধে। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে হাসিমুখে সীমাহীন লাঞ্ছনা ভোগ করে। কিশোর বাহিনীর মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে তাকে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যেতে হবে এবং তবেই লক্ষ্যে পৌঁছে সে পাবে অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দ।

'রাখাল ছেলে' গীতি কাহিনীর মধ্যে যে বিষাদময়তার সুর দেখা দিয়েছিল মার্কসবাদী চেতনায় এবং সাংগঠনিক কাজের মধ্যে তা নতুন আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। 'অভিযান' গীতিনাট্যে আছে তার মূর্ত প্রকাশ। কোটি শিশু নরনারীর আর্তনাদে তখন যে মহাশ্মশানের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিকারের জন্য মানুষকে তার শক্তি সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের সামর্থ্য আপাতদৃষ্টিতে সীমিত হলেও বহু মানুষের যোগফলে তা হয় অসামান্য। তাকে উজ্জীবিত করবার জন্য তখনকার ভয়াবহ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

লাখে লাখে তারা আজ পথের দুধার থেকে
মৃত্যুদলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে।
চাষী ভুলে গেছে চাষ, মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ
উজাড় নগর গ্রাম কোথাও জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে, দেশের আগামী জাতি।

রোগের প্রাসাদ ওঠে সেখানে প্রতিটি ঘরে,
মানুষ ক্ষুধিত আর শেয়ালের উদর ভরে ;
এখনো রয়েছে কোটি মরণের পথ চেয়ে।

দেশের সরকার ধনী ব্যবসায়ীদের ওপর এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। ফলে তাবা রাতারাতি আরো ধনী হয়ে গেল। ক্ষুধিতের খাদ্য নিয়ে চোরাকারবার ফেঁপে উঠল। সুকান্তের কাব্যের ভাষায় "বাঘের ওপর দেওয়া হল ছাগ-পালনেব ভার।" দুর্ভিক্ষ কবলিত অশান্ত প্রজাদের সাহায্যে এগিযে আসে তরুণরা। কারণ "চিরদিনই তরুণেরা অন্যায়েরে করে নিবারণ।" তরুণী সংকলিতা তাই দ্বারে দ্বারে দেশের দুর্দিনের কথা পৌঁছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলে। শোষক সরকারের কাছে এর চেয়ে বড় অন্যায় আর হতে পারে না। প্রজা যত অচেতন থাকে ততই রাজার মঙ্গল। তাই রাজা সহ্য কবতে পারে না নতুন চেতনার অগ্রদূতী সংকলিতাকে। রাজার সৈন্য তাকে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও সংকলিতা বাজার স্বরূপকে তুলে ধরে মানুষের কাছে ঃ

দরিদ্রের রক্ত ক'রে শোষণ
বিরাট অহংকারকে কর পোষণ,
তুমি পশু, পাষণ্ড, বর্বর
অত্যাচারী, তোমার ও হাত কাঁপে না থরথর!

রক্তচক্ষু দেখিয়ে তলোয়ারের জোরে শোষিত অত্যাচারিত মানুষকে চিরকাল দমিয়ে রাখা যায় না। আঘাতে আঘাতে তাদের চেতনাও ক্ষুরধার হয়। তাই শোষিত মানুষের প্রতিনিধি ইন্দ্রসেন বলে ঃ

একটি তোমার তলোয়ারের জোরে
ভাবছ বুঝি চিরকালটাই যাবে শাসন করে?
সেদিন তো আজ অনেক কালই গত,
তোমার মুখের ফাঁকা আওয়াজ শুনছি অবিরত।

শোষিত মানুষ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রাজার ওপরে ভরসা না করে নিজেদের শক্তির জোরেই তারা প্রতিকার করে। গণ আদালতে প্রজারা কোতোয়ালকে বন্দী করে। নাটকের এই সমাপ্তি পরিবর্তিত। প্রথমে অন্যরূপ ছিল। এ সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, "প্রথম লেখায় ওর বিপ্লবী চেতনার স্বাভাবিকতা থেকে শেষ দৃশ্যে ছিল নিপীড়িত প্রজাদের হাতে অত্যাচারী কোতোয়ালের মৃত্যু। তখনকার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষকদের অনেককেই পড়ে শোনান হলো। তাদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত কোতোয়াল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রজাদের হাতে বন্দী হলেন। এই অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের কথা মনে পড়লে আজ বিরক্তি ও ব্যথাই শুধু জাগে।" কারণ সুকান্তের বিপ্লবী চেতনায় সঠিকভাবেই বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে কোতোয়ালের মৃত্যু হয়েছিল। ধনিক শাসকের ধ্বংস না হলে সর্বহারা মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় না।

এমনি নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষের বিক্ষোভের মনোভাব নিয়ে সুকান্ত কয়েকটি গল্প

লিখেছেন। সেগুলো পরবর্তীকালে হরতাল নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আছে পাঁচটি গল্প--হরতাল, লেজের কাহিনী, ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা, দেবতাদের ভয়, রাখাল ছেলে। এদের মধ্যে 'রাখাল ছেলে' সুকান্তের প্রথম দিকের লেখা। বাকীগুলোর মধ্যে হরতালের মেজাজটাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'হরতাল' কথার অর্থ বিক্ষোভ প্রকাশার্থ দোকান, কাজকর্ম প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ করা--সহজ কথায় ধর্মঘট। অনেক সময় দালালদের চক্রান্তে ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে যায়। 'হরতাল' গল্পে রেলযন্ত্রের রূপকে বিপ্লবী কর্মী ও লেখক সুকান্ত সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন।

ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা একটি অদ্ভুত নীতিকথা। গল্পটি অন্তত সেই ভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের মত কাহিনী এটা মোটেই নয়। এ কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাওয়া। কিন্তু পদলোভ সব করিকল্পনা নষ্ট করে দিল, "নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই।"

"দেবতাদের ভয়"ও একটি সুন্দর নাট্যগল্প। এই গল্পেরও একটা উপদেশ আছে তবে তা প্রচ্ছন্ন। শোষণের একটি বড় অস্ত্র হোল বিভেদ সৃষ্টি করা। মানুষ একদিকে যেমন অ্যাটম বোমা তৈরি করে পৃথিবীকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে তেমনি অন্যদিকে মানুষ 'সোভিয়েত রাশিয়ার' মত শোষণহীন দেশ ও সমাজ গড়ে তুলেছে। সোভিয়েত রাশিয়া নাকি ওদের কাছে স্বর্গ, খাওয়াপরার কষ্ট নাকি কারুর সেখানে নেই। সবাই সেখানে সুখী।" সেজন্যই শোষক শাসক ইন্দ্র নারদকে বলে, "তুমি চলে যাও সটান পৃথিবীতে। সেখানে লোকদের বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের বিষ ঢুকিয়ে দাও। তাহলেই--তাহলেই আমাদের স্বর্গ মানুষের হাত থেকে বেঁচে যাবে।"

কিশোরদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সুকান্ত নানা ধরনের লেখা লিখত। গল্পের মত করে "যুদ্ধরত বাংলার কিশোর" নামে সে কিশোর বাহিনীর একটি রিপোর্তাজ লিখেছিল ঃ

"গোবিন্দর বাবা জড়ের মতো কিশোরবাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিসে ঢুকলেন, চিঠির ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকাতেই তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন ঃ 'কোথায় আমার ছেলে গোবিন্দ? আজ তিন দিন হলো সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, বলো কোথায় সে?'

সবিস্ময়ে বললাম ঃ 'গোবিন্দ'?

হ্যাঁ, হ্যাঁ গোবিন্দ, তোমাদের বাহিনীর সভ্য।'

'জানিনা তো।'

'জানো না মানে? তোমরাইতো আমি যা চাই না তাই ক'রছো, বাংলা দেশের ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছো, আর এখন বলছো জানিনাতো। বলো তোমরা কী করেছো আজ পর্যন্ত দেশের ছেলেপিলেদের জন্য, বলো।'

একটুও দেরী না করে উত্তর হিসেবে চিঠির ফাইলটাই ঠেলে দিলাম তাঁর দিকে। তিনি চিৎকার করে পড়তে লাগলেন ঃ ফরিদপুরের খালকুলা কিশোর বাহিনী-- তিন জন ছাড়া সবাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তাই এখন আমাদের কাজ হ'চ্ছে জল পরিষ্কার করা, রাস্তা বাঁধা, কোদাল কোপানো ইত্যাদি। আর এই সব দেখে অনেক ছেলেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়

এবং নিষেধের জন্য যাঁদের ছেলেরা যোগ দিতে চায়নি তাঁরা যখন দেখলেন বাহিনীর ছেলেরা দিব্যি শিক্ষিত ও সভ্য হ'চ্ছে তখন তাঁরা আর নিষেধ করলেন না বরং নিজেরাই বাহিনীকে সাহায্য ক'রতে আরম্ভ করলেন। এ ছাড়া আমরা বিকেলে একঘন্টা ড্রিল, স্বদেশী খেলা ও নাচগান ক'রে থাকি।

ঢাকা নববাপুর কিশোর বাহিনী — অনেক দিন হ'লো আমরা কিশোর বাহিনীর তরফ থেকে একটি দুধের ক্যান্টিন খুলেছি। প্রথমে আমরা চাঁদা তুলে ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দুধের ক্যান্টিন চালাতাম, বর্তমানে রিলিফ কমিটির কাছে দাবি করে সপ্তাহে ৭০ টাকা করে পাচ্ছি, তা দিয়েই দুধের ক্যান্টিন চালানো হচ্ছে।

ভদ্রলোক 'হুম' করে একটা শব্দ করলেন, তারপর পড়তে লাগলেন ঃ রংপুরের মধুরাম প্রাইমারী স্কুলের কিশোর বাহিনী — এক বছর আগে আমাদের স্কুলে ছাত্র ছিল ৭০ জন, এখন ছাত্র সংখ্যা ৫৩। গড়ে উপস্থিত হয় ২০/২৫ জন, সবাই ম্যালেরিয়া অথবা পাঁচড়ায় ভুগছে, তাই বেশির ভাগ ছেলে স্কুলে আসতে পারে না, বই নাই ২০ জনের, জামা কাপড় নাই এমন ছাত্রের সংখ্যা ১০ জন। ১৪ ও ১২ টাকা হারে স্কুলের শিক্ষক দুইজন। তাঁরা সপরিবারে রোগে ভুগছেন, তাঁদের দু'মাসের মাইনেও বাকী। মধুরাম স্কুলের কিশোরদের রক্ষা করার জন্য আমরা ৩২ জনকে নিয়ে একটি কিশোরবাহিনী গড়েছি এবং ৩৮ জনকে পাঁচড়া ও ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়েছি। স্কুলেই আমাদের অফিস। কাগজের জন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে আমরা পাঁচ আনা করে চাঁদা তুলেছি।

অজ্ঞাতসারে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ বাঃ। তারপর তিনি আর একটি চিঠি পড়তে লাগলেন ঃ কলকাতার ফার্ণরোডের কিশোরবাহিনী— আমরা আগে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে জামা-কাপড় জোগাড় করে তাদের সাহায্য করেছি। এখন নিজেরাই মাটির খেলনা ইত্যাদি হাতের কাজ করে সেইগুলো বিক্রী করে দুস্থ কিশোরদের সাহায্য করছি।

চট্টগ্রামের হাবিলাস দ্বীপ কিশোরবাহিনী--মহামারী যাতে না ছড়ায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, তাছাড়া স্থানীয় দেশসেবকদের সঙ্গে মিলে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য শস্য, তরিতরকারী ইত্যাদি ফলানোর কাজও করছি.. ভদ্রলোক হঠাৎ চুপ করলেন। বিপুলা কৃতি ফাইলের দিকে তাকিয়ে মেঘমুক্ত মুখে বলে উঠলেন: যাক, বুঝেছি, আমার ছেলেটাই হতভাগা— যাই দেখি একবার থানায় খোঁজ করি। তিনি আবার ঝড়ের মতোই মিলিয়ে গেলেন।

দুঃখ হলো, কিশোরবাহিনীর এতো ভালো চিঠি থাকতে তিনি মাত্র এই কখানাই পড়লেন।" (১৯৪৫ সালে নববর্ষে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হুগলীর চণ্ডীবাটী গ্রাম (আরামবাগ)-এর শ্রীমদন সাহার সৌজন্যে)।

এছাড়াও সুকান্ত ছোটদের জন্য লিখেছিলেন অনেকগুলো ছড়া। এগুলো "আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া নয়, একেবারে একালের টাটকা হাতে গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে রাগে, চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল টকটকে সূর্য-ওঠা দিনের কথা ভেবে। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কেউ লেখেনি।' বাংলাদেশে ছড়ার ঐতিহ্য বহুদিনের। ঠাকুরমা-

দিদিমাদের মুখে মুখে ছড়া যে কবে থেকে চলে আসছিল কে জানে। ছন্দের দোলায় শব্দের যাদুতে শিশু ও কৈশোর মনকে দূরগামী করে তোলে। এর স্নিগ্ধ সৌকুমার্যে একটা সর্বজনীনতা এবং সর্বকালিনতা বর্তমান। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী ছড়াগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। নিজে নতুন করে ছড়া লেখেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু প্রমুখ অনেকেই ছড়া লিখে কিশোর মন জয় করেছিলেন। সুকান্তও দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখতে লিখতে অনেকগুলো ছড়া লিখেছেন। সেগুলোর গ্রন্থাকারে নামকরণও করেছিলেন 'মিঠে কড়া'। সুকান্তর কবিতা যেমন বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ, আধুনিক মননের দ্বারা উজ্জীবিত তেমনি তার ছড়াগুলোও গতানুগতিক মনভোলানো নয়। তার ছড়াগুলোও সাড়াজাগানো। সুকান্তের চোখে ছিল এক স্বপ্ন-- শোষণহীন সুখী শান্তিপূর্ণ এক সমাজ। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন বিশ্বগ্রাসী-ফ্যাসিবাদ আর স্বদেশের দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারী, সবই একসূত্রে গ্রথিত। এদের বিরুদ্ধে যুধ্যমান ছিল সমাজতন্ত্রের শোষণহীন মুক্ত দুনিয়ার কারিগর সর্বহারা মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই সমাজতান্ত্রিক শোষণমুক্ত মানুষেরই জয়যাত্রা ঘোষিত হয়েছিল।

'এক যে ছিল' কবিতাটি সুকান্ত রবীন্দ্রস্মরণে রচনা করলেও এ যেন তারই পরিচয় নিজের ভাষায় লেখা ঃ

এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনকালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।

পড়তে বসে কেবল পথের দিকেই চোখ থাকত তাঁর। তার চেয়েও তার ''পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশি ঝোঁক'। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন 'পুরনো ধাঁধা'-- ছেলেমেয়েদের শোনালেন দনী-দরিদ্রের শ্রেণী-বৈষম্যে সেই চিরন্তন সংগ্রামের কাহিনী।

বলতে পার ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?
'হিং-টিং-ছট' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায়।

কিংবা,

''হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার,
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো। (ব্ল্যাক-মার্কেট)

খোলা চোখে সুকান্ত পথের দিকে, পথিকের দিকে তাকিয়েছিল বলেই এ যুগের সবচেয়ে

বড় সমস্যা কি তা ধরতে তাকে বেশি কেতাবী বিদ্যার ধার ধারতে হয়নি। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সেখানে দেখতে পেয়েছেন দু ধরনের মানুষ। একদিকে আছে কিছু মোটা লোভী লোক। তারা "যা কিছু পায় আঁকড়িয়ে ধরে।" জমি-জায়গা কলকারখানার তারা মালিক। তারা জোতদার-মহাজন-জমিদার কারখানা-ব্যাঙ্কের মালিক। তাদের বিরাট ক্ষুধা। তারা জানে "সবচেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।" অন্যদিকে আছে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটানো"—

"মজুরেরা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে ;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে। (পৃথিবীর দিকে তাকাও)

এরা থাকে কুঁড়ে ঘরে, মজুরের মা সারাদিন খাটে, পরের ভাড়িতে ঝি-গিরি করে।

তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি করেই কাটে কাল।

যখন জোটে তখনো হয়তো "শুনি কড়কড়ে ভাত আর হয়তো একটু ডাল।" কম মজুরির দিনে কিংবা খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হলে এরা গালে হাত দিয়ে শুধু ভাবে। পুরুত বলে এ সবই ভগবানের ইচ্ছা। শিক্ষকরা কেবল ভাল কথা শেখায়—

যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়,
পুলিশ প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়।

তবু ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে কত 'সিপাই বিদ্রোহ', 'আজব লড়াই।' 'একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬,' 'দিন বদলের পালা'র খবর। সে ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস নয়। কারণ সেখানে—

'ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে,
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।" (সিপাহী বিদ্রোহ)

প্রকৃত ইতিহাস অন্য কথা বলে। সেখানে শোষণের অত্যাচার যেমন আছে শোষণ মুক্তির সংগ্রামও তেমনি আছে। একের পর এক সেই ব্যর্থ সংগ্রামের ফলে গড়ে উঠেছে সফল মুক্তির সংগ্রাম পৃথবীর দেশে দেশে। তার প্রথম প্রতিষ্ঠা রাশিয়ায়। "যেখানে হয়েছে গোলামির দিন শেষ", "যেখানে মজুরের আজ জয়"। সেই রাশিয়া গড়েছিল লেনিন। তারপরে তা ছড়িয়ে পড়েছে বহু দেশে যুগোশ্লাভিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, আলবেনিয়ায়, রুমানিয়ায়, পূর্ব জার্মানীতে, চীনে, কিউবায়, উত্তর কোরিয়ায়, ভিয়েৎনামে।

শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন
জীবন সেখানে, তাই
সকলেই সুখে বাস করে আর
সকলেই ভাই-ভাই ;

এক মণেপ্রাণে কাজ করে তারা
বাঁচাতে মাতৃভূমি,
তোমাব জন্যে আমি, সেই দেশে
আমার জন্যে তুমি। (পৃথিবীর দিকে তাকাও)

এখানেই সুকান্তব বৈশিষ্ট্য। শোষণ-নির্ভর অর্থনীতির নিয়ত ছলাকলায় যারা গরীব ও মজুরেব জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধেই সুকান্তের বিদ্রোহ। গল্প, নাটক, কবিতা, ছড়ায় সেই বিদ্রোহ সুকান্ত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে কিশোরদের মনে। অপার কুতূহলী কিশোর চিত্তকে বিদ্রোহী করার জন্য জীবনের পথ এবং পথিক সম্পর্কে সুকান্ত নানা প্রশ্ন তুলে কিশোর দলকে আকৃষ্ট করে তুলে বাস্তবমুখী করে তুলেছে। চাঁদ, পাখী আর আকাশের হাতছানি দিয়ে সেই মনকে সুকান্ত পলায়নী করে তুলতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন জীবনের কঠোর কঠিন সত্যকে তুলে ধরতে। সেজন্য প্রথমে এনেছেন প্রশ্ন, তারপর তার উত্তরে কিছু বিদ্রোহী ঘটনা।

"শিশু আর কিশোরদের সমস্ত মন তাঁর হাত ধরে হারিয়ে যায় না কোনো অলৌকিক স্বপ্নময় মায়া-জগতে ; সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে নয়, যেন তাদের চারপাশেই, তাদের প্রতিদিনকার দেখা এই পরিচিত পৃথিবীতেই তাঁর সাথে জমে ওঠে খেলা, নতুন খেলা। এখানে মাটির তলায় সোঁধিয়ে থাকে মানুষ-মারা বোমা। ধূসর হয়ে আসে সবুজ বনানী, দুর্ভিক্ষের ভয়াল আঙুল ভীষণ হাসিতে হেসে ওঠে হা-হা করে, মুনাফাখোর আর ফাটকাবাজদের অবাধ বিস্তারে খাদ্য হয় বিষ, গবীবের রক্তের বীভৎসতম আস্বাদে পুষ্ট হয়ে ওঠে আকাশ ছোঁয়া লোভের হাত, নিরীহ মানুষেব বুকের ওপরে তাক করা বন্দুকের নল, শ্রেণী-বৈষম্যের জ্বলন্ত প্রশ্ন পুরনো ধাঁধা হয়ে পোড়াতে থাকে বুক। মানুষের পৃথিবীতে এই সব অবাক করা অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা নিয়েই কবি সুকান্তের খেলা তার ছোট ছোট বন্ধুদের সাথে। ছোটদের গল্প শুনিয়ে গান গেয়ে ভুলিয়ে রাখার ধারে কাছেও সুকান্ত নেই ; সবাইকে জাগিয়ে রেখেই তিনি পরিচিত জগতের অপরিচিত নানান চেহারার ছবি তুলে ধরেন সামনে। সবাই যখন চেঁচিয়ে ওঠে, 'এটা কি' বা 'ওটা কেন' তখন যেন খেলা জমে ওঠে সুকান্তর। কিশোর বাহিনীর অধিনায়ক তখন জাঁকিয়ে বসেন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে। মিষ্টি কথার গল্প আর মিহি সুরের গান কখন যেন বদলে যায়। আকাশে জমে ওঠে কালো মেঘ, ধুলোর ঝড় ওঠে বাতাসে। বিদ্যুতের আলোয় তবু ঝকঝকিয়ে ওঠে কালো মেঘ, ধুলোর ঝড় ওঠে বাতাসে। বিদ্যুতের আলোয় তবু ঝকঝকিয়ে ওঠে গল্প শুনিয়েদের জোড়া জোড়া চোখ। বন্ধ হয়ে আসে নিঃশ্বাস। শুধু গমগম করে বেজে চলে একজনের কণ্ঠস্বর। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে সে যেন এক যুদ্ধ।" এই যুদ্ধ জীবনের যুদ্ধ। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে শান্তি ও সুখের যুদ্ধ, অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের যুদ্ধ। আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুমের বিরুদ্ধে মিঠে কড়া পাকের জ্বালা ধরানো ছড়ার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। যেখানে 'তোমার জন্যে আমি, আর আমার জন্য তুমি' সেই দেশ গড়ার যুদ্ধ। সে যুদ্ধ এখনো চলছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সমাজ সচেতনতা

কোন ভাব, কল্পনা বা আদর্শ আকাশ থেকে পড়ে না, জীবনের মধ্যেই তার সৃষ্টি আর সেই জীবন সমাজবদ্ধ। অতএব যে কোন ভাব বা আদর্শের মধ্যেই নিহিত আছে সৃষ্টিকালের সমাজ-চেতনা। সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেই সে যুগের চেতনার সন্ধান করতে হয়।

আবার যে দিন থেকে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে সে দিন থেকে দেখা যায় সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোর জার্মাণ সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৮৩) বলেছেন, "that economic production and the structure of society of every historical epoch necessarily arising therefrom constitute the foundation for the political and intellectual history of that epoch ; that consequently (ever since the dissolution of the primeval communal ownership of land) all history has been a history of class struggles, of struggles between exploited and exploiting, between dominated and dominating classes at various stages of social development." অর্থাৎ প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তার থেকে উদ্ভূত সমাজ কাঠামো সেই যুগের রাজনৈতিক এবং মানসিক ইতিহাসের ভিত্তিভূমি। সুতরাং আদিম যুগের ভূমির উপর যৌথ মালিকানা অবলুপ্তির পর থেকে সমস্ত ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিতের সংগ্রামের ইতিহাস, সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবদমিত ও প্রভুত্বকারী শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস।

"সুকান্তের জীবন ও যুগ' অধ্যায়ে আমরা দেখেছি সুকান্তের কৃতির যুগে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও বিপ্লবকে স্তব্ধ করার জন্য তারা ফ্যাসিবাদের পথ গ্রহণ করেছে। হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে চক্রান্ত করে সর্বহারাদের দেশ সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করে সর্বহারার বিপ্লবী চেতনা নির্মূল করে দিয়ে নিজেদের অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা বিলম্বিত হলেও পেছনে ঘোরে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাই প্রামাণিত হয়েছে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হোত না তা বিনষ্ট হয়েছে। অতএব এ যুগটা ছিল সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের যুগ আর সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠার যুগ।

তিরিশ দশকের শেষের দিকে এ বিপ্লবী চেতনা ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে, হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণে তা দুর্বার হয়। আমাদের দেশেও জাতীয় আন্দোলনে বার বার ব্যর্থতা মার্কসবাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করে। প্রতিক্রিয়ার নানা কুৎসা প্রচারেও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকর্ষণ বিশেষ করে তরুণ মনে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেল।

সুকান্তের কবিতায় সেই সমাজ চেতনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন "পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—"। সেই যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নিয়মে গতিশীল

সমাজে বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অবশেষে সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পর্যায় শুরু হয়। লেখক শিল্পীরা সেই পর্যায়ের প্রারম্ভকে ত্বরান্বিত করতে পারেন তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে। এই আন্তর্জাতিক চেতনার জন্যই সুকান্ত বলতে পেরেছিলেন "যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।" প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার নিয়ামকদের ধ্বংসের ফলেই নবজাতকের আবির্ভাব সম্ভব হবে। সুকান্ত সেই নবজাতকের কবি। নবজাতকের বাসযোগ্য করে পৃথিবীকে গড়ার অঙ্গীকার নিয়েই তাঁর কাব্য সাধনা। এই সাধনা সেই যুগের সাধনা।

দেশের এবং বহির্বিশ্বের এই রাজনৈতিক ঝড় যখন সুকান্তের কিশোর মনকে নাড়া দিল তখন সুকান্তের বয়স ১৪/১৫। তাঁর নিজের ভাষায় তখন

"আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।" (আগামী)

বটবৃক্ষের সমাজে, খ্যাতিমান, কীর্তিমান কবি-সমাজে নগণ্য হলেও তার ক্ষুদ্র শরীরে গোপনে গোপনে যুগের মর্মর ধ্বনি বাজে। স্বাভাবিক অনুভবে তিনি নিজেকে "ভাবী বনস্পতি" বলেই মনে করেন। চারিদিকে যখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন "যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়" তখন স্বাভাবিক ভাবেই "পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী।" (খবর) পরাধীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ নিরন্ন, দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালায় জর্জরিত। তাই অনুভূতি প্রবণ কবি স্বাভাবিক ভবেই ১৯৪০ সালে অনুভব করেন ঃ

দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে ;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম। (অনুভব)

'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম'-- পরাধীন দেশের বঞ্চিত, অবহেলিত, উৎপীড়িত মানুষের গভীর ক্ষোভের কথা এই একটি বাক্যে অপূর্ব বাঙ্‌ময়তা লাভ করেছে। বহু রক্তাক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশে বহু মানুষ শহীদ হয়েছে। কেবল এ দেশেই নয়, তখন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী নরমেধ যজ্ঞে সারা পৃথিবী রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। গভীর সংবেদনশীল মন এসব দেখে শুনে নিশ্চুপ থাকতে পারে না। বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবন-পথে প্রতি পদে পদে তিনি দেখেছেন শ্রেণী বৈষম্য ঃ ধনীরা মোটর গাড়ি চড়ে বেড়ায় আর পথযাত্রীরা সেই গাড়ির তলায় চাপা পড়ে। যে শ্রমিকেরা ধনীর বিরাট অট্টালিকা তৈরি করে তারা কুঁড়েঘরে মাছির মত মরে। যারা রোদে জলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধনীর মুখে খাদ্য যোগায় তারাই তাকে নিরন্ন। কিন্তু কেন? —এইসব নানা প্রশ্ন কবিকে বিব্রত করে তোলে। আবার একই সঙ্গে ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বাস করে পাশের বিরাট উদ্যত প্রাসাদকে দেখে তিনি বিস্ময়ে উপলব্ধি করেন "উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা"। হঠাৎ একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করেন প্রাসাদের কার্ণিশে

একটি অশ্বত্থ গাছের চারা। এর মধ্যেই কবি যেন একটি মহৎ সত্যের সন্ধান পান। শোষণজীবী বুর্জোয়া সভ্যতা দ্বান্দ্বিক নিয়মেই সৃষ্টি করে সর্বহারা শ্রেণীর। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে তারা গড়ে তোলে তাদের মূলধনের পাহাড়। একদা সামন্তবাদকে ধ্বংস করে যে বুর্জোয়া শ্রেণী একটা বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা কালে কালে হারিয়ে যায়। বিরাট প্রাসাদ ক্রমেই জীর্ণ হয়ে পড়ে। তার ফাটলে ফাটলে গজিয়ে উঠে অশ্বত্থ গাছের চারা। ক্রমে সেগুলো বড় হয়ে উঠে। তাদের শিকড়ে শিকড়ে প্রাসাদ বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। শোষিত সর্বহারা শ্রমিক ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়। তাদের শক্তি যত বাড়ে বুর্জোয়ার প্রাসাদে তত ফাটল ধরে। ধনতন্ত্রের সংকট তার স্বাভাবিক নিয়মেই নতুন দিকে মোড় নেয়। এই ঐতিহাসিক সত্যকেই সুকান্ত এখানে প্রত্যক্ষ করেছেন। আসন্ন দিনের একটি সুন্দর ছবি তাই তার কল্পনায় ভেসে ওঠে :

তাইতো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে। (চারাগাছ)

তাই কবির একক পৃথিবী ভেসে যায় "জনতার প্রবল জোয়ারে"। জনতার মধ্যে এসে তিনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে নির্মমভাবে উপলব্ধি করলেন। এই সমাজের একদিকে আছে মোটা মালিক আর তার সহযোগী পুরুত এবং শিক্ষক। তারা ধনী দরিদ্রের বৈষম্যকে ভগবানেরই সৃষ্টি বলে প্রচার করে মালিকের স্বার্থে। দিন রাত হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে যখন শোষিত মানুষ অসহ্য হয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে তখন শিক্ষক বলে, "চালাকি করো না, ভাল কথা যাও শিখে।" (পৃথিবীর দিকে তাকাও)। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী তার অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জানতে পারে, "মূলধন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না, কারণ এটা সমাজের সমবেত শক্তির আধার। সমাজের সমবেত চেষ্টা ছাড়া একে চালানো যায় না।" (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো) শ্রমিক তার শ্রমের প্রকৃত মূল্য পায় না। তাকে তার শ্রমের পরিবর্তে যা দেওয়া হয় তাতে "হয়তো শুধু কড়কড়ে ভাত আর হয়তো একটু ডাল" জোটে। "বুর্জোয়া সমাজে বর্তমান শ্রমিক দল শুধু অতীতের শ্রম-লব্ধ ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবার যন্ত্র বলে গণ্য হয়।" অতএব শ্রমিককে শুধু মূলধন বৃদ্ধি করবার জন্যে এবং শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কাজে লাগানোর বিরুদ্ধে "যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়/পুলিস প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়"। কবি সুকান্ত তখন জেনেছেন :

রাশিয়াই, শুধু রাশিয়া মহান দেশ,
যেখানে হয়েছে গোলামির দিন শেষ ;
রাশিয়া, যেখানে মজুরের আজ জয়,
লেনিন গড়েছে রাশিয়া। কী বিস্ময়। (পৃথিবীর দিকে তাকাও)

এই বিস্ময়-মাখানো চোখে নতুন মার্কসবাদী চেতনায় সুকান্ত সমাজ এবং তৎকালীন ঘটনাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন দুর্বার, শ্রমিক-কৃষক পাশাপাশি জেগে উঠেছে। অহল্যাভূমি জেগে উঠেছে। "তুষার-জনতা

বুঝি জাগ্রত হয়।" (সূচনা) অন্যদিকে পূর্বদিকে জাপানী আক্রমণে "গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে।" বিদেশী চরেরা গোপন ষড়যন্ত্রে রত। "হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত।" যুদ্ধের সঙ্গে এল দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এখানে "ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—।" এই রক্তাক্ত দিনে নিশ্চিত উপবাসের মধ্যে সুকান্তের মনে ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস। আত্মপরিচয়ে তিনি বলেন ঃ

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।" (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

স্বভাবতই "শান্তির ললিত বাণী" ব্যর্থ পরিহাসের মত শোনায়। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই একমাত্র পথ। সংগ্রামী পথে রক্তের আল্পনায় কবি কণ্ঠ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে ঃ

আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু ঃ এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ। (শত্রু এক)

সুকান্তের দৃষ্টিতে 'লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।" তাই তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "রক্তে আনো লাল,/রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।" (বিবৃতি) দেশে দেশে এই পতাকা তিনি উড্ডীন হতে দেখেছেন মুসোলিনীর পরাজয়ে (রোম, ১৯৪৩), স্তালিনগ্রাদের বিজয়ে, হিটলারের আত্মহত্যায়, ফ্যাসিবাদের আত্মসমর্পণে। দেখেছেন মার্কসবাদী চিন্তাধারণার অসামান্য সাফল্য। সেই সাফল্যে সংগ্রামী শ্রমিকের মত কবির হৃদয়ও উল্লসিত ঃ

হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন-
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ। (লেনিন)

'আঠারো বছর বয়স' সুকান্তের একটি বিশিষ্ট কবিতা। সুকান্তের যখন আঠারো বছর বয়স তখনই (১৯৪৪ সাল) সে এই কবিতা লিখেছিল। তবু এই কবিতায় তার নিজের অনুভব এক নির্বিশেষ অনুভবে চিরন্তনত্ব লাভ করেছে। ফলে এই কবিতা হয়ে উঠেছে প্রতীকী। আঠারো বছর এক বয়ঃসন্ধিকাল। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হবার কাল। ইংরেজিতে অবশ্য তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সকে বলা হয় টিন-এজ। কিন্তু আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে আঠারো বছরই প্রাপ্তবয়স্কের কাল। এই সময়টা সব মানুষের জীবনেই এক সাবালকত্ব অর্জনের কাল। যৌবনের এই সূচনাকালে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় এক প্রচণ্ড আবেগ,

আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রসার এবং সব বাধাবিঘ্নকে অপসারিত করে এগিয়ে যাবার এক দুর্মর বাসনা। এই বয়সে কবিতা লিখতে বসে সুকান্ত তার আবেগ এবং অনুভবকে যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজ মহাকবি মিলটনের একটি সনেটের উল্লেখ করতে পারি। তাঁর সনেটের নাম 'On his having arrived at the Age of Twenty-three.' কিন্তু তাঁর কবিতার সুর ভিন্ন। মিলটন-এর কবিতায় আছে নিছক আত্মোপলব্ধি। তিনিই বুঝতেই পারেননি কী করে কত সূক্ষ্মভাবে তার যৌবন তেইশ বছরে উপনীত হয়েছে। তার মনের দিকে তখনো কোন কুঁড়ি বা কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি। তবু যখন তিনি প্রাপ্তবয়স লাভ করেছেন তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাকে বরণ করে নেবেন। এই কবিতা একান্তগতই আত্মগত।

সুকান্তর কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এই কবিতায় একদিকে যৌবনধর্মের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি যে যুগ ও পরিবেশে এই আঠারো বছর এসেছে তারও চমৎকার পরিচয় এসেছে। সব মিলিয়ে এই কবিতা হয়ে উঠেছে এক বিদ্রোহী কবিতা। এই বিদ্রোহ আছে যৌবনের স্বধর্মে। এই বয়সে কোন শ্রেণীভেদাভেদ নেই, এই বয়সটাই দুঃসাহসের বয়স, প্রচণ্ড ঝুঁকি নেওয়ার বয়স, স্পর্ধা করার বয়স। এই সময় ভয় ভীতি নেই। নেই মাথা নত করে সব কিছু মেনে নেবার অবস্থা। বরং এই বয়স চায় পদাঘাতে সব প্রতিকূল পাথর ভেঙে ফেলতে। জীবন মৃত্যু এ বয়সের কাছে মনে হয় অতি তুচ্ছ। তাই অনায়াসে তারা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে চলে। এরা প্রতিশ্রুতি পালন করতে কোন দ্বিধা করে না।

মনোবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন এ বয়সের আবেগ অতি তীব্র। তাই এদের যন্ত্রণাও অনেক বেশি। তাই এদের গতিবেগ দুর্বার। পবিণত বুদ্ধি নয় বলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রাণে যেমন দুরন্ত আবেগ তেমনি তারা আঘাতও পায় অবিশ্রান্ত; যতই আঘাত আসুক তারা কিন্তু পিছু হটে না। ঝড়ে, দুর্যোগে, শত বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাবার সাহস এদেরই থাকে। তারা ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়। তাই সুকান্তের কামনা জড় আর মৃত এ স্বদেশভূমিতে 'আঠারো আসুক নেমে।' এই আঠারোর মধ্যে তেজীয়ান অশ্বের মতো একটা অপূর্ব চিত্রকল্প আমাদের সামনে ভেসে উঠে।

এই কবিতার পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলি যখন একদিকে বিদেশী আক্রমণ অন্যদিকে মারী আর মন্বন্তরে দেশ শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। আশাহত ভরসাহীন অনন্ত অন্ধকারে তখন একমাত্র সাহস জুগিয়েছিল তরুণ যুবকেরা। যারা নিঃস্বার্থভাবে শোষণমুক্তি এবং সমাজ পরিবর্তনের এক দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুকান্ত ছিল সেই জনতার কর্মী। এই কবিতার মধ্য দিয়ে সুকান্ত এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতা এক নির্মম বাস্তবের চিত্রকল্প কিন্তু তার বস্তুগত তন্ময়তায় এবং আবেগের উদ্দীপণে এই কবিতা হয়েছে শাশ্বত।

প্রথম এবং তৃতীয় পঙক্তি এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির মধ্যে মিল রেখে বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য কয়েকটি সুন্দর চিত্রকল্পও ব্যবহার করেছেন। যেমন, "পদাঘাতে চায়

ভাঙতে পাথব বাধা', 'বাষ্পের বেগে স্টীমারের মতো চলে' 'শপথের কোলাহলে', 'দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা', 'দুর্যোগে আর ঝড়ে'। অর্থাৎ এই যৌবনের আছে হারকিউলিসের মতো শক্তি। বাষ্পের বেগে যেমন স্টীমার চলে তেমনি আবেগের জোরে যৌবন চালিত হয়। শপথেব কোলাহল-- প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষের মিছিল। দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা বলতে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে এক দুরন্ত নাবিকের চিত্র ভেসে আসে। দুর্যোগে আর ঝড়ে-- .. এক প্রচণ্ড দুর্দিন আর কালবৈশাখীর ঝড়। এ ছাড়াও আছে 'প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা'। ঝুলির মধ্যে থাকে মানুষের সংগৃহীত বস্তু। কোনো ঝুলির মধ্যে প্রাণ দেওয়া নেওয়া থাকে না। এখানে ঝুলি বলতে কোন মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে। আদর্শনিষ্ঠ আবেগে থরথর কর্তব্য পালনে দৃঢ়চিত্ত আঠারো বছরের যুবক আত্মসমপর্ণের জন্য, প্রাণবলি দেওয়ার জন্য যেমন দৃঢ়সঙ্কল্প তেমনি প্রয়োজনে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে শত্রুর প্রাণ সংহারেও অকম্পিতচিত্ত।

অবস্থা তখন প্রতিকূল, পদে পদে বাধা আর বিপদ কিন্তু আঠারো বছর বয়সটাই এমন দুর্বার তার মধ্যে কোন ভীরুতা নেই। সে কাপুরুষ নয়। তার সামনে একটাই লক্ষ্য সে নতুন একটা কিছু করে যাবেই। সেজন্য সব বিপদ বাধা অতিক্রম করে সে জানে শুধু এগিয়ে চলতে। তার মনে কোন দ্বিধা নেই, সংশয় নেই।

সুকান্ত তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই যৌবনের আবেগ যন্ত্রণা এবং এগিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা উপলব্ধি করেছিল। সেই যুগটাই ছিল এমন। আমরা ইতোপূর্বে কিশোর বাহিনীর ভূমিকায় কর্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনে তার স্পষ্ট পরিচয় লাভ করেছি। আঠারো বছরে উপনীত হয়ে সুকান্ত যেন নতুন করে যৌবনধর্মকে, তার আবেগ, বেদনা আর যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিল তাই সে চল্লিশের সেই দুর্দিন আর দুর্যোগের দিনগুলোতে একান্তভাবে কামনা করেছে, " এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।" বার্ধক্য, জড়তা আর স্থবিরত্বের কোন স্থান নেই এই বিপদের দিনে। যুদ্ধ যখন সম্মুখে উপস্থিত তখন সাহসী সৈনিকের মতো সেই যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিতেই হবে। এই স্থির সঙ্কল্পেই সুকান্ত এই কবিতায় দুরন্ত আঠারোর বন্দনা করেছেন।

দুর্ভিক্ষ কবলিত দীর্ঘদিনের পরাধীন ভারতবর্ষেও লেনিনের মুক্তির স্বপ্ন গণজীবনকে উত্তাল করে। গণ-আন্দোলনের কবি সুকান্তের তখন নিজেকে মনে হয়েছে, "আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।" ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার সহোদর। বিস্ফোরণের চরম প্রতীক্ষায় কাল গুনছেন। সেই 'কাল' দেখা দিল ১৯৪৫-৪৬ সালে, রাশিয়ার হাতে ফ্যাসীবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ে। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি দিবসে রামেশ্বর শহীদ হলেন, ফেব্রুয়ারিতে রসিদ আলি দিবসে আবদুস সালাম, বরকত শহীদ হলেন। প্রতিবাদে পনের হাজার ছাত্রের দৃপ্ত মিছিল, সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট, ইন্দো-চীনে ফরাসী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস, ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বোম্বাইয়ে ঐতিহাসিক সশস্ত্র নৌ-বিদ্রোহ, জুন মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্মচারিদের ধর্মঘট, জুলাইয়ে ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারীদের দেশ জোড়া ধর্মঘট ; ২৯শে জুলাইতে অভূতপূর্ব বাংলা বন্ধ সেই বিক্ষোভেরই মূর্ত প্রকাশ। এর প্রতিটি সংগ্রামের

শরিক সুকান্ত তাই লিখেছেন, "বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে।"—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ। (অনুভব)

এই বিদ্রোহের মধ্যেই কবি সোচ্চারে ঘোষণা করলেন, "তাদের দলের পেছনে আমিও আছি, তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।" গণ-বিদ্রোহের সঙ্গে কবি নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সঙ্ঘবদ্ধ মিছিলের মধ্যে "জনতার মৃত্যুজয়ী-গান" শুনতে পেয়েছিলেন। যুদ্ধফেরৎ 'কনভয়',-এর মধ্যে তিনি দেখতে পান 'যুগযুগান্তের রাজপথ বেয়ে' ছুটে আসা জনতা। 'ফসলের প্রতি তাদের পুরুষানুক্রমিক মমতা।' ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পরাস্ত মানুষকে "বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা" নিয়েছেন তিনি। তিনি নিজের হাতে কৃষকের কাস্তে তুলে নিয়েছেন। সে কাস্তে চৈতন্যপ্রখর দীপ্ত, 'যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে", যে কাস্তে শত্রুর মৃত্যু ঘনিয়ে আনবে। তাই তিনি লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সুদে আসলে যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য আদায় করতে চান ঃ

শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হ'ল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই। (বোধন)

দীর্ঘকালের শোষণ, অত্যাচার, অবজ্ঞা এবং অবহেলায় প্রতিশোধস্পৃহা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা কোন ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থতা করা নয়। মার্কস বলেছেন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ... সমাজব্যবস্থার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে মানুষও তার অংশীভূত ; উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন-ব্যবস্থার সংঘাত মানুষকে চেপে ধরছে, মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সংঘাতের তীব্রতা মানুষকে নতুন সমাধানের সন্ধানে চালিত করছে। উৎপাদন ব্যবস্থা তো মানুষ-বর্জিত প্রকৃতি-জগতের বিষয় নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত। সেজন্য মানুষকেই সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। অতএব মার্ক্সের সামাজিক গতিসূত্রের প্রথম কথা হোল— সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বে শোষিত শ্রেণীর সচেতন কর্মপ্রচেষ্টা। কারণ উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে বৈপ্লবিক শ্রমিক শ্রেণীই হোল সবচেয়ে শক্তিশালী উৎপাদিকা শক্তি। (" Of all the instruments of production, the greatest

productive force is the revolutionary class itself."--Poverty of Philosophy--Marx.)

মানুষ চিরদিন ধনতন্ত্রের অরাজক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে পারে না। পরিকল্পনাবিহীন পুঁজিবাদী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত এই সমাজকে অন্ধভাবে সঙ্কট থেকে সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনই এই সঙ্কটের প্রকৃত সমাধান। সেখানে মুনাফাবৃদ্ধির স্বার্থসংঘাত থাকে না বলে সর্বসাধারণের প্রয়োজন মত উৎপাদনের পরিকল্পনা মানুষের সমবেত কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করবে, প্রতিযোগিতার অন্ধ সংঘর্ষ মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যর্থ ও সংশয়াপন্ন করবে না। সকলের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে যে সমাজব্যবস্থা পরস্পর সহযোগিতায় পরিচালিত হয় তাতে মানুষের সমগ্র মানসিক ক্ষমতার নব নব উন্মেষের পথও উন্মুক্ত হয়। কবি সুকান্ত সেকথা জানতেন। সেজন্য বোধন কবিতায় প্রচণ্ড আবেগের বশবর্তী হয়ে 'আদিম হিংস্র মানবিকতা'র কথা বললেও পরেই তিনি বলেছেনঃ

হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা--
আজকে শক্তি দাও, যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি। (বোধন)

বিপ্লবী সর্বহারার সংগঠিত সমবেত শক্তির সশস্ত্র প্রতিরোধেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসাধন করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

মার্কসবাদী এই শ্রেণীসচেতনতারই পরিচয় পাওয়া যায় 'চারাগাছ', 'একটি মোরগের কাহিনী', সিঁড়ি', 'কলম', 'সিগারেট', 'চিল', 'রানার', প্রভৃতি কয়েকটি প্রতীকী কবিতায়। চিল ছাড়া উল্লেখিত প্রতিটি প্রাণী বা বস্তুই শোষিত সর্বহারার প্রতীক। এই ধরনের চিত্রকল্প, প্রতীক এবং রূপকের ব্যবহার সুকান্তের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আমরা পাইনি। অথচ উপকরণগুলো মোটেই নতুন নয়। সিঁড়ি, কলম এবং সিগারেটের সঙ্গে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এগুলো ছাড়া আমাদের জীবনই চলে না। অথচ এগুলো যে কোনদিন কাব্য কল্পনার কোন কাজে লাগতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। সুকান্ত সেই অভাবিত এবং অতি পরিচিত উপকরণগুলোকেই অতি সার্থকভাবে ব্যবহার করে আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করেছেন।

সিঁড়ি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমরা প্রতিদিন ওপরে উঠে আসি। পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এই সিঁড়ি সুকান্তের কাছে অত্যাচারিত সর্বহারর রূপক। সিঁড়িকে পদদলিত না করে কেউ ওপরে উঠতে পারে না আর সর্বহারা শ্রেণীকে পদদলিত এবং শোষিত না করে পুঁজিপতির ধনবৃদ্ধি হতে পারে না। কার্পেট দিয়ে যেমন সিঁড়ির বুকের ক্ষতকে ঢেকে রাখা হয় তেমনি সর্বহারাকে শোষণের নগ্নতাকে সেবা, কল্যাণ প্রভৃতি নানা বিশেষণে আবরিত করে রাখবার সযত্ন চেষ্টা

করা হয়। কিন্তু কোন সত্যকেই চিরকাল মিথ্যা বুলি দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

'কলম' কবিতাটি একটি শক্তিশালী কবিতা। কত যুগ, কত কাল ধরে এই কলম অক্লান্তভাবে কত কাহিনী লিখে এসেছে। ক্রীতদাসের মত যুগ যুগ ধরে সে লেখকের আজ্ঞাবহ হয়ে এসেছে। অক্লান্ত প্ররিশ্রমে তার "ভগ্ন শির, রুগ্ন দেহ, জলের মত কালি"। নিরপরাধ হয়েও তার ভাগ্যে জুটেছে কেবল লেখকদের ঘৃণা আর গালাগালি। ততক্ষণে কলমে আরোপিত হয়েছে সমাসোক্তি অলংকার। এই কলম আর অচেতন জড় পদার্থ নয়। তখন কলম পরিণতি লাভ করেছে দাসত্বের নির্মম বন্ধনে আবদ্ধ ক্রীতদাসের মধ্যে। তার দুঃখে কাতর কবি তার মধ্যে চেতনার সঞ্চার করবার জন্য তাই বলেন ঃ

হে কলম! হে লেখনী! আর কত দিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ?
আর কত মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে?
আর, কত আর
কাটবে দুঃসহ দিন দুর্বার লজ্জার?
এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ কর— কাজ।

চারিদিকে যখন নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যখন শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ধর্মঘট করছে, বিদ্রোহ করছে, তখন কলম-ক্রীতদাসেরও শিকল ছেঁড়ার সময় এসেছে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন সমাপ্ত-প্রায়। সচেতন কবি তাই অচেতন কলমকে আহ্বান করে বলেন ঃ

--কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ।
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে ;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে।।

সিগারেট আরেকটি বিশিষ্ট কবিতা। সিঁড়ি কলমের মত এই কবিতায়ও মানবিক আবেদন এত প্রগাঢ় যে কবিতাটি কখন শিরোনাম ছাড়িয়ে গভীর ক্ষোভে দুঃখে বিদ্রোহে সরব হয়ে ওঠে। সিগারেট যখন বলে—

কেন এত স্বল্প-স্থায়ী আমাদের আয়ু?
মানবতার কোন দোহাই তোমরা পাড়বে?

তখন পাঠকের চোখের সামনে শোষণে শোষণে জর্জরিত ক্ষীণ-আয়ু শ্রমিকের ব্যথা-ভরা

অভিযোগই ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর পালোয়ান যক্ষপুরীর শোষণের টানে একদিন যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় তেমনি পুঁজিপতি শ্রেণীর অবিরাম শোষণের টানে শ্রমিকের অকালমৃত্যু ঘটে। বহু শ্রমিকের মৃত্যুর আগুনে মালিকের আরাম নিবিড়তা লাভ করে। কিন্তু এমনি করে দীর্ঘকাল চলতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। সেজন্য তারা আর "আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে' নিঃশব্দে নির্বিবাদে সহ্য করতে নারাজ। তাই বিক্ষুব্ধ সিগারেট বলে ওঠে ঃ

আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে—
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিটকে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল।।

বহা বাহুল্য, এসব কথা তো সিগারেটের নয়। এই কথাগুলো এতকাল ধরে তিল তিল করে পুড়ে-মরা লাঞ্ছিত বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ; বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের। পদদলিত সিঁড়িও অনুভব করে 'গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি!' কলমকেও তাই তিনি প্রতীকী অর্থে বলেন ঃ

এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।
তাই যত লেখ, তত পরিশ্রম এসে হয় জড়ো ঃ
—কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো। (কলম)

দেশলাই কাঠিকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করতে হয় না। সে নিজেই তার দাহ্যশক্তি সম্পর্কে সচেতন। সে তাই স্পর্ধিত কণ্ঠে বলে, "আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে।" এতকাল সে জ্বলে উঠেছিল নিতান্ত অবহেলায়, এবার সে জ্বলে উঠবে একা নয়, সকলে একত্রে। তখন মরা চিলের মত সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। জাগ্রত জনতা নিষ্ঠুর বিদ্রূপে তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। 'চিল' এখানে শোষকের প্রতীক।

'একটি মোরগের কাহিনী' সুকান্তের একটি জনপ্রিয় এবং উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতায় সুকান্ত ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্র হাতে নিয়ে একদিকে যেমন অসম এবং অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তেমনি তিনি এই সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাত করে সমাজ জীবনের এই চরম অসংগতি, অবিচার সম্বন্ধে পাঠকমাত্রকেই সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

মোরগটি এখানে বঞ্চিত মানুষের প্রতীক। তার বাঁচবার অধিকার জন্মগত হলেও কোথাও সেই অধিকারের স্বীকৃতি নেই। তার আশ্রয়ের সংস্থান নেই, খাদ্যের যোগাড় নেই। অথচ অন্যত্র দেখা যায় প্রাচুর্যের স্ফীতি। প্রয়োজনের তুলনায়ও অনেক বেশি। তারা শোষক। ছলে বলে কৌশলে অন্যকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে সমগ্র সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করে

রাখার এক গভীর চক্রান্ত।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এরা মুষ্টিমেয় অথচ এরাই সকল কিছুর নিয়ামক। অন্যদিকে বঞ্চিত সর্বহারা মানুষ বাধ্য হয় আস্তাকুঁড়ে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে উচ্ছিষ্টের ভাগীদার হতে। স্বাভাবিকভাবেই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু ধনিকগোষ্ঠীর হাতে আছে প্রশাসন যন্ত্র। পুলিস মিলিটারীর সাহায্যে তারা প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়।

অসহায় মানুষের জীবনযন্ত্রণার মর্মন্তুদ কাহিনীই এই কবিতায় বাঙ্‌ময়রূপ লাভ করেছে। এই যন্ত্রণা ট্রাজিক রূপ লাভ করেছে যখন এই প্রতিবাদী ক্ষুধায় কাতর মোরগটি নিজেই একদিন সেই বিরাট প্রাসাদের দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে চলে যায়। কারণ ধনপতি বলে, "সবচেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।" (ভাল খাবার) শোষিত বঞ্চিত মানুষের অসহায়তার এমন করুণ চিত্র বাঙলা কাব্যে আমরা পূর্বে দেখিনি। চিত্রকল্পের অনন্যতায়, রূপকের চমৎকার ব্যবহারে, ভাবের গভীরতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় একটি মোরগের কাহিনী সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে।

আগ্নেয়গিরির 'পুঞ্জীভূত ফুটন্ত লাভা' বুকে নিয়ে কবি চারিদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন মিথ্যার ভিৎ, শোষণের দীর্ঘশ্বাস। শোষণের কুঠারে কুঠারে আহত হতে হতে একদিন তার বিস্ফোরণ হবে। ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেবে "মিথ্যার ভিতে কল্পনার মশলায় গড়া" ধনীর শহর, শোষণের স্বর্গচূড়া। ধনীরা অনায়াসে বা অল্প আয়াসে সিগারেটের মতো সর্বহারা মানুষকে নিঃশেষ করে একটা অদ্ভুত আরাম যেন উপভোগ করে। এমনি করে চিরকাল চলতে পারে না। 'রানারে'র 'চিঠি আর সংবাদের' বোঝায় সেই খবর এসেছে। 'সিগারেট'ও শোষিতের প্রতীক। রানারের গতি কিন্তু শোষণমুক্তির প্রতীক। অপূর্ব ছন্দের দোলায়, ভাবের ব্যঞ্জনায়, আবেগের গভীরতায়, উপমা রূপকের সার্থক দ্যোতনায়, সর্বোপরি 'আলোর স্পর্শে' দুঃখের কাল কেটে যাবার বহু প্রতীক্ষিত কামনায় 'রানার' কবিতা সুকান্তের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির মধ্যে অনন্য। রানার কবিতার শেষ স্তবক সমগ্র পাঠককে, সমগ্র মুক্তিকামী মানুষকে আবেগে আপ্লুত করে বাঁধন ছেঁড়ার নেশায় অনেকদূর ঠেলে দেয় ঃ

শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার।। (রানার)

বহু কাল, বহু যুগ ধরে গ্রামের রানার চিঠি, সংবাদ আর টাকার বোঝা পিঠে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দ্রুত পা চালিয়ে ভোরে ভোরে শহরের 'মেল' ধরিয়ে দিয়েছে। তার পিঠের বোঝায় অপেক্ষা করে আছে কত মানুষের সুখ দুঃখের খবর। কিন্তু এই গ্রামের রানার কত দুঃখ কষ্ট

দস্যুতার ভয় সহ্য করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তার খবর তো কেউ রাখে না। তার পিঠে টাকার বোঝা অথচ সে নিজে ক্ষুধার্ত। কলুর বলদের মত কেবল ঘানি টেনে চলেছে। রানার এখানে শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতীক। কিন্তু এই বঞ্চনা চিরদিন চলতে পারে না। বঞ্চিত মানুষের জাগবার দিন সমাগত। তাদের সংহত প্রতিরোধে শোষণের দুর্গ ভেঙে পড়বেই। আজ রানারকে সেই খবর পৌঁছে দিতে হবে অগ্রগামী মানুষের কাছে। এই খবরের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জড়িত। তাই সে ছুটে চলেছে জোরে, আরও জোরে।

কবি আপন প্রেরণার টানে তার ভাষা তৈরী করেন। তিনের দশকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার প্লাবন বয়ে গিয়েছে। তাতে অনেক নতুন বক্তব্য, অনেক নতুন ভঙ্গি এসেছিল। কিন্তু চারের দশকে সুকান্ত বাংলা কাব্যে যা দিলেন, তা বক্তব্যে, ভাষায় সবদিক থেকেই নতুন। এমন প্রতীকী তাৎপর্য, উপমা, রূপক এবং কবিতার নিহিত বক্তব্য সুকান্তের পূর্বে বাংলা কাব্যে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেননি। চারের দশকের প্রবল গণ-আন্দোলন, উত্তাল আবেগ অনেক কবিকেই নাড়া দিয়েছিল কিন্তু তারা কেউ তাকে আত্মস্থ করতে পারেননি। দূরে দাঁড়িয়ে তারা সেই আগুনের উত্তাপ উপভোগ করেছিলেন, আগুনে পুড়ে যে জ্বালা তা কেউ অনুভব করতে পারেননি। একমাত্র সুকান্তের কাব্যেই তা সম্ভব হয়েছে। তার বসন্ত কেটেছিল খাদ্যের সারিতে, লঙ্গরখানায়, ধর্মতলার মোড়ে পুলিশের গুলির মুখে। সেজন্য খাদ্যের মিছিলে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মুক্তি নেশায় দৃঢ় সংকল্প জনতার জাগরণ। আপাতদৃষ্টিতে দেশলাই, সিঁড়ি, চিল, সিগারেট প্রভৃতি তুচ্ছ জড়বস্তুর মধ্যেও সেজন্য তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন সেই জ্বালার মর্মদাহ। সেজন্য তাঁর পক্ষেই 'চরমপত্র' দেওয়া স্বাভাবিক। অনেক দুঃখের আঘাতে প্রতিঘাতে অগণ্য চাষী মজুর গ্রামে শহরে জেগে উঠেছে। তারা সকলে মিলে 'রক্তে-লেখা' চরমপত্র পাঠাচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর কাছে ঃ

"পবিত্র এই মাটিতে তোমার মুছে গেছে ঠাঁই,
ক্ষুব্ধ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত 'স্বাধীনতা চাই'।
বহু উপহার দিয়েছ,—শাস্তি, ফাঁসি ও গুলি,
অরাজক, মারী, মন্বন্তরে মাথার খুলি।
তোমার যোগ্য প্রতিনিধি দেশে গড়েছে শ্মশান,
নেড়েছে পর্ণকুটির, কেড়েছে ইজ্জত, মান!
এতদিন বহু আঘাত হেনেছ, পেয়ে গেছ পার,
ভুলিনি আমরা, শুরু হোক শেষ হিসাবটা তার
ধর্মতলাকে ভুলিনি আমরা, চট্টগ্রাম
সর্বদা মনে অঙ্কুশ হানে নেই বিশ্রাম। (চরমপত্র)

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আক্রমণ চালানোর জন্য তখন সত্যি সত্যি বেপরোয়া মনোভাব গড়ে উঠেছিল, ইংরেজ সরকারও তখন খুব প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল তবু আমাদের দেশে সার্বিক বিপ্লব হলো না। কারণ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব। ইংরেজ সরকার

সুকৌশলে ক্যাবিনেট মিশন-এর প্রস্তাব করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিল এবং 'রুটি' র ভাগ নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ নেতাদের মধ্যে যখন তীব্র বাদানুবাদ চলছিল তখন হঠাৎ 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' লাগিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিটাকে বিষিয়ে দিয়েছিল। তখন—

এ শহর আতঙ্ক ছড়ায়।
সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো,
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে
চুপ করে সভয়ে নির্জনে।
মাঝে মাঝে শব্দ হয় ঃ
মিলিটারি লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদম্ভ আক্রোশে। (সেপ্টেম্বর- '৪৬)

যে মিলিটারি দুমাস আগে বিপ্লবী জনতার মেজাজ দেখে সন্ত্রস্ত হয়েছিল তারাই এখন শহর কাঁপিয়ে শত্রুপক্ষের চক্রান্তের বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। তা দেখে কবি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু বিপ্লবী জনতার ওপর তিনি বিশ্বাস হাবান নি। কারণ লেনিনবাদের শিক্ষায় তিনি জানেন, লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন নির্ধারিত পথে অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শক্তিশালী শত্রু মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসুবিধা জনক হযে পড়ে তখন সব দিক বিবেচনা করে অগ্রগামীদের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য পিছু হটা একান্ত দরকার। লেনিন বলেছেন বিপ্লবী পার্টিকে দুটোই সঠিকভাবে শিখতে হবে। সুকান্তের কবিতায় সেই শিক্ষারই সুন্দর পরিচয় আছে ঃ

পিছনে রয়েছে একটি বছর, একটি পুরনো সাল,
ধর্মঘট আর চরম আঘাতে উদ্দাম, উত্তাল ;
বার বার জিতে, জানি অবশেষে একবার গেছি হেরে—
বিদেশী! তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।
শোন রে বিদেশী, শোন্,
আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ!
আমরা সবাই অসভ্য, বুনো—
বৃথা রক্তের শোধ নেব দুনো
একপা পিছিয়ে দু'পা এগোনোর
আমরা করেছি পণ,
ঠেকে শিখলাম—
তাই তুলে ধরি দুর্জয় গর্জন। (একুশে নভেম্বর ঃ ১৯৪৬)

তিনি জানেন নানা আঘাত প্রতিঘাত এলেও শেষ পর্যন্ত সর্বহারার জয় অনিবার্য। সেই

প্রত্যয়ে তিনি জানেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যত কৌশলই করুক না কেন তাদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। সেজন্য কবিকণ্ঠে শুনি, "লড়ে মরি তাই আমরা অমর, আমরাই অক্ষয়।" এখানেও দিন বদলের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তারই পালাকার। কলকাতার বুকে যখন ধিকি ধিকি সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলছিল তখন গ্রাম বাংলায় নতুন করে জ্বলে উঠেছিল 'তেভাগা'র আগুন। হিন্দু মুসলমান কৃষক সেখানে একসঙ্গে লড়াই করেছে জমিদার আর ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। কাকদ্বীপ বুধাখালির লড়াই তিনি হয়তো দেখে যেতে পারেননি। শোনেননি বীরাঙ্গনা কৃষক রমণী অহল্যা শোষণমুক্ত নতুন ভারত গড়ার জন্য প্রাণ দান করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন, "হয় ধান নয় প্রাণ", এ শব্দে ঃ

সারাদেশ দিশেহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা । (দুর্মর)

তাই কবি ঘোষণা করেন, "আজকের দিন নয় কাব্যের"। শঙ্কাহীন পরিণতি আর উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্র আঁকতে হবে কঠোর কঠিন গদ্যে। কবি সুকান্ত চারের দশকের বিপ্লবী জনতার চারণ কবি। বিপ্লবের ক্রিয়া যেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ তেমনি সুকান্তের কাব্য-ভাষাও প্রত্যক্ষ এবং মর্মভেদী। সুকান্ত নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করে গেলেন কাব্য-সাহিত্যে নতুন যুগের স্রষ্টার পুরষ্কার মৃত্যু। সুকান্তের নিজের ভাষায় "জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম। ...এই আমার আজকের সান্ত্বনা।" (বন্ধু অরুণাচলকে লেখা চিঠি) এতখানি আত্মপ্রত্যয় আছে বলেই কবির নিজের ঠিকানার সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া রুশ ও চীনের কাছে। (ঠিকানা)

অর্থাৎ যে সব দেশে সর্বহারার নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা হতে যাচ্ছিল কবি তাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছেন। কারণ তিনি জানেন, "বুর্জোয়া সমাজের দাসত্বকে বহির্দৃষ্টিতে মনে হয় সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা। কারণ, মনে হয় ইহা যাহা দিতেছে তাহা পরনির্ভরতা হইতে ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু এইখানে সম্পত্তি, শিল্প (Industry), ধর্ম প্রভৃতি যাহা কিছুর সহিতই তাহার জীবনের যোগ নাই তাহারই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাকে সে নিজের স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করে।" (মার্কস ঃ Holy Family) সেজন্য সুকান্ত নিজেকে কোন স্বাধীনচেতা কবি বলে মনে করেননি। তিনি মনে করতেন সমাজে বাস করে বেশির ভাগ মানুষের দায়িত্ব তাকে নিতেই হবে। কবি হিসেবে তিনি যে জাতির অন্তর্লোকের অধিনায়ক। সমাজের দায় তাকে বহন করতেই হবে। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যেখানে বঞ্চিত, অবহেলিত সেখানে তাদের জীবনবোধ, জীবনযন্ত্রণা ও প্রতিবাদের ভাষাকে তিনিই কাব্যরূপ দান করে তাদের নিয়ে যাবেন শোষণমুক্ত এক সুন্দর পৃথিবীর দিকে। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড ভিন্নপথ গ্রহণ করেছে। সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেখানে চলেছে প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব।

সুকান্ত যেন রম্যাঁ রলাঁর মত বলতে চেয়েছেন, "আমার সকল কাজ সকল ক্ষেত্রেই

চিরদিনই গতিপন্থী। যাহারা থামিয়া নাই, চিরদিন আমি তাহাদের জন্যই লিখিয়াছি। আমি নিজে কোনো দিন থামি নাই ; আশা করি যতদিন বাঁচিব থামিব না। জীবন যদি সম্মুখপানে চিরচলমান না হয়, তবে আমার কাছে জীবন অর্থহীন। তাই যে-সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহামানবের সমুদ্র পানে, আমি আছি তাহাদের সাথে। সঙঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণের এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘের সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য উত্তাল তরঙ্গ তাহাদের বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভবিতব্যই আমার ভবিতব্য।

'কাদের জন্য লিখি।' অভিযাত্রী সেনাবাহিনী যাহারা অগ্রগামী দল এমন এক বিপুল আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যাহারা শুরু করিয়াছে যাহা সফল হইলে শ্রেণী ও সীমান্তের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া এক মহামানব সমাজের সৃষ্টি হইবে, আমি লিখি তাহাদেরই জন্য। আজ কমিউনিজম্ সমাজ সংগ্রামের এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান যাহা আপোস জানে না, গোপনতা জানে না, যাহা এক সুচিন্তিত, নির্ভীক যুক্তিবাদকে সম্বল করিয়া সু-উচ্চ পর্বতভূমি অধিকার করিতে চলিয়াছে।" সেই কমিউনিজমের প্রতি অজ্ঞ থেকে যথার্থ জনগণের সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়।

সুকান্ত তাই কমিউনিস্ট। তাঁর লেখনীতেও তাই কোন আপোষ নেই, গোপনতা নেই। শব্দের কুহকজাল সৃষ্টি তিনি করেননি। লক্ষ্য তাঁর স্থির এবং সেই দুর্গম পথ রক্তাক্ত। 'জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু', চট্টগ্রাম 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' খ্যাত জালালাবাদের পথ ধরে, শহীদ রামেশ্বরের রক্তে রাঙা ধর্মতলা পার হয়ে সেই পথ সুকান্তের মৃত্যুর পরেও এগিয়ে চলেছে শ্রমজীবী সাধারণের নেতৃত্বে এক 'মহামানবসমাজ' গঠনের পথে। কবি সুকান্তের ঠিকানা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে সেই পথের মধ্যে। এমন দৃপ্ত ভঙ্গিমায় অত্যন্ত সহজ সরল করে সংগ্রামী মানুষের মনের ভাষাকে মুখর করতে পেরেছেন বলেই সুকান্ত এত জনপ্রিয় কবি। তাঁর সমাজচেতনা শ্রেণী চেতনার ক্রমাগ্রগতির মধ্যেই ক্রমবর্ধমান।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা কাব্য-ধারায় সুকান্ত

রবীন্দ্র জীবনের শেষ দুই দশকেই বাংলা কাব্য-ধারায় যে নতুন কবিতার সৃষ্টি হলো তারই নাম আধুনিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনই ববাবর সিধে চলে না। যখন বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হয় মডাবণ্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" (আধুনিক কাব্য : সাহিত্যেব পথে)। এই মর্জি কিন্তু যুগ-ভাবধারারই মনোভঙ্গি বিশেষ আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "...এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পাবে বিদ্রোহের, প্রতিবাদেব কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"

আসলে 'আধুনিক' শব্দটাই আপেক্ষিক। প্রত্যক যুগেই নতুন কবিকে পুরনো ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের পথ সন্ধান করে নিতে হয়, নতুন ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হয়। এটা কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব নয়। নদীর চলার পথে বাঁকের মত সমাজ জীবনেও নানা বাঁক দেখা যায়। সমাজ অর্থনৈতিক কারণে এই গতিবদলেরই সঙ্গে যুগ বদল হয়। নতুন নতুন কবিরা এই যুগধারাকেই তাদের ভাষায় ছন্দে রূপ দান করে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। তেমনি আবার একই কবির জীবিত কালেও এই যুগ প্রভাবে তার কাব্য ধারারও পরিবর্তন দেখা যায়।

সেজন্য বাংলা আধুনিক কবিতার সংকলন করতে গিয়ে কট্টর আধুনিকদের ও (যারা রবীন্দ্র বিরোধিতাকেই আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন) রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়েই শুরু করতে দেখা যায়। ভূমিকায় তাই বলেন, "রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই।" (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা) আসলে কবিতে কবিতে যুগ বদল হয় না। যুগের বদলেই কবির মনোভঙ্গি বদলে গেলে কবিতার ভাষা ও আঙ্গিক বদলে যেতে বাধ্য।

"উনবিংশ শতাব্দীর নিরুদ্বেগ জীবন, আত্মতৃপ্তি, ন্যায়-নীতিতে আস্থা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের পায়ে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) এসে প্রবল ঝাঁকুনি খেল। যা-কিছু পুরনো—ন্যায়, নীতি, বিশ্বাস, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্ক সব-কিছুর ওপর প্রথমত সন্দেহ জন্মাল। সন্দেহ থেকে

অবিশ্বাস, তারপর অবিশ্বাসই বিদ্বেষে পরিণত হোলো। পুরনো সত্যগুলিকে মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন করে যাচাই করে নিতে চাইল। ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক, নীলস বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ নব্যবিজ্ঞানী, ফ্রেজার, মর্গান প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ, ফ্রয়েড, এডলার, ইয়ুং প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিক এবং মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের আবিষ্কার মানুষের পরিচিত জগৎকে বদলে দিল।" (আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা—বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়) এই পরিবর্তনের কথা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে আমাদের দেশে তেমন বিপর্যয়ের সৃষ্টি না হলেও তার দায়ভাগ আমাদের কম নিতে হয়নি। আন্তর্জাতিক চেতনার ধাক্কা আজকাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে কোন সীমান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমাদের দেশেও পড়েছিল। তা ছাড়া আমাদের আধুনিক সাহিত্য অনেকদিন থেকে ইংরেজী সাহিত্যের অনুসরণে গড়ে উঠেছিল। সেজন্য আধুনিকতার ধাক্কা আমাদের জীবনের চেয়ে মনে আসে অনেক আগে। সেজন্য বাঙালী কবির ভাবনায় টি. এস. এলিয়ট, বা উইলফ্রেড আওয়েন সহজেই প্রবেশ করে। তিনিও অনুভব করেন, "ঝন ঝন করে সৃষ্টিসুদ্ধ ভাঙছে।"

এই ঝড়ের হাওয়া প্রথম লাগল রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'য়। প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। য়ুরোপের দম্ভ ও লোভের ফলে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ঝড় দেখা দিয়েছিল তাতে ধনবাদী সভ্যতার অনেক বড় বড় আদর্শ, বড় বড় কথা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, দুঃখের মন্থনে জীর্ণ প্রাচীনতা থেকে নবীনের সাধনা উঠে আসবে। ঝড় সমস্ত কিছু আবর্জনা পঙ্কিলতা ধ্বংস করে নবসৃষ্টির সূচনা করে দেয়। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় আছে তারই বার্তা। সেখানে আগামী দিনের সম্ভাবনায় 'রাত্রির তপস্যা'র কথা আমরা শুনেছি। তারপর বিবর্তনের পথে কবি-স্বভাবের ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তন কেবল ভাবে বা বিষয়ে নয়, "গদ্যরীতির প্রচলন করে, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন করে, কবিকুল পরিত্যক্ত 'অসুন্দর' প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশকে গ্রহণ করে, তিনি নিজেই ঐতিহ্য নিজের ভেঙেছেন।" তবু আশি বছরে কবি নিজের সালতামামি করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।

তিনি জানেন, তাঁর কাব্য-সাধনা বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হয়নি। মাটির কাছাকাছি যে শ্রমিক কৃষক রয়েছে তিনি তাদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেননি। তাই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ঃ

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন।
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।"

সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের চারিপাশে যে সকল কবি ছিলেন তারা রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্র-অনুসারী সেই কবিদের মধ্যে যিনি কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর স্বতন্ত্রতা ছিল ছন্দেব বিশিষ্টতায়, ধ্বনি বৈচিত্র্যে, লালিত্যে এবং ভাষার ক্ষেত্রে মৌখিক শব্দ ও জড় ইত্যাদির ব্যবহারে। তা ছাড়া তিনিই হলেন সে-যুগের সাধারণ বাঙালীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের তুলনায়ও তিনি ছিলেন অধিকতর জনপ্রিয়। তাঁর উজ্জ্বল কবিকীর্তি একসময় বাঙালী পাঠককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। বিচিত্র রূপ, রঙ, সংগীত মাধুর্য এবং বিস্ময়কর ছন্দ নির্মাণ কৌশলের ব্যবহারে তিনি পাঠককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে তুলতেন। তিনি অপার বিস্ময় এবং কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে জগৎ-সংসারকে অনুভব করতেন এবং পাঠকের সামনে তার বর্ণনীয় বিষয়ের এক রহস্যময় মায়ালোকের সৃষ্টি করতেন। ইতিহাসচারিতা এবং নিসর্গময়তার এমন মেলবন্ধন অন্যত্র দুর্লভ। তার ওপরে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের বাঙালীপ্রাণতা।

সত্যেন্দ্রনাথকে যা সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল তা হোল তৎকালীন সাধারণ মানুষের অকথ্য দুরবস্থা। দুঃখভোগীর মতই সহানুভূতি দিয়ে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রযুগে আমরা পেলাম এক নতুন সুর, মেহনতী মানুষের জয়গান। দূর থেকে করুণা প্রদর্শন নয়। তাঁর লেখনীর মধ্যে তারাই যেন ভাষা পেল। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য,
অর্থপিশাচ হৃদয়হীন
করছে পেষণ, করছে পীড়ন
করছে শোষণ রাত্রি দিন।

রাজা-কারিগর, ধর্মঘট, মৃত্যু-স্বয়ম্ভর, বঙ্গ-জননী, নব-জীবনের গান, জাতির পাঁতি প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবিতায় আধুনিক কাব্যধারায় কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ– (ক) নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা, (খ) শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, (গ) সাম্যের প্রতি আস্থা, (ঘ) পরলোক, পাপপুণ্য, প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় ও বিরুদ্ধ মনোভাব, (ঙ) নাগরিক সভ্যতার কুশ্রীতা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে বাংলা কাব্যে যে ঋতুবদল দেখা দিল, তার অধিনায়ক তিনজন — মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী-নজরুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে মোহিতলাল আর-সকলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সচেতন শিল্পী, যতীন্দ্রনাথ বেশি আধুনিক ও নজরুল বেশি উদ্দাম ও উচ্চকণ্ঠ।" কল্লোল-কালিকলমের যুগে মোহিতলাল ছিলেন বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারাহিত্যে আধুনিকতার পুরোধা। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তী অনেক কবি নতুন পথে পা বাড়াতে সাহস পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জীবন-রসিক। তিনি তাঁর কাব্যে ভোগ বাসনার এক বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করেছেন। সম্ভোগ-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জীবনকে সৎ ও সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে হবে এটাই মোহিতলালের জীবনদর্শনের মূল তত্ত্ব। কিন্তু মোহিতলালের বিদ্রোহ দেহজ কামনা এবং

তান্ত্রিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত শব্দের মন্ত্রমুখরতা, ছন্দে ঢেউ-এর মতো দীর্ঘ বিলম্বিত লয় আমাদের মুগ্ধ করলেও মোহিতলাল ব্যাপকভাবে জীবনকে নাড়া দিতে পারেননি। সেজন্য তার প্রচণ্ড বুদ্ধিবাদ এবং ভোগবাদ দীর্ঘকাল বাংলা কাব্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে তাঁর বিদ্রোহ শব্দের ঝঙ্কারেই সীমিত হয়ে রইল।

এলিয়টের 'Waste Land' এর মতো যতীন্দ্রনাথের কাছেও জীবন ছিল মরুভূমির মত উষর। এ বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'মোহিতলালের মতো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাদের আরাধনায় ছিলেন— ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব পরীক্ষা। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম। তাই নৈরাশ্যের দিনে ক্ষণে ক্ষণে আবৃত্তি করতাম 'মরীচিকা।'' (কল্লোল-যুগ) অদৃষ্টতাড়িত মানবজীবনে অসহায় মানবাত্মার আর্তক্রন্দনই তাঁর কাব্যের বিশিষ্ট সুর। জীবননাট্যের লীলায় বেদনার স্মৃতিটুকুকেই তিনি চরম সত্য বলে জ্ঞান করেছেন। দুঃখবাদী হলেও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল চির-বিদ্রোহী মানবতার জয়গান। তাই তিনি লিখেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।" "নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়।"

"যতীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে একটি নতুন স্বাদ নিয়ে এলেন। সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা কাব্যের বিষয়বস্তু হোলো। কবিতার আঙ্গিকেও নতুনত্ব দেখা দিল। সাধারণ জীবন থেকেই উপমা ও অন্যান্য অলংকারগুলি গৃহীত হোলো। কাব্যের ভাষার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার সংযোগ ঘটলো। তৎসম শব্দের পাশাপাশি মৌলিক শব্দের ব্যবহার ভাষার মধ্যে তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা এনে দিল। যতীন্দ্রনাথ নতুন ধরনের অন্ত্যানুপ্রাসও ব্যবহার করলেন। "The more important poets are those who free themselves from the restraints of 'poetic diction' and bring poetry back into relation with living speech." (Reading and Discrimination : Denys Thompson) প্রচলিত কাব্যিক ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে কবিতাকে প্রাত্যহিক জীবনের জীবন্ত ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন বলেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একজন বিশিষ্ট কবি।" কিন্তু কেবল মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন বলে তাঁর কাব্য জুড়ে আছে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপী একটা অসম্পূর্ণতা, একটা ব্যর্থতা ও নিদারুণ নশ্বরতা।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের পর বিদ্রোহী কবি বলে কাজী নজরুলের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় যেমন প্রবল শক্তি উন্মাদনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, বাংলা কাব্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবও তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যে যৌবনের জয়গান গাইলেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে যে যৌবনের উত্তাপ দেখা দিয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম তারই "অগ্নিবীণা" হাতে নিয়ে বাংলা কাব্যের আসরে 'বিদ্রোহী' রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর এক হাতে ছিল বাঁকা বাঁশরী আর হাতে ছিল রণতূর্য। নজরুল উদ্ধত যৌবনের জয়গান গাইলেন। আত্মপরিচয়ে তিনি বললেন, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ" অথবা "আমি

বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন/আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।" তিনি দেখেছেন এই ফুলে ফলে ভরা সুন্দর পৃথিবীতে কেবল শোষণ ও উৎপীড়ন। মানুষের সমাজের দিকে তাকিয়ে কবি দেখেছেন ঃ

যারা যত বড় ডাকাত দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙেঘতে আজ।
(চোর-ডাকাত ঃ সর্বহারা)

"দিকে দিকে আজ অর্থপিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।" তাই বিদ্রোহী কবি শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষ থেকে তিনি 'ফরিয়াদ' পেশ করেন। অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে কবি আপোসহীন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন ঃ

মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত। (বিদ্রোহী)

অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, ফণিমনসা, সর্বহারা, সাম্যবাদ প্রভৃতি কাব্যে তিনি উদ্ধত অবিচার-অত্যাচারপীড়িত মানুষের পুঞ্জীভূত হৃদয়বেদনাকেই বাণীবদ্ধ করেছেন।

নজরুল সাম্যবাদে অনুপ্রাণিত ছিলেন, সর্বহারা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ করেন, পরাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে শিকল ভাঙার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তবু নজরুলের বিদ্রোহ মার্কসবাদী-প্রেরণাসঞ্জাত ছিল না, ছিল মানবদরদী কবি প্রাণের প্রচণ্ড আবেগসঞ্জাত! সেজন্য এ বিদ্রোহ কবি প্রাণের স্থায়ীভাব হোল না, তিরিশ সালের পরে নজরুলের কবিতা ভিন্ন ধর্মী হয়ে পড়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে ভারতবর্ষের অসহযোগ আন্দোলনে দেশব্যাপী যে জনজাগরণ ঘটে নজরুল তারই চারণ কবি। মনুষ্যত্বের পূজারী কবি মানুষের বেদনায় ব্যথিত হয়ে বৈষম্যপীড়িত সমাজে সাম্যবাদের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু সেই সাম্যবাদ আনবার জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন তাঁর কথা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। তাঁর কাব্যে মহান স্বপ্নের জয়গান আছে কিন্তু সেই স্বপ্নসিদ্ধির পথনির্দেশ নেই। তবু ভাবীকালের সমাজ-সচেতন, শ্রেণী সচেতন কাব্যসৃষ্টির তিনি পূর্বসূচনা করে গিয়েছেন।

"মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল আধুনিক কবিতার প্রস্তুতি-পর্বের কবি। পরবর্তী আধুনিক কবিতা মোহিতলালের কাছে থেকে নিয়েছে নির্ভীক দেহবাদ, যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংশয়সংকুল নেতিবাদ, আর নজরুলের কাছ থেকে উদ্ধত যৌবনের উন্মাদনার মন্ত্র। সমগ্রভাবে এই তিনজন কবির কাছ থেকে পরবর্তী যুগ নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলিকে গ্রহণ করেছে— (ক) ঈশ্বরে অবিশ্বাস, (খ) ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের প্রাধান্য, (গ) নিপীড়িত

মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা, (ঘ) শোষণের প্রতিবাদ, (ঙ) নেতিবাদ, (চ) দেহ-নির্ভর প্রেম, (ছ) কৌৎসিত্যবোধ (জ) অমঙ্গলবোধ, (ঝ) বাস্তবতাবোধ, (ভাববাদী সত্যের তুলনায় বাস্তব সত্যেব প্রাধান্য) এবং (ঞ) সব মিলিয়ে একটি বিদ্রোহের মনোভঙ্গি।" (আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা)।

নজরুলের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্র ওয়াল্ট হুইটম্যানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ পবিসর থেকে সরে এসে একেবারে কুলি মজুরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বললেন ঃ

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের। (প্রথমা)

সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহানুভূতি আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কল্লোল, সংহতি, কালিকলম পত্রিকার গল্পে কবিতায় তারই প্রকাশ দেখা গেল। কল্লোলের সহযোগী 'কালি-কলম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯২৬ সালে এই পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর তার প্রথম কাব্যগ্রন্থেই (১৯৩২) কবি বেনামী বন্দরের হতভাগা নির্বাসিতদের প্রতি একদিকে যেমন গভীর সহানুভূতি জানালেন অন্যদিকে কামার-কুমোর-মজুরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করলেন। হুইটম্যানের মত (...not for us tame enjoyment) প্রেমেন্দ্রেরও ঘোষণা 'বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই, সময় যে হায় নাই।' মধ্যবিত্ত জীবনকে অস্বীকারের ঘোষণা আছে, এলিয়টের মতো তাঁর কাব্যেও যুগের হতাশা আর বেদনার কথা আছে। এক কথায়, নতুন যুগের সংশয়-সন্দেহ, জীবনের প্রতিপদে জিজ্ঞাসা-যুক্তির দাবী বিদ্রোহ-বিক্ষোভ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়ও স্পষ্ট ও অকপট। তিনি জীবনে কোথাও যেন সংগতি খুঁজে পাননি। তাই তিনি লরেন্সের মতো আফ্রিকার আদিম জীবনে বলিষ্ঠ জীবনবোধের সন্ধান পান। তিনি "সমাজ চেতনা ও ব্যক্তি চেতনার সমন্বয় এবং আত্ম-সমীক্ষার পথে ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ ও বৃহত্তর ব্যাপ্তির মধ্যেই এ যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার নিরলস চেষ্টা করেছেন।" যা বাস্তব জীবনে কখনো সম্ভব নয়। ইতর জনতার কবি হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা কাব্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে ব্যক্তি চেতনার মধ্যেও তিনি এই সমাজ চেতনাকে বহন করে এসেছেন তবু ইতর জনতার প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রাম, তাদের সুখ দুঃখ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়নি।

বুদ্ধদেব বসু একান্তভাবেই ব্যক্তি জীবনের কবি। তাঁর একান্ত কামনা মুক্তি। সমস্ত বন্ধন হতে মুক্তি, রূপেব বন্ধন, যৌবনের বন্ধন, বাসনার বন্ধন, ক্ষোভের বন্ধন ও প্রেমের বন্ধন। তাই তিনি গেয়েছেন 'বন্দীর বন্দনা'। এ কাব্যে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই বিজয় ঘোষণা। তাঁর কবিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব হোল "দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব, আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব. প্রবৃত্তি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এই সংঘর্ষের প্রকাশ ও সমন্বয়ের প্রয়াস তাঁর কবিতায় বিচিত্র স্বাদ এনেছে।" 'বন্দীর বন্দনা'-র যুগে কবির যৌবনকে অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল। যৌন-আকাঙ্খাকে তিনি অস্বীকার

করতে পারেননি, কিন্তু স্বীকার করতে গিয়ে তার জন্য গ্লানিবোধ করেছেন। 'কঙ্কাবতী' ও 'নতুন পাতা'-র যুগে তিনি যৌন-চেতনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলে 'অশ্লীল লেখক' বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্তও বুদ্ধদেব ছিলেন আত্মসর্বস্ব, স্মৃতিচারী এবং অবচেতনার কবি।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথের পরেও যে নতুন কথা নতুন ভাবে বলা যায় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখালেন জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের কবিতার মধ্যেও আছে অসহায় মানুষের মুখ থুবড়ে পড়ার তীব্র বেদনা। "যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা জীবনানন্দের কবিতায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মাধুর্য অথবা লালিত্য নেই, আছে একটি অস্থির হৃদয়ের যন্ত্রণাবোধ. যা বিষ-মাখানো তীরের ফলার মতো পাঠকের বুকে এসে বিঁধে যায়, কোনো একদিন হয়ত ক্ষত সেরে যায়, কিন্তু সারা জীবনের জন্য অস্থির অস্বস্তি চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।" তাছাড়া রবীন্দ্র যুগেই তিনি এক নতুন ভাষা ও ভাব সৃষ্টিতে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। সেজন্য আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র জীবনানন্দ দাশই নিজের একটি জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সে জগৎ অনুভূতির আলোছায়ায় তৈরি চেতনার জগৎ। সেখানে ছায়ারই প্রাধান্য। নিরাশায় ম্রিয়মান। তাঁর কাব্যে সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতার প্রভাব বিদ্যমান। "কবিতা মানব মনের চৈতন্যের ফসল। অবচেতন মন মানব-অভিজ্ঞতার অনেক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার সন্দেহ নেই, অবচেতনের ঐশ্বর্যময় উপাদান কবিতাকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কবিতা একটি শিল্পসৃষ্টি যার পিছনে চেতনার সক্রিয়তার প্রয়োজন আবশ্যক। আধুনিক ইংরেজ কবিরা ফরাসী সুররিয়ালিস্ট কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা একটা রফা করেছেন। তাঁরা এটুকু মেনে নিয়েছেন যে তাঁদের মনে যে সমস্ত চিত্রকল্প আপনাআপনি ভেসে ওঠে, তাদের বোঝার কোনোরকম সজ্ঞান চেষ্টা না করেই কবিতায় তাদের ব্যবহার করবেন ; কবিতার কাঠামোকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না করে চিত্রকল্পের উপরই ছেড়ে দেবেন-- একটি চিত্রকল্প অন্য একটি চিকল্পের আভাস এনে দেবে ; তারপর সমস্ত চিত্রকল্পগুলি মিলে একটি অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলবে। কিন্তু ফরাসী কবিরা যেমন নির্বাচনের ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন, ইংরেজ কবিরা তা নন। মনে যে সমস্ত চিত্রকল্প ভেসে ওঠে, তাদের মধ্যে যেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাদের তাঁরা বাদ দেবার পক্ষপাতী-- এক কথায় তাঁরা চেতনস্তরের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছেন। ইংরেজ কবিদের মতো জীবনানন্দের সুররিয়ালিস্ট কবিতাতেও সক্রিয় চেতনার চিহ্ন বর্তমান।" সুররিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বহু ক্ষেত্রে জীবনানন্দ সহজবোধ্য কবি নন। সেজন্য আত্মনিবাসী কবির লেখনী দরদী চিত্তকে উন্মনা করে, কবিচিত্তে প্রেরণা জাগায়, প্রত্যয়ের আলোকে উজ্জ্বল ছবিগুলি আকর্ষণ করে, কিন্তু বিদগ্ধ রসিক ছাড়া সাধারণ মানুষের নিকট তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়নি। তিনি অতি সহজ সাধারণ উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যবহার করলেও অনুভবের রহস্যময়তায় সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পারেন নি।

জীবনানন্দের মত সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বাংলা কাব্যে নিজের একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তবে জীবনানন্দের মত তা অনুভূতির জগৎ নয়, চিন্তার জগৎ। "জীবনানন্দ অন্যমনস্ক ও আগোছালো, সুধীন্দ্রনাথ সকল সময় সতর্ক ও স্মার্ট।" তিনি বাংলা কবিতাকে

গদ্যের কাছাকাছি'এনে তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। এ কাজে তিনি সাধারণ মুখের ভাষার পরিবর্তে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের বেশি ব্যবহার করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অম্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।" দুরূহ শব্দ ব্যবহারের জন্য তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি নৈরাশ্যবাদী। প্রেম, ভগবান অথবা রাজনীতি কোথাও তিনি সান্ত্বনা পাননি।

পাউন্ড-এলিয়টের অনুসরণে কবিতা লিখতে বসে বিষ্ণু দেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মত নিজের কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সাম্যবাদের আদর্শ কবিকে গভীর অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ফলে তাঁর কবিতায় ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের পরিবর্তে প্রচণ্ড আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সাম্যবাদের আদর্শ গ্রহণ করে বিষ্ণু দে প্রেমের বলিষ্ঠ রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেছেন। ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য তিনি সাম্যবাদী সমাজের সুস্থ পরিবেশের কল্পনা করেছেন। সেজন্য তাঁর কবিতায় লেনিন স্টালিনের নামোল্লেখের অভাব নেই। তাঁর 'সন্দীপের চর' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকেই তিনি নিজেকে সাম্যবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।

সাম্যবাদ অবলম্বনে কবিতা লিখলেও তিনি কখনও সাম্যবাদী কবি হতে পারেননি। কারণ নুজনতার কাছে তাঁর কবিতার সহজ আবেদন একেবারেই নেই। তাঁর কবিতা জটিল, দুরূহ ও দুর্বোধ্য। সাম্যবাদী কবিতা প্রসঙ্গে G.S. Fraser বলেন, "Communist Poetry requires a use of the Symbolism of the great suffering masses : rather it does not require symbolism or allegory at all but a direct appeal to the masses, a direct praise of them, and a tone of practical exhortation, a direct description of their activities and sufferings And it must not be cryptical or allusive or obscure, it must make no cultural demands on the masses that would give them a sense of inferiority or weaken them in the struggle. (The Modern Writer And His World.) বিষ্ণু দে-র কবিতায় উদ্ধৃতি ও উল্লেখ এত বেশি যে জনসাধারণের কথা দূরে থাক, উচ্চশিক্ষিত মানুষের কাছেও তা অনেক সময় গোলকধাঁধার মতো ঠেকে। অবশ্য গীতিধর্মী প্রতীকী কবিতা-রচনায় তাঁর অনস্বীকার্য অবদান আছে।

চল্লিশের যুগে সাম্যবাদের আদর্শ আমাদের দেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কবিদের অনেকেই প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে সাম্যবাদের স্থির আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট প্রভাবের পর পর তিনটি পর্যায়ের উদাহরণ।

সমর সেনকে অনেকে চল্লিশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলে অভিহিত করেন। সে যুগের হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ ও আর্তি তাঁর কবিতায় বিস্ময়করভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে তিনি জীবনের দীনতা, কুশ্রীতা ও ক্লীবতার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তার থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সাম্যবাদের পথই উত্তরণের একমাত্র পথ। কিন্তু অনেক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মতোই তিনি স্বশ্রেণীকে অতিক্রম করতে পারেননি।

সমর সেন মধ্যবিত্ত সমাজের কবি। মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গেই তাঁব নির্ভেজাল সম্পর্ক। সেজন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-অকাঙ্খা, নিরাশা ও বেদনাই তাঁর কাব্যে মুখ্য স্থান লাভ করেছে। বিষ্ণু দে-র মতো তিনি কেবল সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যেই অবক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করেননি, তিনি দেখেছেন সমাজের প্রতি স্তরেই অবক্ষয়। সেজন্য সর্বজনীন অবক্ষয়ের চেতনাই তাঁর কবিতার মৌল আবেদন। সেখানে ভাঙনের, নৈরাশ্যের চিত্রই প্রধান, তাকে প্রতিরোধের, পরিবর্তনের সংগঠিত আয়োজনের, আশাবাদের চিত্র গৌণ। সাম্যবাদী কবি হিসেবে সেখানেই তাঁর ব্যর্থতা। তিনি দেখেছেন,

"শহরে, বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।" (ক্রান্তি)

এই অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য তাঁর যে ব্যাকুলতা সেখানে কবির মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিলাসই প্রদান হয়ে উঠেছে, জনতার আবেগ ভাষারূপ লাভ করেনি। যেমন ঃ

...আগামী কাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়,
শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
নতুন দিন আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে। (পঞ্চম বাহিনী)

তবে সবচেয়ে বড় কথা, সমর সেন বর্তমান সভ্যতার অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে মেনে নেননি, এর বিরুদ্ধে তাঁর অন্তর বারে বারে বিদ্রোহ করেছে। তাই এলিয়ট যেমন ফাঁপা সভ্যতার রূপ প্রকট করে তুলছেন, সমর সেনও তেমনই একই প্রেরণায় নাগরিক সভ্যতার নগ্নতাকে চাবুক মেরেছেন। তিনি জানতেন বিপ্লবের পথেই এর প্রতিকার আছে, তবে তাঁর সন্দেহ বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়ে। আর বিপ্লবের মধ্যেও তাঁর অস্থির চিত্ত শান্তি পাবে কি না এ সম্পর্কেও তিনি নিঃসংশয় ছিলেন না। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই সমর সেনের বড় দুর্বলতা। আর সেটাই তাঁর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই হয়ত তিনি তাঁর 'জন্মদিনে' কবিতায় যা বলেছিলেন তাকেই সত্য করে তুলেছেন। ঐ কবিতায় তিনি লিখেছেন, "যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে/বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে।" তিনিও অল্পদিনেই কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেছেন; তবু যুগ পরিস্থিতিতে কবিতার বক্তব্যের পরিবর্তনের জন্য তিনি যে নতুন কাব্য-ভাষা সৃষ্টি করেছেন তা সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেক কবিকেই প্রভাবিত করেছিল। তাঁর নতুন বাচন-ভঙ্গি, উপমা, চিত্রকল্প, বক্তব্য অনুযায়ী দৃঢ় ছন্দ-গঠন সেই যুগে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

সমর সেনের কাব্যসাধনার যেখানে শেষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যেন সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সমর সেনের মতো চিত্তে দোদুল্যমানতা নেই। সমাজের ভাঙনকে তিনি সম্পূর্ণভাবেই মেনে নিয়েছেন। তিনি তাতে খুশি। কিন্তু জীবনের তো অপর দিকও আছে। তাই দৃপ্তভঙ্গিতে তাঁর জিজ্ঞাসা। —"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?" (সকলের গান) তিনি স্থির জানেন সাম্যবাদের পথ ছাড়া অন্য পথ

নেই। তিনি তাই বলেন ঃ

কৃষক মজুর! তোমরা শরণ
জানি আজ নেই অন্য গতি,
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যক্ষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে। (কানামাছির গান)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দূর থেকে দাঁড়িয়ে কেবল কবিতা লেখেননি। রাজনৈতিক জীবনে সাম্যবাদী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন, "আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে।" (সুকান্ত-সমগ্রের ভূমিকা) রাজনীতি করতে এসে তিনি কারাবরণও করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে নজরুলের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। নজরুলের মতো তিনিও সাম্যবাদী প্রচারে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। 'পদাতিক' এর যুগে পুঁজিবাদের অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের অস্ত্র ধারণ করে নবযুগ আনতে তিনি বদ্ধপরিকর। শব্দের বলিষ্ঠ ঝঙ্কারে, ছন্দের দৃঢ় অথচ সাবলীল গতিতে, মিলের বিস্ময়কর প্রাচুর্যের স্ফূর্তিতে তিনি তখন একটি সজীব শক্তিশালী প্রত্যয়ের পরিচয় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পদাতিকের পরে আর তাঁর কবিতায় সেই শাণিত ধার নেই। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, রাজনীতি আর কবিতাকে তিন জীবনে মেলাতে পারেননি। সেজন্য তাঁর কবিতায়ও মধ্যবিত্ত সুলভ বুদ্ধিবাদেব ছাপ আছে, শোষিত জনসাধারণের জীবনসংগ্রামের জ্বালা তাঁর কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করে নি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন, "সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নানাগুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সংগতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।" সেজন্য কৃষক শ্রমিকের জীবনকে কাব্যে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব নিয়ে সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্য রচনা করলেও তাঁর সেই দায়িত্বপালন অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে।

সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিল কবিতা নিয়ে। "ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।" সুকান্তের জীবন ও তার বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যালোচনায় আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাংলা কবিতার একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। তা কেবল সাম্যবাদী কবি হিসেবে নয়। সুকান্তের পূর্বে অনেক সাম্যবাদী কবি ছিলেন। বিষ্ণু দে নিজেকে সাম্যবাদী কবি বলে পরিচয় দিয়েছেন, সমর সেন সাম্যবাদে আস্থাবান ছিলেন আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সাম্যবাদী দলের সক্রিয় কর্মী। তবু তারা 'জনতার কবি' হতে পারেননি। তাঁদের জীবনে রাজনীতি এবং কবিতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে তা নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই। চল্লিশের যুগে জাপানী বিমানের মুহুর্মুহু আক্রমণে, আগস্ট আন্দোলনের হটকারিতায়, পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিপর্যস্ত সমাজজীবনের কবি সুকান্ত আক্রান্ত শিল্পীদের

প্রতিরোধে, জাপানের হাত থেকে দেশকে প্রতিরক্ষায়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আর্ত মানুষের সেবায়, জনযুদ্ধের আন্দোলনে, যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার উত্তাল বিক্ষোভের সক্রিয় শরিক ছিলেন সুকান্ত। অতএব 'কী বলবো' এ নিয়ে তাঁর কাব্যে কোন সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল 'কেমন করে বলবো'। সে সমস্যাও সুকান্ত অতি সহজে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য যার স্থির, তার উপায় উদ্ভাবনে বেশি কালক্ষেপ হয় না। সুকান্ত তাঁর মেজ বৌদির কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।'' কমিউনিজম সম্পর্কে ক্রিস্টফার কডওয়েল লিখেছেন, ''Communism is not an ideal, it is the inevitable solution of the ripening contradictions in capitalism.'' (Illusion and Reality). পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্যবাদ। সে সম্পর্কে সুকান্ত ছিলেন খুবই সচেতন। তাঁর কাব্যে তিনি শ্রেণী সংঘাতকে স্পষ্ট করে রূপায়িত করেছেন। আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষের তখন আশু দাবী ছিল স্বাধীনতার। তখন চারিদিকে ছিল বিদ্রোহ আর বিপ্লব। সুকান্তের কাব্যে আছে তৎকালীন জীবন ও জীবন-সংগ্রামের দর্পণ। সেজন্য চল্লিশ দশকের যুগ-কবি বলতে সুকান্ত ভট্টাচার্যকেই বোঝায়। তাঁর কাব্যে চল্লিশের দশকের যন্ত্রণাবিদ্ধ জনতাই কাব্যের চিত্রকল্পরূপ লাভ করেছে। তিনি তাঁর কাব্যে জনতা থেকে নির্বাচিত উপমা রূপকেরই ব্যবহার নেই, সমগ্র জনতাই তাঁর কাব্যের উপকরণ হয়ে উঠেছে। তাদেব অনুভব, জীবন যন্ত্রণা, আবেগ কল্পনা সবই সুকান্তের কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁর কাব্য জনসাধারণের সংগ্রামের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তিনি যথার্থই লিখেছেন, ''বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।'' লেনিন যেমন শোষিত সর্বহারা শ্রেণীকে একটা নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন কাব্য অনুভবে সুকান্ত সেই জনতাকেই চিন্তা ও কল্পনার জগতে উত্তীর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন।

বিষয় অনুযায়ী সুকান্ত তার ভাষাকেও তৈরি করে নিয়েছিলেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের অতি-প্রত্যক্ষ ক্ষোভ-বেদনা আশা উদ্দীপনাকে প্রকাশ করার জন্য তিনি কোন বক্র-ভাষণের আশ্রয় নেননি। ছুরির আঘাত যেমন সহজ তেমন সহজ করে যাদের জন্য কথা, তারা যেমন করে বলতে চায় তেমন করেই তিনি লিখেছেন। মায়াকভস্কি লিখেছেন, ''When you write a poem for publication, bear in mind how the printed text is going to be taken, as a printed text. You must pay attention to the average abilities of the reader ; you must try in every possible way to bridge the gap between the way the reader takes the line and the form which the creater of the line wanted to give it.'' (On the art and craft of Writing.) সুকান্তও বলতেন, ''আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি— কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।'' (সুকান্ত সমগ্র) তবে সুকান্তর কবিতা কেবল পার্টি কর্মীদের জন্যেই লেখা নয়। ''যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল।'' এ কাজ

করতে গিয়ে সুকান্তকে বহু ক্ষেত্রে কবিতার শর্তকে লঙঘন করতে হয়েছে। তাঁর তখন

দু'চোখে সংহার-স্বপ্ন বুকে তীব্র ঘৃণা,
শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যেতে পারে কি না
রাইফেলের মুখে এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা। (রোমঃ ১৯৪৩)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম যে কাব্য-ভাষাকে জনসাধারণের কাছাকছি আনতে চেষ্টা করেছিলেন সুকান্ত তাকেই সার্থক রূপ দিয়ে জনতার ভাষা আর কাব্যরূপের দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন।

সুকান্ত আরেক অর্থেও নতুন যুগের প্রবর্তক। আধুনিক কবিতার সুদীর্ঘ পরিক্রমায় আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করবার একটা প্রবণতা। সুকান্ত-র মধ্যে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ভাবে বর্তমান। প্রাস্তিক-নবজাতক-জন্মদিনে সভ্যতার সংকটের রবীন্দ্রনাথ সুকান্তের মধ্য দিয়ে আবার আধুনিক কবিতায় যেন প্রতিষ্ঠিত হলেন। সুকান্তর কাব্য-ভাষাও রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অনুসারী। সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জনতার কবি হতে গিয়ে মানবপ্রেমিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রবীন্দ্র-সত্তাকে ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সে ইতিহাস কবিতা দিয়েই কবিতাকে অতিক্রমের ইতিহাস ঃ

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা--
কবিতা তোমায় দিলাম আজিকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। (হে মহাজীবন)

অনন্য কবিপ্রতিভায়, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে, আবেগের আন্তরিকতায়, বলিষ্ঠ ভাষা ও ছন্দের দৃপ্ত ভঙ্গিতে সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা কাব্যের ধারায় স্বতন্ত্র সিদ্ধি লাভ করেছেন।

বাংলা কাব্যে সুকান্তের অনন্যতা আলোচনা করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, ''সুকান্তর কবিতার সহজ ও সরলতা অনেককে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে, সেই সরলতার সমগ্র তাৎপর্য সকলের কাছে ধরা পড়েছিল কি না জানি না।

জীবনে যেমন, কাব্য সাহিত্যেও সরলতা বিশেষণটিতে রিক্ততার ইঙ্গিতটাই আমাদের কাছে বড় বেশি জোরালো। গভীরতা, ব্যাপ্তি, তীব্রতা, ভাবৈশ্বর্য ইত্যাদি সবকিছুর ধারক ও বাহক হিসাবে সাদা-মাটা স্পষ্টভাষী সার্থক কবিতা কল্পনা করতে আমরা অপটু ছিলাম। আমাদের অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতি গীতিকবিতা পর্যন্ত। সুকান্তর কবিতায় তাই বাংলা কাব্য সাহিত্যের নবজন্মের সূচনা ছিল।

রবীন্দ্রোত্তর বৈপ্লবিক ভাবধারাকে সমসাময়িক কবিরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি, নতুন চেতনা যাদের স্মৃতির প্রেরণা তাঁরাও খুঁজে পাননি আত্মপ্রকাশের পথ ও পদ্ধতি। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে পিছিয়ে পড়া কাব্যসাহিত্যের মন্থর গতি মিলিয়ে দেখলে, আন্তরিক পরীক্ষা গবেষণাদির সীমায় বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক কবিতার দৈন্য বিচার করলে আমরা এক শোচনীয় সিদ্ধান্তে আসি-- কিশোর কবি সুকান্তর' অকালমৃত্যু যার মর্মান্তিক বাস্তব পরিচয়। কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগকে প্রাণ দিতে আজ কবির যে অভিজ্ঞতা ও

সাধনা দরকার— তার পুরস্কার মৃত্যু, সুকান্ত এই ভয়ানক সত্য ও কাব্য সাহিত্যের সারল্যকে, আমাদের সমস্যাকে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে।" (কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ)

আধুনিক কবি ও সমালোচক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সুকান্তকে অভিহিত করেছেন নবজীবনের ঋত্বিক বলে। "তার কণ্ঠে গান নেই, আছে মন্ত্র। তার প্রেরণা ক্লাসিক। তার বাচনভঙ্গি ঋজু। তার প্রধান বাহন পদভূমক তালপ্রধান ছন্দ, সে ছন্দের আবেদন বাকস্পন্দনের। ভাষার ধ্বনি ঝঙ্কারের চেয়ে অর্থগৌরব তার কাছে বড়। সে রীতিগোত্রহীন. উদাত্ত কণ্ঠে নবজীবনের মন্ত্রোচারণ করে গেছে।' 'মহৎ কাব্যের ভাবনা' গ্রন্থে এবারক্রম্বি কাব্যের প্রাণভূত যে মন্ত্রশক্তির কথা বলেছেন, সুকান্তর কাব্যে আছে সে শক্তি : "I will call it, compendioously, 'incantation' : the power of using words so as to produce in us a sort of enchantment, and by that I mean a power not merely to charm and delight, but to kindle our minds into unusual vitality, exquisitely aware both of things and of the connextions to things. অর্থাৎ যে কাব্য শুধু ধ্বনি ঝঙ্কারে কেবল আবিষ্ট ও পুলকিতই করে না, আমাদের অন্তরকে অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত করে সেই কাব্যই মহৎ কাব্য। সুকান্ত সেই মহৎ কাব্যের কবি।

অষ্টম অধ্যায়
পত্রগুচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ

বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিব মধ্যে লেখকের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলোর সার্বিক বিচারেই লেখক-কৃতির সার্থকতা। তাব মধ্যে লেখক বিশেষের অনুভব, কল্পনা, রূপকল্পের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তার বাইরেও লেখকের একটি সত্তা আছে। সেখানে তিনি একান্ত নিজের, তার মধ্যে পাওয়া যায় তার ব্যক্তি ভাবনা, বিশেষ বিশেষ প্রবণতা, সংক্ষেপে তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলের খবর। লেখার মধ্যে, সাহিত্যকৃতির মধ্যে তিনি সর্বজনীন, সেখানে তিনি নিজেকে সকলের অনুভবের মধ্যে বিকশিত করে তোলেন, তাঁর নিজস্ব ঘরোয়া পরিচয় সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তি মনের খবরে, বন্ধু-বান্ধব, আপন পরিজনদের সঙ্গে একান্ত আলাপে। তার সার্থক প্রকাশ পাওয়া যায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে।

চিঠিপত্র যদিও ব্যক্তিগত সংবাদ আদান প্রদানের প্রকৃষ্ট মাধ্যম তবুও তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় লেখকের ব্যক্তিমনের নানা বিচিত্র খবর, তার বিচিত্র অনুভব, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সেখানে তিনি সাময়িকের জন্য হলেও নিজের গণ্ডীবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ব্যাপকতা লাভ করেন। সেই অনুভবই আবার বিচিত্ররূপে তাঁর সাহিত্য-সৃজনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সেজন্য কোন কবির কবিতা পড়ে আমরা যেমন বিস্ময়-মোহিত হই তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কবির সম্পর্কেও আরো বেশি আগ্রহী হযে পড়ি। তাঁর পুষ্পিত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপটাকে জেনে নিতে কৌতূহল জাগে।

অতএব পত্রগুচ্ছ আমাদের দু-ভাবে আকর্ষণ করে। এক, তার মধ্যে আমরা আমাদের প্রিয় লেখককে ঘরোয়া ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং দুই, বিশেষ বিশেষ ঘটনা তাঁর মনের প্রতিফলনে যে বিশেষত্ব লাভ করে তা আমাদের মনেও রঙ ধরিয়ে দেয়। এই দ্বিতীয় কারণে ব্যক্তিগত পত্রও সাহিত্য খ্যাতিলাভ করতে পারে। ব্যক্তি ভাবনা যখন নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করে সার্বিক হয়ে পড়ে, বিশেষ যখন নির্বিশেষ রূপ গ্রহণ করে মানবিক বোধের আবেদন সৃষ্টি করে তখনই তা সাহিত্য রূপ গ্রহণ করে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, চিত্রা, গল্পগুচ্ছ সৃজনধর্মিতায়, কাব্য ও গল্প রূপের সার্থকতায় আমাদের আনন্দ দান করে, কিন্তু ছিন্নপত্রের মধ্যে যখন রবীন্দ্রমানসে তার প্রাথমিক রূপ, প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, প্রাথমিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে জানতে পারি তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ রূপের, এক বিশেষ মানুষের, এক বিশেষ কবিসত্তার, এক দরদী বাঙালী মনের পরিচয় লাভ করে অভিভূত হই। সেজন্য 'ছিন্নপত্রে'র একটা বিশিষ্ট ভূমিকা, বিশেষ আবেদন যে আছে তা সর্বজনস্বীকৃত। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পত্রগুচ্ছকে ছিন্নপত্রের সঙ্গে তুলনা করছি না। তবু 'সুকান্ত সমগ্র' তে সুকান্তর এখন পর্যন্ত যে উনপঞ্চাশটি পত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা ব্যক্তি মানুষ সুকান্ত সম্পর্কে যেমন অনেক কথা জানতে পারি তেমনি কবি সুকান্তের নানা বিশেষ অনুভবকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এগুলো আমাদের ব্যক্তি সুকান্তকে এবং কবি সুকান্তকে উপলব্ধি করতে অনেক সহায়তা করে।

সুকান্তের প্রথম যে পত্রটি সংকলিত হয়েছে তাতে দেখা যায় সুকান্তের তখন বয়স পনের অতিক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে কিশোর মনের আবেগময়তার প্রকাশ থাকবে। নতুন রোমান্সের উত্তেজনা থাকবে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই কিশোর মনের নানা পরিচয়, নানা প্রবণতার কথাও প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। এই পত্রের মধ্যে দিয়েই সুকান্ত ভট্টাচার্যের কলকাতা শহরের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ, পরিবেশের গুরুত্ব, সমাজসচেতনতা, সাহিত্যানুরাগ, ভাষায় দক্ষতা এবং প্রকাশের ঋজুতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী পত্রগুচ্ছ সুকান্তের দ্রুত বিকশমান মনেরই সুন্দর অভিব্যক্তি।

কলকাতার সঙ্গে সুকান্তর আজন্ম নিবিড় পরিচয়। এখানকার জলহাওয়ায়, বিচিত্র ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তাঁর মন বিকশিত হয়েছে। সেজন্য চল্লিশের দশকে জাপানী আক্রমণে আতঙ্কিত মানুষ যখন প্রাণভয়ে তৎপর তখন তিনি এই দুর্যোগের মুখে কলকাতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তিত। ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পর্যবেক্ষণে গিয়ে পল্লী বাংলার রূপ দেখে বিচলিত বোধ করেছিলেন। তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুকান্তও কলকাতার জন্য বিচলিত!

"...আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন-- সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক-একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসরঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর...?

কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, একটা রহস্যময়ী নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকব না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি। সত্যি.. বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব।"

তিনমাস পরে লেখা আরেকটি চিঠিতে আছে কলকাতার প্রসঙ্গ। পটভূমি পূর্ববৎ। তার

মধ্যে ফুটে উঠেছে কলকাতার বিষণ্ণতা, একটা নতুন ভিন্ন পরিচয় ঃ "...কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, নাগরিকরা পলায়ন তৎপর। ...এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কত দ্রুত সবাই করছে প্রস্থান আর শহরটি হচ্ছে নির্জন। তবে এই নির্জনতা হবে উপভোগ্য— কারণ এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং এর নব্য পরিচয়ে আমরা একটা অচেনা কিছু দেখার সৌভাগ্যে সার্থক হব। আর কলকাতার ভীষণতার প্রয়োজন এই জন্যে যে, এত আগন্তুকের স্থান হয়েছিল এই কলকাতায়, তার ফলে কলকাতা কাদের তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন বিদেশী এলে সে বুঝতেই পারবে না, যতক্ষণ না তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে দেশটা কাদের। কারণ, যা ভীড়--তাতে মনে হয় দেশটা সকলের না হোক, শহরটা সর্বজনীন।

আজকাল রাত একটায় যদি কলকাতা ভ্রমণ কর তাহলে তোমার ভয়ঙ্কর সাহস আছে বলতে হবে। শুধু চোর গুণ্ডার নয়, কলকাতার পথে এখন রীতিমত ভূতের ভয়ও করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর কলকাতায় দেখা যায় গ্রাম্য বিষণ্ণতা। সেই আলোকময়ী নগরীকে আজকাল স্মরণ করা কঠিন ; যেমন একজন বৃদ্ধা বিধবাকে দেখলে মনে করা কঠিন তার দাম্পত্য-জীবন। আর বিবাহের পূর্বে বিবাহোন্মুখ বধূর মতো কলকাতার দেখা দিয়েছে প্রতীক্ষা —অন্য দেশের বিবাহিতা সখীর মতো দেখবে ঘটিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

আজ আমার ভাইয়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ— আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলাম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল, রোমাঞ্চকর, পরম মুহূর্তের সন্ধানে। তবু আমার ক্লান্তি আসছে, ক্লান্তি আসছে এই অহেতুক বিলম্বে।"

কিশোর মনে তখন এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি, এ্যাডভেঞ্চারের প্রবল আগ্রহ। সেজন্য সকলেই যখন প্রাণভয়ে কলকাতা ত্যাগের জন্য ব্যাকুল তখন কিশোর সুকান্তর মনের কথা, "আমার ভয় হয় পাছে কলকাতার ভয়ঙ্কর দিনগুলো হারিয়ে ফেলি।"

অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো এলো। পাঁচদিন কলকাতার বুকে জাপানী আক্রমণ ঘটলো। খিদিরপুরে, হাতীবাগানে, ড্যালহৌসি অঞ্চলে আক্রমণ হয়। কলকাতা আরও জনশূন্য হয়ে যায়। সুকান্ত তখন রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। ফলে এই পর পর আক্রমণে তাঁর মনে ভীরুতার পরিবর্তে এসেছে দৃঢ়তা। 'জাপানকে রুখতে হবে।' একদিনের জাপানী আক্রণের বর্ণনায় তার পরিচয় আছে ঃ

"...রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্তব্ধ। আর শুরু হয়ে গেল দাদার 'হায়', 'হায়', বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে-বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি, আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতে ছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহ মনে চমকে উঠি, এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিন ঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু

হয়নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত।"

মনে হয় এই ভয় না পাওয়ার মধ্যে আছে সুকান্তর বিশেষ এক রাজনৈতিক বিশ্বাস। যে বিশ্বাস প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের প্রেরণা দেয়, কোন ঘটনার সার্বিক পরিচয় জানিয়ে তার কার্যকারণকে স্পষ্ট করে তোলে। এই বিশ্বাসের জোরেই বয়সের অল্পতা সত্ত্বেও মানসিক অভূতপূর্ব দৃঢ়তা দেখা যায়।

জাপানী বোমার ভয়ঙ্কর দিনগুলোর পরে বহুদিন অতিক্রান্ত। যুদ্ধ ও মন্বন্তরে কলকাতা শহর ক্ষত-বিক্ষত। তবু তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আশা আর বিশ্বাস আছে বলে সেই দুর্যোগের দিনগুলো বিশ্বাসী মনে ভয়ঙ্কররূপে ফুটে উঠতে পারেনি। তারপর কলকাতার বুকে অনেক গৌরবজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। অবশেষে সেই কলকাতায় দেখা দিল পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুকান্ত তখন রাউডন ষ্ট্রীটে রেড-এড কিওর হোমে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। সেই সময় কলকাতা সম্পর্কে তাঁর মনে বিরূপতা দেখা দেয়। ৩/১০/৪৬ তারিখের এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "...শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মতো জায়গায় বেশ আছি। কিন্তু তবুও আমার শিকড় গজিয়ে উঠতে পারেনি, বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-সমৃদ্ধ হাতছানি সকাল সন্ধ্যায় ঝলক্ দিয়ে ওঠে তলোয়ারের মতো। এখন আছি বদ্ধ-দীঘির জগতে ; সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মাছের মতো, কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে। সকালের আশ্চর্য অদ্ভুত রোদ্দুর কোনো কোনো দিন সারাদিন ধরে কেবলই মন্ত্রণা দেয় বেরিয়ে পড়তে ; শহর-বন্দর ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলের সবুজে মুখ লুকোতে দেয় অযাচিত পরামর্শ। সত্যিই অসহ্য লাগে কলকাতাকে মনের এইসব মুহূর্তে।"

পত্রগুচ্ছের মধ্যে সুকান্তের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধিতা। মানব সভ্যতার শৈশবকালে অসহায়তাবোধের ফলে যে অলৌকিক বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে গড়ে উঠেছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আফিম হিসেবে তাকেই ব্যবহার করতে লাগল। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের জ্ঞান ও যুক্তিবোধকে কার্য-কারণের একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবু দেখা যায় বহুদিনের সংস্কারের ফলে বহু শিক্ষিত মানুষের মনেও এই ধর্মীয় সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

সুকান্তও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণাচল বসুর মধ্যে এই ধর্মীয় প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে বারে বারে আঘাত করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন। সেজন্য দেখা যায় তিনি তাঁর প্রথম চিঠিতেই শিরোদেশে ব্যবহার করেছেন 'শ্রীরুদ্রশরণম'। অবশ্য এই ব্যবহারের আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। কলকাতা তখন জাপানী আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত। সুকান্তের ভাষায় "আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।" এই ভয়াবহতার অভিব্যক্তির জন্যই চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী রুদ্রদেবতার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তবে এটা নিঃসন্দেহে ব্যাজস্তুতি।

তারপর সুকান্ত যখন শুনলেন তার বন্ধু সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন তখন তিনি তাকে কৌতুক ব্যঙ্গের সঙ্গে লিখেছিলেন "সৎসঙ্গশরণম। শ্রী শ্রী শ্রী ১০৮ অর্ণব-স্বামী গুরুজীমহারাজ সমীপেষু। শত শত সেলামপূর্বক নিবেদন,

"পরমারাধ্য বাবাজী, আপনার আকস্মিক অধঃপতনে আমি বড়ই মর্মাহত হইলাম। ইতিমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, তখন মানসপটে এই চিন্তাই সমুপস্থিত হইয়াছিল যে ইহা সাময়িক মত্ততা মাত্র; কিন্তু অধুনা উপলব্ধি করিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহাই অনুমিত হইতেছে যে কাহারও সুমন্ত্রণায় আপনি এই পথবর্তী হইয়াছেন। অতএব আমার জিজ্ঞাসা এই যে, বৃদ্ধ পিতা এবং অসুস্থা মাতার প্রতি ঐহিক কর্তব্যসকল পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া কোন নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চবমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ সাধনা করিতেছেন?"

এর মধ্যে আছে সূক্ষ্ম কৌতুক, ব্যঙ্গ এবং বন্ধুর প্রতি গভীর সহানুভূতির পরিচয়। অন্যদিকে আছে পাবলৌকিক চরমোন্নতির প্রতি একটি অবিশ্বাস।

তারপর, বন্ধু অরুণাচল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন গ্রামে ছিলেন তখন সেখানকার উৎসাহীদের নিয়ে 'ত্রিদিব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সুকান্তকেও বন্ধু হিসেবে তিনি ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই নামটা সুকান্তর মোটেই যে পছন্দ হয়নি তা তাঁর পত্রগুচ্ছ থেকে জানা যায়। সুকান্ত ৩.৩.৪৩ তারিখের পত্রে বন্ধুকে লিখেছিলেন, "তোদেব (থুড়ি) আমার 'ত্রিদিব' সম্বন্ধে একটা বড় সত্য অনুমান করছি যে, আমরা এই পাপ-দুঃখ-কষ্ট আকীর্ণ ধরণীর নগণ্য লোক কর্মদোষে 'ত্রিদিবে'র দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সঙ্গ লাভের পুণ্যে হয়তো পাপস্খলন হবে এবং তখন এক সংখ্যার দর্শনলাভও হবে।" পাপ দুঃখ কষ্ট আকীর্ণ মর্ত্য পৃথিবীর সঙ্গে যেহেতু স্বর্গের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই, ত্রিদিব নামের মধ্যেই পারলৌকিকতার ভাব বিদ্যমান সেজন্য সুকান্ত একে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। আরও দু-একটি পত্রে যেখানে 'ত্রিদিব' সম্পর্কে উল্লেখ আছে সেখানেই সুকান্ত বন্ধুকে একটু খোঁচা দেওয়ার প্রবণতা পরিত্যাগ করতে পারেননি।

ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সুকান্ত তাঁর মত ব্যক্ত করলেন কাশী গিয়ে। ১৯৪৪ সালে কাশী দর্শনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে লিখেছেন, "কাশীর আমি প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভাল লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধঘটনাজড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত observatory মানমন্দির। অবিশ্যি বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ।..."

"কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ছাত্র নিবাস মূলক' বিশ্ববিদ্যালয়। আর দেখলাম গান্ধীজি পরিকল্পিত ভারতমাতার মন্দির। দুটোতেই ভাল লাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও ধর্মের লেবেল আঁটা বলে বিশেষ ভাল লাগল না।" ধর্মের লেবেল আঁটার মধ্যে যে একটা পশ্চাদমুখী চিন্তা আছে, একটা প্রতিক্রিয়ার মতলব আছে সে কথা সুকান্ত সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে পত্রগুচ্ছ যেহেতু ব্যক্তিগত সংবাদ এবং আবেগ ও চিন্তার বিনিময় মাধ্যম সেজন্য এই পত্রগুলোর মধ্যে সুকান্তের ব্যক্তি প্রবণতার সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায়। এই পত্রগুলোর মধ্যে আছে তারুণ্যে স্বভাবসুলভ রোমান্টিক ভালোবাসার কথা, তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং তাঁর কাব্য প্রবণতার পরিচয়।

রোমান্টিক প্রণয়ের কথা আমরা জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। উপক্রমণিকা এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুকান্তের আবাল্য সঙ্গিনী এবং পরে বান্ধবী সম্পর্কে বয়ঃসন্ধির অনুরাগ বর্ণনায় তাঁর আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং সংযম অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। চার নম্বর চিঠিতে সুকান্ত লিখেছেন, "একত্রে আহার করতাম, পাশাপাশি শুয়ে বই পড়ে শোনাতাম ওকে, রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতাম। ঘুমের মধ্যে ওর হাতখানি আমার গায়ে এসে পড়ত, কিন্তু শিউরে উঠতাম না, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করতাম বুকের কাছে। তখনো ভালবাসা কি জানতাম না আর ওকে যে ভালবাসা যায় অন্যভাবে, এতো কল্পনাতীত। কোনো আবেগ ছিল না, ছিল না অনুভূতির লেশমাত্র।

শেষে একদিন, যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে, এমনি একদিন, দিনটার তারিখ জানি না, পাশাপাশি শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নব প্রভাতের পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়, অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুল। আর আমি যেন চোরের মতো অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে।" প্রথম যখন সান্নিধ্য হোল তখন সুকান্তর বয়স ১০ আর সঙ্গিনীর ৯ এবং যখন ভালোবাসার সলজ্জ অরুণিমার প্রথম প্রকাশ তখন সুকান্তর বয়স ১৪ আর বান্ধবীর ১৩। তারপর এই আবেগ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের পথে স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হোল। এই দুর্বলতার কারণ হিসেবে সুকান্ত পরে নয় সংখ্যক চিঠিতে বলেছেন, "ওটা কাব্য রোগের লক্ষণ। মানুষের যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন কোনো একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়, তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম। ধর, তোমার চিঠিতে যদি সন্তোষজনক কিছু থাকত, তাহলে হয়তো আমার কাব্যের ধারা তোমাকে আশ্রয় করত। ও তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, চিঠিটা কিন্তু সন্তোষজনক ছিল না। আমি বললুম ; আমার কাব্যের ধারাও সঠিক পথে চলেছে।" অন্য কাজ বলতে সুকান্ত নিশ্চয়ই তাঁর রাজনীতিক কাজের কথা বলেছেন। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর সামনে একটা বৃহৎ সমস্যা, বৃহৎ পরিমণ্ডল, বিরাট দায়িত্ব এবং মহত্তর আবেগের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাঁর কাব্যের ধারা সেই বৃহৎ এবং মহতের দিকেই চালিত হয়েছিল। সুকান্ত একটা নতুন পথ, নতুন আদর্শ লাভ করে তাঁর সৃজনী শক্তিকে সার্থকপথে নিয়োজিত করল।

সুকান্তের দৈনন্দিন কাজকর্ম বলতে প্রধানত তাঁর 'পরিবর্তনহীনভাবে রাজনীতি' বোঝায়। স্কুলে যাওয়া, রাজনীতির চর্চা করা আর কবিতা গল্প লেখা। সেটাও রাজনীতি চর্চারই অন্তর্গত। কারণ ঐ বয়সে কর্ম ও চিন্তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। থাকে না তার প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যেও। মাঝে মধ্যে রাঁচি কিংবা কাশী ঘুরে আসা। জনযুদ্ধ পত্রিকার জন্য লেখা, 'জনযুদ্ধ' বিলি করা, ছাত্র সংগঠন এবং সম্মেলনের কাজ এবং পরে কিশোর-বাহিনীর যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হোত। সতেরো সংখ্যক চিঠিতে বন্ধুকে একটা কাজের ফিরিস্তি দিয়ে তার ওখানে না যাওয়ার কারণ হিসেবে লিখেছেন ঃ

"(১) কিশোর বাহিনীর দুধের আন্দোলন শুরু হল।

(২) ১৫ই জুন A.I.S.F. Conf

(৩) কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয়নি। ছাপাব।

(৪) ১৩ই জুন I.P.T.A- এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।

(৫) ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং।

(৬) কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ সপ্তাহে লিখতে হবে।

(৭) ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।

(৮) এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।"

এই চিঠির তারিখ ১৩/৬/১৯৪৪। একদিকে শরীর খারাপ অন্যদিকে কাজের চাপ, দুটোই ধীরে ধীরে সুকান্তের মনের ওপর ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে দু'বছর পরে। ছাব্বিশ সংখ্যক চিঠিতে লিখেছেন, "অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। ...আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে ভবিষ্যৎ আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাইনি ভালমতো। একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু "পরিবর্তনও" ঘটেনি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি ; তাই ভেতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে উঠেই গত তিন মাস ধরে খাটছি। বুঝতে পারিনি স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা। হঠাৎ গত সপ্তাহে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম।" এই শয্যা গ্রহণই শেষ পর্যন্ত একটি মারাত্মক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেল। রক্তপায়ী কীটগুলো ভেতরে ভেতরে তাঁকে দুর্বল করে তুললেও মনের দিক থেকে সুকান্ত কখনো নিজেকে দুর্বল বা অসমর্থ মনে করেননি। এই কঠিন রোগ থেকে সেরে উঠতে তখন নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। অন্তত সুকান্তর মনে হয়েছিল প্রচুর অর্থ থাকলে শরীর ভাল করা যায়। অর্থের অভাবে তখন সুকান্তর জীবনকেই মনে হচ্ছিল নিরর্থক। পার্টিরও অবস্থা ছিল না যথেচ্ছ অর্থের যোগান দেওয়া। নিছক প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্যও তার ছিল না। স্পর্শাতুর কবি মন তাই অভিমানে অভিযোগে মুখর হয়ে ওঠে। ঐ চিঠিতেই লিখেছেন, "আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে! এই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে; কিন্তু কি করে ভুলি, দেহ আর মনে আমি দুর্বল : একান্ত অসহায় আমি?" দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ কবি মনের একটি সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে এই চিঠির মধ্যে। আর্থিক-প্রতিকূলতায়, শারীরিক অসুস্থতায় পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখা দিলেও কর্মী হিসেবে তিনি বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে তাঁর রাজনীতিক সত্তাকেই জয়ী করে তোলেন। সেজন্য তার কয়েক মাস পরেই আত্মীয়-বন্ধুকে একচল্লিশ সংখ্যক চিঠিতে লিখেছেন, "বাস্তবিক এইসব বীরদের (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর) প্রায় প্রত্যেকেই শিশুর মতো হাসি-খুশি, সরল, আমোদপ্রিয়। এ ছাড়াও বিখ্যাত শ্রমিক এবং কৃষক নেতারা এখানে অসুস্থ অবস্থায় জড়ো হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেবার লোভ

আমার ছিল। ...

বেশ কাটছে এখানে। সবাই এখানে আপন হয়ে উঠছে, ভালবাসতে আরম্ভ করেছে আমাকে। ডাক্তার রোগী সবারই আনন্দ আমার সঙ্গে রসিকতায়! এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি– শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মতো জায়গায় বেশ আছি।"

কিন্তু এই নির্জনতা তাঁর পছন্দ নয়। সেজন্য ঐ চিঠিতেই লেখেন, "এখন আছি বদ্ধ-দীঘির জগতে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মাছের মতো, কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে।" এই কর্মচঞ্চল পৃথিবীর মধ্যেই সুকান্ত পেয়েছিলেন জনতার মুক্তির স্বাদ। তিনি যে জনতার কবি। এ কথা জানিয়ে ১৯৪৪ সালে তাঁর মেজ বৌদিকে লিখেছিলেন, "...আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।" এই একান্ত উপলব্ধি সুকান্ত সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের সংগ্রাম করে যেতে হয় কেবল একটি আদর্শের জন্য। কমিউনিস্টদের নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই, সর্বহারাশ্রেণীর তথা সমগ্র জনতার স্বার্থই সে রক্ষা করে। জনসাধারণের স্বার্থই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে ছাপিয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত এবং আদর্শগত সততা ও নিষ্ঠা দ্বারা জনতার আস্থা অর্জন করাই তাদের প্রকৃত আদর্শ। সেই আদর্শের জন্যই সুকান্তকে শহীদ হতে হোল।

এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে আরেকটি লক্ষণীয় হোল সুকান্তের সাহিত্যপ্রীতি এবং ভাষায় দখল। পত্রগুচ্ছের সবচেয়ে পুরানো যে চিঠি পাওয়া যায় তার তারিখ ১৬ই এপ্রিল (১৯৩৯)? সুকান্তর বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। বয়ঃসন্ধিকালের রচনা। তবু অলঙ্কার ব্যবহারে, শব্দ চয়নে, ভাব উপযোগী ভাষা ব্যবহারে পরিপক্কতা পাঠককে আকর্ষণ না করে পারে না:

"তোমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে তাকে দমন করতে পারি না। তবুও লিখে তৃপ্তি পায় না মন আর লোভও বেড়ে যায় এইতো চিঠি লিখলাম। আবার একটু পরে হয়তো তোমায় দেখতে ইচ্ছা করবে। আগুনের মধ্যে পতঙ্গ হয়তো ঝাঁপ দিতে চাইবে ; চঞ্চল মনের অঞ্চল হয়তো বসন্তের বাতাসে একটু দুলতে চাইবে; মনের মাদকতা হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু শীর্ণ শাখায় সে দোলা সুখের দিনগুলিকে ঝরিয়ে দেবে। আজকাল মাঝে মাঝে অব্যক্ত স্পৃহা সরীসৃপের মতো সমস্ত গা বেয়ে সুস্থ মনকে আক্রান্ত করতে চায়। আমি এ সমস্ত সহ্য করতে পারি না। আমার চারিদিকের বিষাক্ত নিঃশ্বাসগুলো আমাকেই দগ্ধ করতে ছুটে আসে আর তার সে রোমাঞ্চকর নিঃশ্বাস আমাকে লুব্ধ করে। আশার চিতায় আমার মৃত্যুর দিন সন্নিকট। তাই চাই আজ আমার নির্বাসন। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, তোমাদের ভুলতে চাই ; দীন হয়ে বাঁচতে চাই। তাই সুখের দিনগুলোকে ভুলে, তোমাদের কাছে শেখা মারণ-মন্ত্রকে ভুলে, ধ্বংসের প্রতীক স্বপ্নকে ভুলে মৃত্যুমুখী আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু পারব না, তা

আমি পারব না ;-- আমার ধ্বংস--অনিবার্য। আজ বুঝেছি কেন এত লোক দুঃখ পায়, সঠিক পথে চলতে পারে না। আলেয়া-যৌবন তার দিক-ভ্রান্তি ঘটায়। হঠাৎ স্বপ্নাকাশে বাস্তবের মেঘগুলো জড়ো হয়ে দাঁড়ায় ভিড় করে, হাতে থাকে বুভুক্ষার শাণিত-খড়গ আর অক্ষমতার হাঁড়ি-কাঠে তাদের মাথা কাটা পড়ে। এই তো জীবন। প্রথম যৌবনের অলস অসতর্ক মুহূর্তে আমরাই আমাদের শ্মশানের চিতা সাজাই হাস্যমুখর দিনের পরিবেশনে। অশিক্ষিত আমাদের দেশে যৌবনে দুর্ভিক্ষ আসবেই। আর তারই বহ্নিময় ক্ষুধা আমাদের মনকে তিক্ত, অতৃপ্ত, বিকৃত করে তোলে। জীবনে আসে অনিত্যতা, জীবনী-শক্তি যায় ফুরিয়ে, কাজে আসে অবহেলা, ফাঁকি আমরা তখনই দিতে শিখি আর তখনই আসে জীবনকে ছেড়ে চুপি চুপি সরে পড়বার দুরন্ত অভিসন্ধি।" " (৩৯নং পত্র)"

'বুভুক্ষার শাণিত-খড়গ' 'অক্ষমতার হাঁড়ি কাঠ', 'সরীসৃপের মতো অব্যক্ত স্পৃহা' প্রভৃতি সমাসোক্তি ও রূপক অলঙ্কারের ব্যবহারে অভিনবত্ব সুকান্তের ক্ষমতারই উজ্জ্বল নির্দশন। কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে আতঙ্কিত কলকাতার বর্ণনা--"ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমস্তম্ভমান স্পন্দন ধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে-মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা।" এই লেখার মধ্যে একদিকে যেমন আছে কলকাতার সাইরেনের দীর্ঘশ্বাস তেমনি আছে একটি সাহিত্যিক প্রকাশ। অতি চমৎকার করে তৎকালীন কলকাতার নাটকীয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

বন্ধু অরুণাচলদের পরিত্যক্ত বেলেঘাটার বাড়ির বর্ণনায়ও সুকান্তের কাব্যিক আবেগও উল্লেখনীয়-- "তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত, তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালি হাওয়ায়-হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি, তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনতায়।" ...কিংবা "শত শত জন-কোলাহল-মথিত ইস্কুল বাড়িটি·আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মতো তার অবস্থা। তোদের অজস্র-স্মৃতি-চিহ্নিত তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদেরই স্পর্শের জন্য উন্মুখ ; সেখানে এখনও বাতাসে বাতাসে পাওয়া য়ায় তোদের স্মৃতির সৌরভ।"

রাঁচী বেড়াবার সময় জোনহা প্রপাতের সৌন্দর্য বর্ণনাও রমণীয়। রাত্রের জোন্‌হা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "জোন্‌হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগল কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত-জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগল আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। প্রহরীর মতো জেগে রইল ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়ে।"

এ ছাড়াও পত্রগুচ্ছের মধ্যে আমরা জানতে পারি অনেক টুকিটাকি সংবাদ। ১৯৪৫ এবং

১৯৪৬ সালেও বোধ হয় সুকান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ২০/৪/৪৫ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য আমার দুশ্চিন্তা ও অবহেলার সীমা নেই, যদিচ তোড়জোড় করছি খুব।" আবার ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ তারিখে লিখেছেন, "পরীক্ষা দিয়ে উঠেই গত তিন মাস ধরে খাটছি।"

পরীক্ষার খবর যাই হোক, কবি হিসেবে সুকান্ত যে তার জীবিতকালেই যথেষ্ট খ্যাতি এবং সম্মান পেয়েছিলেন তারও সংবাদ আছে পত্রগুচ্ছে। "একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে... আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে চিচ্ছে।" এই চিঠির তারিখ দেওয়া আছে ২৭শে চৈত্র, ১৩৪৮। এই চিঠির তারিখ সঠিক কিনা বলা কঠিন। কারণ ১৯৪১ সালে তিনি বাইরের খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি এত লাভ করার কোন কারণ ছিল না। ১২.৯.৪৬ তারিখে চিঠিতেও তার খ্যাতি আর স্মরণীয় দিনের কথার উল্লেখ আছে ঃ "...কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন— "আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।" ...অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন— আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করিনি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে।"

জীবিতকালেই সুকান্ত তার ছড়ার বইয়ের প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে দিয়েছিলেন সম্ভবত ছবি আঁকার জন্য। তা ছাড়া বাংলার কিশোর বাহিনীর কর্মসচিব হিসেবে কিশোর বন্ধুদের তিনি সব সময় পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। এমনি করে পত্রগুচ্ছের মধ্যে সুকান্তের জীবন, কর্মময়তা এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য তাঁর পত্রগুচ্ছ ঐতিহাসিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

নবম অধ্যায়
অপ্রচলিত রচনা

সুকান্ত সমগ্র গ্রন্থে 'অপ্রচলিত' নামে সুকান্তের অনেক রচনা দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত হয়ে আসছে। এগুলো সুকান্ত সমগ্র ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়নি। নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত রচনাবলী বলেই এগুলোকে অভিহিত করা যায়।

অপ্রচলিত রচনা অংশে আছে চারিটি সুস্পষ্ট বিভাগ-- গল্প, প্রবন্ধ, গান এবং কবিতা। এর মধ্যে আছে পাঁচটি গল্প, একটি প্রবন্ধ, পাঁচটি গান এবং ষোলটি কবিতা।

পাঁচটি গল্পের মধ্যে চারটিই ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত-- 'ক্ষুধা' এবং 'দুর্বোধ্য' গল্প দুইটি সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকার ২রা এপ্রিল এবং ২৮শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। 'দরদী কিশোর' এবং 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্প দুইটি সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ২৮শে এপ্রিল এবং ৬ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত। এই চারটি গল্পই ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। বাকী 'ভদ্রলোক' গল্পটি 'অরণি' পত্রিকার ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের মূল্য যখন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল, আরো আরো অভাব সৃষ্টির জন্য জিনিসপত্রকে যখন কালোবাজারীরা অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে রেখে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করল, যখন ভাতের অভাবে ফ্যানের জন্য লাখে লাখে মানুষ দুয়ারে মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে মরে পড়ে থাকতে আরম্ভ করল তখন সরকার খাদ্য-দ্রব্য, কাপড়, কেরোসিন সব কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে রেশন দোকানের মাধ্যমে বিলি করার ব্যবস্থার নামে আর একটি চরম অব্যবস্থার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে অভাবের দায়ে মানুষকে রাত থাকতে লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত 'আর নেই' শুনে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হোত।

মোক্ষদা মাসির ক্ষুরধার কণ্ঠস্বরে আছে তারই ঝাঁঝালো বর্ণনা-- "ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো কন্টোরালির মুখে। মরণ হয় না রে তোদের? পয়সা দিয়ে চাল নেব, অত কথা শুনতে হবে কেন শুনি? আমরা কি তোদের খাসতালুকের পেরজা? আগুন লেগে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে চালের গুদোমরে। দু'মুঠো চালের জন্যে আমার মানসম্ভোম সব গেল গো! আবার টিকিট ক'রেছেন, টিকিট ; বলি ও টিকিটের কী দাম আছে শুনি? --লক্ষ্মী পিসিকে সম্মুখবর্তী দেখে মাসির স্বর সপ্তমে উঠল ঃ --ও টিকিটে কিচ্ছু হবে না গো, কিচ্ছু হবে না। সোমত্ত বয়েস। সুন্দর মুখ না হলে কি চাল পাবার যো আছে? আমি হেন মানুষ ভোর থেকে বসে আছি টিকিট আঁকড়ে তিন প'র বেলা পর্যন্ত, আর আমাকে চাল না দিয়ে চাল দিলে কি না ও বাড়ির মায়া সুন্দরীকে।" এটা কেবল মাসির অভিযোগ নয়, ১৯৪৩ সালে চাল না পাওয়া এটা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কন্ট্রোলের দোকান ঘিরে কত রকমের জটলা।

অথচ ক্ষুধার তাড়না মানুষের আদিম তাড়না। শিশু যখন বারে বারে মায়ের কাছে দাবী জানায় 'মা খেতে দিবি না?' 'কখন ভাত রাঁধবি' তখন অসহায় মাতৃহৃদয়ে কী যন্ত্রণার উদ্রেক হয় তা সহজেই অনুমেয়। দিনের পর দিন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির নীলুর পরিবার। তার স্ত্রী কখনো ঘরের বাইরে যায়নি। একদিন তাকেও ছেলে কোলে করে গিয়ে কন্ট্রোলের দোকানের লাইনে দাঁড়াতে হোল। "কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে তার মতো ক্ষুধার্ত নারী একজন নয়, দু'জন নয়, শত শত এবং ক্ষুধার তাড়নায় তাদের লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, আব্রু নেই, সংযম নেই, নেই কোন কিছুই ; শুধু আছে ক্ষুধা আর আছে সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির আদিম প্রবৃত্তি। যার কিছু নেই সেও আহার্য চায়, তারো বাঁচবার অদম্য লিপ্সা। সব কিছু দেখে শুনে যশোদা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চেষ্টা করছিল শিশুটাকে শান্ত করবার আর ডাকছিল সেই ভগবানকে যে-ভগবান অন্তত একসের চাল তাকে দিতে পারে।" এমনি দু একটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে সুকান্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়কার দুর্দশাকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

একজন বৃদ্ধ-অন্ধও সেই দুর্দশা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে। সে বেঁচে থাকত লোকের সাহায্যের ওপরে সে-ও লোকের আলাপ-আলোচনা আর তার মেলে ধরা কাপড়ের শূন্যতায় অনুভব করতে পারে কী ভীষণ দুর্দিন এসেছে। এই দুর্দিনের দুর্বোধ্যতায় সে দিনের পর দিন উন্মাদ হয়ে ওঠে। "অজন্মা নয়... প্লাবন নয়.. শুধু দুর্দিন, তবু দুর্ভিক্ষ।" কিন্তু কেন? সেই কথা কে বলবে। শুধু সে শুনতে পায় চালের মন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, টাকা দিয়েও আর চাল পাওয়া যায় না। "ঘনশ্যামের বৌ চাল কিনতে গিয়ে চাল না পেয়ে জলে ডুবে মরেছে।" দিনে দিনে আকাল পড়েছে। আগে এক পয়সায় কত কী পাওয়া যেত এখন এক পয়সাও উধাও হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের বাজারে চালু হয়েছে ডবল পয়সা।

অভাব অনটনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিনা দোষে নীলু তার স্ত্রী যশোদাকে রাগের বশে এমন লাথি মারে যার ফলে যশোদার মৃত্যু ঘটে। নীলু ঘোষ এবং হারু ঘোষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ক্ষুধার জ্বালায় নারী ইজ্জত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

চল্লিশ দশকের সমাজ বাস্তবতার এই দিকটা হোল অবক্ষয়ের দিক, ধ্বংসের দিক। দেওয়ালের অন্য পিঠও আছে। সেখানে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হোল প্রতিবাদ আর মিছিলের পদধ্বনি। "অন্ন চাই— বস্ত্র চাই..." হাজার হাজার মিলিত পদধ্বনি আর দৃঢ় আওয়াজ অবসন্ন প্রাণে রোমাঞ্চ আনে। তারা চলেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চাল আনতে। উপবাসখিন্ন, ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ অন্ধও প্রতিবাদে প্রতিবাদে সেই মিছিলে এগিয়ে যেতে চায়।

এ. আর. পি-র বিনয় প্রতিদিন লক্ষ্য করে কন্ট্রোলের দোকানের সামনে দীর্ঘ প্রতীক্ষারত লাইন। কিন্তু ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত সে তীব্রভাবে অনুভব করল নীলু আর হারু ঘোষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সে আরও অনুভব করল অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায় আগ্নেয়গিরিকে। প্রতিদিনকার অসীম ধৈর্যের মধ্য দিয়ে এরা অনিবার্য করে তুলেছে আসন্ন বিপ্লবকে ; আগ্নেয়গিরির বিপুল বিস্ফোরণকে। যার ফলে এই অবক্ষয় আর দুর্দিনের অবসানে আসবে এক স্বপ্নময় সুখী আদর্শ ভবিষ্যৎ। ক্ষুধা আর দুর্বোধ্য গল্পে সেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার

কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

'দরদী কিশোর' আর 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্প কিশোরদেব জন্য রচিত হলেও এই দুটি গল্পেও দুর্ভিক্ষের সেই ভযাবহ দুর্দিনের কথা আব তা দূবীকবণের জন্য একটা সযত্ন প্রয়াসের কথা আছে। দেশে যখন কোন সামাজিক দুর্দৈব দেখা দেয় তখন তার থেকে শিশু কিশোরও অব্যাহতি পায় না। তাদেব সুন্দর ভবিষ্যৎও বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কন্ট্রোলের দোকানে কেবল পুরুষ নারী বুড়ো-বুড়িই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে নি। অনেক স্কুলের ছেলেকেও গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। সেখানে নিদারুণ ভীড়। চালের লাইনে প্রায়ই মাবামারি কাটাকাটি ঘটে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে শতদ্রু দেখে সেই লাইনে তার সহপাঠি শিবুও প্রতিদিন পড়া ফেলে চালের লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়। "বেচারার আর স্কুলে যাওয়া হয় না, কোনো কোনো দিন চাল না পেয়েই বাড়ি ফেরে, আর বৃদ্ধ বাপের গালি গালাজ শোনে, আবার মাঝে মাঝে মারও খায়।"

স্বভাবকোমল মন শতদ্রু সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্কুলের পড়া ভুলে যায়, অন্যায় অত্যাচার দেখে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।" দেশের জন্য, দশের জন্য রুশ কিশোরদের আত্মত্যাগের কথা সে বইতে পড়েছে। তাদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব শতদ্রুকে অস্থির করে তোলে। মনে মনে সে খুঁজতে লাগল একটা কঠিন কাজ, একটা আত্মত্যাগের সুবর্ণ সুযোগ। সে দেখল তার বাড়িতেই রয়েছে চালের বিরাট মজুত আর বাইরে লোকেরা চালের জন্য মারামারি কাটাকাটি করছে. সে তার বাড়িব গোপন খবর বলে দিল কিশোর-বাহিনীর ভলান্টিয়ারদের। তার ফলে অবশ্য তাকে তার বাবার হাতে পেতে হোল অমানুষিক অত্যাচার। "কিন্তু শতদ্রু এতে এতটুকু দুঃখিত নয়, এতটুকু অনুশোচনা জাগল না তার মনে। সে ভাবল, এতো তুচ্ছ, এতো সামান্য নিপীড়ন, রুশিয়ার বীবদের অথবা কায়ুর কমরেডদের তুলনায় তার আত্মত্যাগ এমন কিছু নয়। তবু একটা কিছু করার আনন্দে সে শিউরে উঠল, আর এই কান্নায় তার মন পবিত্র শুচিস্নিগ্ধ হল।" এমনি করে একটা নতুন আদর্শে ব্যক্তিগত স্বার্থের বহু উর্ধ্বে গড়ে উঠল একটি কিশোরের মন। চল্লিশের দশকে এটাই ছিল সমাজ বাস্তবতা। সারা বাংলা দেশ জুড়ে একদিকে যখন দেখা যাচ্ছিল প্রেতের নৃত্য, দিনের পর দিন বিভিন্ন জায়গায় জাপানের বোমা বর্ষণ এবং মানুষসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা তখন অন্যদিকে দেখা গেল নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী দেশের কাজে এগিয়ে এল। তারা একদিকে আর্ত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করল অন্যদিকে ওদের প্রাণে নতুন আশা আর ভরসা দিয়ে নতুন জীবন, নতুন দেশ, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ভরে দিল।

'কিশোরের স্বপ্ন' গল্পে সেই অন্ধকার এবং অন্ধকারের পরে আলোয় নিশানা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জন্য তখন পাড়ায় পাড়ায় খোলা হয়েছে রিলিফেরে কিচেন— লঙ্গরখানা। সেখানে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে কিশোর-ছাত্র-যুবরা। প্রচণ্ড অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা আলোর সম্ভাবনাকে ভোলেনি। বরং সেটাই তাদের মনে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছে। চারিদিকে দম বন্ধ-করা ভীষণ অন্ধকার। সেই

অন্ধকারেই তারা দেখতে পেল মাতৃভূমির নানা দুঃখ দুর্দশা। কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। দুঃখ যত গুরুভারই হোক না কেন, আঘাত যত নির্মমভাবেই আসুক না কেন তাকে জয় করাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। সেই দুঃখ জয়ের সাধনায় বাংলা দেশের কিশোব কিশোরীরাও পিছিয়ে পড়ে নেই। তারা জানে তারা এগিয়ে গেলে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে বাংলার মজুর কিষাণ ভাইরা। তারা জানে শত্রুকে ক্ষমা করতে নেই। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে সংহত শক্তিতে জয় তাদের অনিবার্য।

কালের অনিবার্য নিয়মেই দুর্ভিক্ষের দিনগুলো অবসিত হলো। মাঠে আবার নতুন ফসল মাথা তুলে ভাঙা-চোরা প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করলো। কিন্তু বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল তাদের পুরানো ধারণা পুরানো মূল্যবোধ সব ভেঙেচুরে বিনষ্ট করে দিল। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সমাজে একটা কৃত্রিম আবরণ রক্ষা করে 'ভদ্রলোক' বলে আত্মজাহির করে বেড়াচ্ছিল, অর্থনৈতিক প্রচণ্ড ধাক্কায় তা চুরমার হয়ে গেল। গ্রামীণ আভিজাত্য নষ্ট হয়ে গেল। বেকারীর জ্বালায় ভদ্রলোক শ্রেণীকেও এমন কাজ করতে হোল যা পূর্বে ছিল কল্পনাতীত। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা বড় অংশ শ্রমিকশ্রেণীতে নেমে যেতে বাধ্য হোল। আরেকটা অংশ যুদ্ধের বাজারে ফাঁপা টাকায় কন্ট্রাক্টরি আর কালোবাজারি করে ধনিক শ্রেণীতে পরিগণিত হোল। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্পে উপন্যাসে এই ভাঙনের চিত্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

সুকান্তের 'ভদ্রলোক' গল্পে আছে সেই ভাঙনের চিহ্ন। যে শ্রমিক শ্রেণী ভদ্রলোকদের কাছে ছোটলোক বলে গণ্য হোত, চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সেই ভদ্রলোকদের শ্রমিকের চাকুরি গ্রহণ করতে হোল। কিন্তু মনে প্রাণে সেই জীবিকাকে মেনে নিতে তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড দ্বিধা ছিল। বাসের কন্ডাক্টর সুরেন বাধ্য হয়ে চাকুরি গ্রহণ করলেও বাসের ড্রাইভারদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারছিল না। নিজের ভদ্রলোকী আবরণটাকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অবাস্তব এই সংস্কারটা একদিন বাসের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তার মামার বাড়ির ভাড়াটেদের হাতে। সুরেনের সমস্ত রোমান্স মিথ্যে হয়ে গেল। সমাজ বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে অন্যের কাছেই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠতে হয়। শ্রমিকের চাকরী করব অথচ শ্রমিকের মেজাজ বা তার দোষত্রুটির স্পর্শ লাগবে না এটা হয় না, এটা অবাস্তব। একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা সুরেনকে পৌছে দিল সৌখিন ভদ্রসমাজ থেকে ঘা-খাওয়া ছোটলোকের সমাজে।

সুকান্তের এই গল্পগুলোর মধ্যে রচনাকালীন সময়ের সমাজ বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এই সব গল্পই তাঁর কবিতার আবেগ নিয়ে লেখা। সেজন্য গল্প লেখকের স্বভাবসিদ্ধ চালচিত্র বা বিস্তার এগুলোর মধ্যে নেই। একটা বক্তব্য প্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠায় স্বাভাবিকতা বা গল্পের গ্রন্থণ ত্রুটিযুক্ত হয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ত্রুটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে 'ক্ষুধা' গল্পে। ঐ গল্পের পরিণতির বক্তব্য সঠিক হলেও সেটা যেন আচমকা এসে পড়েছে। গল্পের অনিবার্য বক্তব্য হিসেবে তা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেনি। মনে হয় চল্লিশ দশকের আদর্শপ্রাণতার প্রাবল্য নতুন গল্প লেখক সুকান্তকে বক্তব্য প্রকাশের দিকে দ্রুত চালিত

করেছে। আঙ্গিকের এই ত্রুটি সত্ত্বেও সুকান্তের প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতা প্রশংসনীয়। দুটো একটি ঘটনা বা রেখার টানে সুকান্ত পরিবেশ এবং চরিত্রগুলোকে অদ্ভুত জীবন্ত করে তুলতে পেরেছে।

২

সুকান্তের একমাত্র প্রবন্ধ 'ছন্দ ও আবৃত্তি' ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪-এর 'অরণি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধে বাংলা কবিতা সম্পর্কে সুকান্তর একান্ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা রচনার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছন্দ। কবির মনে নানা ঘটনার সংঘাতে, নানা দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষণে, নানা রূপের ব্যঞ্জনায় নানা ভাবের সৃষ্টি হয়, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে শুধু কতগুলো শব্দ সাজিয়ে, কথা দিয়ে হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে। ...কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহন-যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্য রচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।''

ছন্দের এই অপূর্ব শক্তিমত্তার কথা পূর্বে ছিল অজানা। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা কাব্যের বাহন হিসেবে ছিল তিনটি ছন্দ-- পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী। পয়ারে ছিল ১৪ মাত্রা, ছত্রে ছত্রে অন্ত্যানুপ্রাস। প্রথম আটমাত্রার পরে অর্ধযতি, পরের ছয় মাত্রার পর পূর্ণযতি। এর কোন নড়চড় ছিল না। মধুসূদন এই চোদ্দ মাত্রার মধ্যেই ভাবানুযায়ী ছেদের বৈচিত্র্য এবং মিলের বন্ধন তুলে দিয়ে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করলেন তাতে বাংলা ছন্দ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পয়ারের যুগকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছিল। মধুসূদন দত্ত বাংলা ছন্দে প্রবহমানতার জনক। আর প্রচলিত সমস্ত রকমের ছন্দের বন্ধন থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্তি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা কাব্যে তাঁর মহৎ সৃষ্টি মুক্ত ছন্দ-- যেন চিরকালের চলার ছন্দ-- যেন নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। এই ছন্দের প্রথম সার্থক প্রকাশ বলাকা কাব্যে। তারপর তিনি বাংলা কবিতাকে আরো মুক্তি দিলেন গদ্যছন্দে। তারপর পরবর্তী কবিদের হাতে এই মুক্ত ছন্দ এবং গদ্য ছন্দ আরও স্বচ্ছন্দতা লাভ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নজরুল ইসলাম এই ছন্দ সাধনায় অদ্ভুত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন। একদিকে তারা দৃষ্টি দিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দ বৈচিত্র্যের দিকে অন্যদিকে তারা নানা দেশের কবিতা সেই সেই দেশের ছন্দে অনুবাদ করলেন। শুধু তাই নয় নানা ছন্দ মিশিয়ে নতুন নতুন ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় ছন্দের

যাদুকর বলে আর নজরুলকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিলেন 'ছন্দ সরস্বতীর বরপুত্র'। আরবী, ফারসী, তোটক, শার্দুলবিক্রিড়িত, সিংহবিক্রিড়, অনঙ্গ-শেখর, পঞ্চচামর, শিখরিণী, অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি নানা ছন্দে বাংলা কাব্য সমৃদ্ধ হোল।

সুকান্ত তাঁর প্রবন্ধে এই ছন্দ সাধনারই কথা বলেছেন। এর থেকে বোঝা যায় বাংলাকাব্যের ছন্দ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাঁর কী নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি আধুনিক কবিদের ছন্দ-সাধনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অনুভব করেছেন, ছন্দের ধার দিন দিন কমে আসছে। সেজন্য তিনি অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেছেন। "ভাল ছন্দ ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য মনে হচ্ছে। এর প্রতিকারের কোনো উপায় কি নেই? আহার্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ছন্দ দুর্লভ হওয়ার দুটোর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে অদম্য হয়ে উঠছে, সুতরাং ভীতি-বিহ্বলচিত্তে কবিদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ লক্ষ্য করব। কোনো কোনো কবির ছন্দের আশঙ্কাজনক প্রভাব অধিকাংশ নবজাত কবিকে অজ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাতসারে আচ্ছন্ন করছে, অতএব দুঃসাহস প্রকাশ করেই তাঁদের সচেতন হতে বলছি। খ্যাতনামা এবং অখ্যাতনামা প্রত্যেক কবির কাছেই দাবি করছি, তাঁদের সমস্তটুকু সম্ভাবনাকে পরিশ্রম করে ফুটিয়ে তুলে বাংলা ছন্দকে সমৃদ্ধ করার জন্যে। একথা যেন ভাবতে না হয় রবীন্দ্রনাথের পরে কারো কাছে আর কিছু আশা করবার নেই।" সুকান্ত তাঁর নিজের কাব্য-কৃতির মধ্যেই নানা ছন্দ সাধনার বিশেষ করে মুক্ত ছন্দ এবং গদ্যছন্দের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কথা এবং ছন্দের সুসমন্বয় সাধিত হয়েছিল বলেই তাঁর কাব্য দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ছন্দ উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন 'কান' তৈরি করা আর কান তৈরি করার জন্য প্রয়োজন আবৃত্তির। সার্থক আবৃত্তির জন্য প্রয়োজন "বিশুদ্ধ উচ্চারণ, নিখুঁত ধ্বনি-বিন্যাস, কণ্ঠস্বরের সুনিপুণ ব্যঞ্জনা এবং সর্বোপরি ছন্দ সম্বন্ধে সতর্কতা।" পূর্বে বাংলাদেশে কবির লড়াই, পাঁচালি, কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে ছন্দ-শিক্ষার একটা প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বিগতদিনের হয়ে পড়ায় তা আর সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য সুকান্তের প্রস্তাব হোল সভাসমিতিতে কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করা, রেডিওতে আবৃত্তির ব্যবস্থা করা কিংবা সিনেমার সংলাপে কবিতার পংক্তি সংযোজিত করা উচিত। তবে থিয়েটারী ঢঙে আবৃত্তির মধ্য দিয়ে ছন্দ জ্ঞানের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্বে ঘুম-পাড়ানি ছড়ার সঙ্গে শিশুদের স্বাভাবিক পরিচয় হোত। তাতে স্বাভাবিকভাবে ছন্দের কান তৈরি হয়ে যেত। এখন তাও হচ্ছে না। অতএব নতুন করে নানাভাবে আবৃত্তির আয়োজন করতে হবে। গদ্য ছন্দ সম্পর্কে কবি এবং পাঠকদের আরো সচেতন হতে হবে। তবে আধুনিক কবিতা জনসাধারণের কাছে সমাদৃত হবে।

সুকান্ত কবি ছিলেন বলেই আধুনিক কবিতার আঙ্গিকের দিকটা বিশেষ করে আলোচনা করেছেন। অ-কবি পাঠক হলে বুঝতে পারতেন কেবল উপযোগী ছন্দে লিখলেই আধুনিক কবিতা "খেচর অবস্থা থেকে ক্রমশ জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর" হবে না। ছন্দের বাইরেও কবিতায় আরও কিছু আছে যা পাঠকদের মনে সাড়া জাগাতে পারে। জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগসাধনের ফলেই জীবনেশ্বরের পুজো হয়। সাধারণ পাঠকের জীবনচেতনায় গভীর সাড়া

জাগাতে না পারলে আধুনিক কবিতা কখনোই জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হতে পারে না। গভীর এবং সমসায়িক জীবনচেতনার ফলেই সুকান্তর কবিতা জনসমাদৃত হতে পেরেছে। সেখানে ভাব ও রূপের সার্থক সাযুজ্য ঘটেছে। কারণ, "রচনাগুণ জিনিষটা শুধুই রূপরীতির (ফর্ম) ব্যাপার নয়, প্রথমতঃ সেটা বিষয়বস্তুরই (কনটেন্ট) ব্যাপার ; এবং ফর্মের গুণটা শুধুই কারুকুশলতার ব্যাপার নয়, বিষয়বস্তু আর তার প্রতি শিল্পীর প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল।" এইবোধ সুকান্তের কাব্যকৃতির মধ্যে সার্থকভাবে বিকশিত হয়েছে।

৩

অপ্রচলিত অংশে আছে পাঁচটি গান— "এসো এসো এসো হে নবীন", "যেমন করে তপন টানে জল", "জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ", "আমরা জেগেছি, আমরা লেগেছি কাজে", এবং "শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে।" এর মধ্যে প্রথম দুটি গান সুকান্তের প্রাক্-রাজনীতি পর্বের এবং বাকি তিনটি রাজনীতি পর্বের। 'এসো এসো এসো হে নবীন' গানটি নববর্ষের নবীন-বরণের গান। চৈত্রের দাবদগ্ধ পাতা-ঝরা দিনগুলোর অবসানে আকাশজুড়ে নেমে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। রুদ্ররূপে আবির্ভাব ঘটলেও তার ধারাবর্ষণে তৃষিত প্রাণ শান্ত হয়। নতুন কিশলয়ের সঞ্চার হয়। কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যেও এই আশ্বাস আছে বলেই নবীন বরণে তার অভিষেক ঘটে।

"যেমন ক'রে তপন টানে জল" গানটি যেন প্রার্থনাজ্ঞাপক। সূর্য-তাপের সঙ্গে জলের যে সম্পর্ক তেমনি সম্পর্ক কবির সঙ্গে তার বাঞ্ছিতজনের। তিনি মিতা হয়েও দুর্লভ এবং ছলনাময়ী। তাই তাঁর প্রতি কবিচিত্তের ব্যাকুলতাই এখানে প্রকাশমান। এ দুইটি গানেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট।

বাকি গানগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনের। জনযুদ্ধের গান ফ্যাসিস্টবিরোধী জাপ-বিরোধী আন্দোলনের গান। এখানে কথা স্পষ্ট, সুর উদ্দীপ্ত। এই গান জনযুদ্ধের, প্রতিরোধের। "আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে" কিশোর বাহিনীর গান। কিশোর বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা করা, কিশোর প্রাণে দেশপ্রেমের সঞ্চার করা, মহামারী বিধ্বস্ত বাঙলার বুকে সব ভেদাভেদ দূর করে নতুন শতাব্দীর নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি করা। "শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে" শত্রুর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গণ-সঙ্গীত। নতুন আদর্শে উদ্দীপিত একটি দৃপ্ত শপথঃ

যুগান্ত জোড়া জড়রাত্রির শেষে
দিগন্তে দেখি স্তম্ভিত লাল আলো,
রুক্ষ মাঠেতে সবুজ ঘনায় এসে
নতুন দেশের যাত্রীরা চমকালো।
চলতি ট্রেনের চাকায় গুঁড়ায়ে দম্ভ
পতাকা উড়াই, মিলিত জয়স্তম্ভ।
মুক্তির ঝড়ে শত্রুরা হতভম্ব।
আমরা কঠিন পণ।"

ষোলটি কবিতা বিভিন্ন সূত্র থেকে পরবর্তীকালে সংগৃহীত হয়ে অপ্রচলিত রচনা অংশে সংযোজিত হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন স্বাদের কবিতা। এর মধ্যে চারটি ছড়া— 'ভবিষ্যতে', 'সুচিকিৎসা', 'পবিচয়', এবং "নব জ্যামিতি"র ছড়া।' এদের মধ্যে প্রথম তিনটি রচনা-পরিচিতি অনুসারে ১৯৩৯-৪০ সালে রচিত। সুচিকিৎসা এবং পরিচয় ছড়া দুটির মধ্যে কৌতুক রস প্রধান। পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথের কলকাতায় এসে সর্দি হওয়ার পর ডাক্তারের বিরাট চিকিৎসার কৌতুককর কাহিনী। এক সর্দি সারাতে তিনি একসরে থেকে অক্সিজেন পর্যন্ত আয়োজন করেছিলেন। সুচিকিৎসা কবিতায় যেমন ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে তেমনি পরিচয় কবিতায় আছে ওপাড়ার পালোয়ান শ্যামরায়ের বলিহারী সাহসেব কৌতুক। দুপুরবেলাযও তাব আলোর প্রয়োজন হয, তিনি ছিলেন এমনি সাহসী। ছন্দের দোলাব দিকেই প্রধান দৃষ্টি। কিন্তু 'ভবিষ্যতে' ছড়াটির মধ্যে দেশপ্রাণতা প্রধান। চাষী মজুর দীন-দরিদ্র সকলের মিলিত শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়নের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে।—

স্বাধীন হবে ভাবতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন।
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে,
রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে।

রাজনীতির সংস্পর্শে আসবার আগে সুকান্তর এই প্রকাব লেখা আর পাওয়া যায় না। সেজন্য এই ছড়াটিকে নিঃসন্দেহে ১৯৪০-এর পূর্বেকার রচনা বলে অনুমান করা কষ্টকর। বিশেষ করে ছড়াটির মধ্যে চাষী-মজুর দীন-দরিদ্রের সংহতির কথা আছে, সাম্প্রদায়িক এবং অন্যান্য মতভেদের কথা আছে —"থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়। ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।" রাজনৈতিক সঙ্কল্পের এই দৃঢ়তার কথা পাওয়া যায় সুকান্তের পরবর্তী কবিতাগুলোর মধ্যে।

নব জ্যামিতি'র ছড়াটি পরিকল্পনার দিক থেকে অনবদ্য। তীব্র খাদ্য সঙ্কট। তার সমাধানের জন্য প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিরোধ। এই বক্তব্যকেই সুকান্ত ফুটিযে তুলেছেন জ্যামিতির এক সম্পাদ্যের গঠনরীতিতে। কোন একটি বিন্দু থেকে একটি সরলরেখার ওপর একটা লম্ব অঙ্কন করতে হবে। এটাই হোল জ্যামিতির সমস্যা। সরলরেখার দুই বিন্দু থেকে দুটি চাপ অঙ্কন করে চাপ দুটি যে বিন্দুতে মিলিত হবে তার সঙ্গে সরলরেখাটিকে যুক্ত করে দিতে হবে। অতি পরিচিত এই সম্পাদ্যটি সুকান্তের কাব্য কল্পনায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। একই সমাজের দূরবর্তী দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাধারণ সমস্যা আছে ; সেই সমস্যা সমাধানে উভয়কে একত্র মিলিত করতে পারলে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করা যেতে পারে। তাকেই তিনি বলেছেন "দেশরক্ষার 'লম্ব'"। জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিতে গেলে প্রয়োজন কল্পনা, অঙ্কন এবং প্রমাণের। সুকান্ত সেই পদ্ধতিতেই ছড়াটিকে সাজিয়ে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছেন। এই ছড়াটি সাপ্তাহিক জনযুদ্ধের কিশোর বিভাগে প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

'চৈত্রদিনের গান' কবিতাটি ছোটদের 'শিখা' পত্রিকার জন্য রচিত। "রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪০।" বসন্তের হাওয়া লেগে গাছে গাছে সবুজ প্রাণে সাড়া জেগেছে। "মৃত্যুমাখা দিনগুলিরে" পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান কবি নিজের প্রাণেও অনুভব করলেন—" "মুক্তি পথের লাগাম ধরে/ভবিষ্যতের পানে চল আলোর গান গেয়ে।" এখানে মুক্তির দ্যোতনা প্রাকৃতিক জগতে অতীতকে পিছনে ফেলে স্বপ্নময় ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়া।

'ভারতীয় জীবনত্রাণ সমাজের মহাপ্রয়াণে', 'মেজদাকে ঃ মুক্তির অভিনন্দন' এবং 'পত্র' কবিতা তিনটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক জড়িত। দক্ষিণ কলকাতার লেক অঞ্চলের 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। তারই এক অনুষ্ঠানে সুকান্ত তার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় রচিত প্রথম কবিতাটি। তার সঙ্গে জড়িত সকলের ক্ষোভ ও বেদনা সুকান্তের কবিতায় সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে ঃ

তারপর অকস্মাৎ ভেঙে গেল রুদ্ধশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধ সভা,
সহসা চৈতন্যোদয়, প্রত্যেকের বুকে ফোটে ক্ষুব্ধ রক্তজবা ;
সমস্ত গানের শেষে যেন ভেঙে গেল এক গানের আসর ;
যেমন রাত্রির শেষে নিঃশেষে কাঙাল হয় বিবাহ-বাসর।

'আজিকার দিন কেটে যায়' কবিতাটি যেন 'চৈত্র দিনের গান' কবিতার পূর্ব উপলব্ধি। কবি ব্যাকুল চিত্তে অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় একটি দিন অতিবাহিত করলেন। স্বভাবতই এই কবিতা সুকান্তের প্রাথমিক পর্বের লেখা বলেই অনুমিত হয়। তারপরেও চলে ক্লান্তিময় মহাযুদ্ধের প্রাথমিক শঙ্কিত দিনগুলো। তারই প্রকাশ আছে 'পটভূমি' কবিতায় ঃ

পঙ্গু জীবন ; পিচ্ছিল ভীত আত্মা--
রাত্রির বুকে উদ্যত লাল চক্ষু ;
শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক মৌন মন্ত্রে,
যদি ধরিত্রী একটুও হয় রক্তিম।"

মনের এই সংশয়াকুল অবস্থায় লেখা 'সুহৃদবরেষু' কবিতা। "কাব্যের প্রগতি রথ" সম্পর্কে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। তবু তখনো তিনি স্বীকার করেন, "মানুষ কাব্যের স্রষ্ঠা, কাব্য কবি করে না সৃজন।" 'সব সংশয়, সব জিজ্ঞাসার সার্থক উত্তর পাওয়া গেল 'জবাব' কবিতায় ঃ

শত্রুদল গোপনে আজ, হানো আঘাত
এসেছে দিন ; পতেঙ্গার রক্তপাত
আনে নি ক্রোধ, স্বার্থবোধ দুর্দিনে?
উষ্ণমন শাণিত হোক সংগীনে।

সুকান্ত জীবনের গভীর অভিজ্ঞতায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, উপলব্ধি করলেন মানুষকে ভালবাসলে, তাদের শোক দুঃখ ক্ষোভের কথা প্রকাশ করতে গেলেই রাজনীতি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম অনুভবের ফলে নিজের খোলসটাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হয়। তখনই যথার্থ উপলব্ধি হয় মানুষই কাব্যের সৃষ্টা, কাব্য কবি করে না সৃজন। এই চেতনায়

কবির পরিচিত গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা ভেঙে যায়, জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতায ব্যাপকতা লাভ করে। অনুভব গভীরতা লাভ করে। লক্ষ জনতা একই মুক্তি চিন্তায় সামিল হয়। সেই জনতাব অন্যতম নেতাকেও তখন মনে হয় একান্ত আপন। 'মার্শাল তিতোর প্রতি' কবিতায় আছে তারই সার্থক স্বীকৃতি। 'ব্যর্থতা' কবিতায় কবি নিজের অভিব্যক্তিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেন ঃ

অসি নাই থাক, হাতে তো আমার কাস্তে আছে,
চাষার ছেলের অসিকে কি ভালবাসতে আছে?
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে কাস্তে দৃপ্ত-কিরণ।

একটি সচেতন কৃষক-সন্তানও তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বৃহৎ মুক্তি যজ্ঞে সার্থক ভাবে যোগ দান করতে পারেন। চল্লিশের দশকে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সারা ভারত জুড়ে এবং কলকাতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে স্বাধীনতা আন্দোলনের আলটিমেটাম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তারই সার্থক প্রকাশ আছে সুকান্তের 'চরমপত্র' কবিতায়। এই কবিতাটি ১৯৪৬ এর পূর্বে লেখা বলে মনে হয় না। 'ধর্মতলাকে ভুলিনি আমরা' কিংবা "বোম্বাই থেকে শহীদ জীবন আনে সংহতি' ঘটনার উল্লেখ এখানে বিশেষ অর্থবহ।

কিন্তু সুকান্ত বেশদিন এই "চরমপত্র" লিখতে পারেননি। তাঁকে অচিরে আশ্রয় নিতে হলো হাসপাতালে। শরীর তাঁর ক্রমশ অসমর্থ হয়ে এলেও মন ছিল তাঁর সজীব। সেজন্য স্বাধীনতার জন্য গণ অভ্যুত্থানকে বিপথগামী কোরবার জন্য কলকাতার বুকে ছেচল্লিশে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক "রক্তের ঝড়' বয়ে গিয়েছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "দেবদারু গাছে রোদের ঝলক।" সক্রিয়ভাবে তার প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করতে না পারার জন্য একটা ক্ষোভের সুর প্রতিধ্বনিত। মানুষের দুঃখে, মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে সে কাব্য-সৃষ্টি অসার্থক।

দশম অধ্যায়
সুকান্ত প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চল্লিশেব দশকে কমিউনিস্ট পার্টি গণ-চেতনার উপর জোর দিয়েছিল। তারই পরিপূবকরূপে দেখা দিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। গড়ে উঠল নানা সাংস্কৃতিক সংস্থা। ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, গণ-নাট্য, কিশোর বাহিনী প্রভৃতি। এ সময়েই কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যোগ দিলেন দুই অসাধারণ প্রতিভা। সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়। সুকান্তের আত্মপ্রকাশ কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পূর্বেই বিখ্যাত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রূপে তিনি তখন সর্বজনস্বীকৃত। সেজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে আসা ছিল অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু। বিশেষ করে তিনি তখন 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাস লিখে বেশ চাঞ্চল্য এনে দিয়েছিলেন। মনে হয়েছে মানিক বুঝি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি কটাক্ষ করেই ঐ উপন্যাস লিখেছেন ; কিন্তু মানিকের নিজের নিকট তা কোন বিস্ময়ের বস্তু ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে মানিক প্রতিভা যেন নিজের পথ খুঁজে পেল। এর আগে তিনি পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ভাববাদ আর বস্তুবাদের সংঘাতে দুলছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর 'পুতুল নাচেব ইতিকথা' থেকেই যে শ্রেণী সচেতনার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন, 'সহরতলী' উপন্যাসে যা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে এসে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে তা দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হোল। নিজের ধারণাকে তত্ত্বেব সঙ্গে মিলিয়ে তিনি নতুন করে সাহিত্য সৃজনে এগিয়ে গেলেন। এই কাজে এক কিশোর কবিকেও তাঁর সঙ্গী দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে মানিক যেন নিজের অব্যক্ত ভাবের নতুন ভাষারূপ দেখতে পেয়েছিলেন।

সুকান্তের মৃত্যুর পর শারদীয়া বসুমতী, ১৩৫৪ পত্রিকায় 'প্রথম কবিতার কাহিনী' শীর্ষক কবিতায় মানিক লিখেছিলেন, কৈশোরে এবং যৌবনে তাঁর কবিতা লেখার অপূর্ণ ইচ্ছা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এই কিশোর কবির মধ্যে। মানিক যখন 'মধ্যাহ্নের নিষ্প্রভ' একার আকাশ ছেড়ে 'ক্ষুব্ধ-গাথা মন' নিয়ে মাটির পৃথিবীতে 'নতুন আশ্বাস' আর 'নব প্রতিশ্রুতি' সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন, খোঁজ করছিলেন তাঁর এই পৃথিবীতে তাঁর না-লেখা কবিতাগুলো কেউ লিখছেন কি না তখন তিনি সন্ধান পেলেন তাঁর পরমাত্মীয় কিশোর কবির। সে

ছন্দে সাজিয়ে সৃষ্টি করে বোবা প্রাণের ভাষা,
রূপ যে অবাধ্য অনায়ত্ত ঝড়কে, আবর্তকে।
আমার বিদ্রোহের চারাগুলি সবুজ হয়েছে ওর মনে,
আমার সাধ হয়েছে ওর সার্থকতা।

কিন্তু বেশিদিন তিনি এই কিশোর কবির সঙ্গ পাননি। চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল।

কারণ,

বড় রোগা ছিল আমার কবি,
তার ভাত ছিল কম, ক্ষয় অনেক,
জাত লড়ায়ে সৈনিক তো!
একদিন চিরতবে থেমে গেল তার চলা,
অসাড় হয়ে গেল বাড়ানো হাতখানি,
যুগের বসন্ত এলে সে গাইত জয়গান
তাকে জমিয়ে দিল ভাতের মালিকের ছড়িয়ে রাখা
উপোসী শীতের ফাঁদ,
ক্ষইয়ে দিল জিইয়ে রাখা রক্তপায়ী কীট।

সুকান্তর মৃত্যুর পর 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় মানিক লিখেছিলেন একটি অপূর্ব রচনা—''কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।'' তাতে তিনি সুকান্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন, ''সুকান্তের চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিলো, ব্যঞ্জনা ছিলো, কবিজনোচিত বলতে যা মনে আসে সে জলুস ছিলো না। নিভৃত নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত আরাম কৈশোরের লাবণ্য মসৃণ মোলায়েম করে তোলে নি; জীবনযুদ্ধে সৈনিকোচিত রুক্ষশ্রী এসে মিশেছিলো। লাজুক মুখচোরা বলে সে পরিচিত ছিলো, আমি তার ভেতরের হলকা মাঝে মাঝে অনুভব করতাম তার শান্ত স্বল্প কথায়, তার কবিতায়।'' রসহীন খাদ্যহীন কার্নিসের ধারে একটা ছোট চারাগাছের মতই সুকান্ত বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বেড়ে উঠেছিল। সে ''খর্বদেহ, নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত, উদ্ভাসিত কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।'' সে লিখেছে 'দুর্ভিক্ষের কবিতা', 'মিছিলের কোলাহল', আর নিয়ে এসেছে 'পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা'। তাতে লেখা আছে বিদ্রোহ আর বিপ্লবের বার্তা। তারই জন্য দাঁড়াতে হবে কেবল রেশনের লাইনে নয়, মুক্তির লাইনে। কিন্তু বেশিদিন সেই লাইনের কাব্য লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুকান্তের অসুস্থতার সংবাদে মানিক লিখেছিলেন আরেকটি কবিতা ঃ 'সুকান্ত ভট্টাচার্য''। স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুকান্তের অসুস্থতাকেও মানিক মনে করেছেন এক ষড়যন্ত্র ঃ

এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের
উষায় যারা আজ দুর্যোগ ঘটালো।

এই কবিকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। চাঁদা তুলে আর্থিক সমস্যার সমাধানের উপায় হয়েছিল। কারণ এই রক্তক্ষয়ী জনগণের দুর্বার সংগ্রামে এই সংগ্রামী কবিকে একান্ত প্রয়োজন। এই সংগ্রামের সাফল্যে কবি এনে দেবে জয়লাভের অদ্ভুত প্রেরণা, আগামী সোনালী দিনের উজ্জ্বল স্বপ্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেলিন ঃ

দুর্যোগের ঘন কালো মেঘ ছিঁড়ে ফেলে
আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।

বুলেটের রক্তিম সঞ্চয়ে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?

সুকান্তের মৃত্যুতে মানিকেবও আপশোষের শেষ নেই। তিনি লিখেছেন, "ছোট গল্পে ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তরুণ লেখককে প্রশংসা করেছি, উৎসাহ দিয়েছি ; সুকান্তকে কবিতার প্রশংসা শোনানোর সম্পর্কে সতর্ক ছিলাম। কাব্য সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি আমার জানা নেই, বিচার বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে খানিকটা হাওয়ার তারিফ শোনাতে ইচ্ছা হতো না। তাছাড়া, নিজে থেকে সে যে কঠিন সংগ্রাম গ্রহণ করেছিলো, যে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে বিকাশলাভ করছিল তার প্রতিভা, তাকে উৎসাহ দেবার প্রয়োজনও ছিল না কিছুমাত্র। ববং স্বীকার করি যে একটু আশঙ্কা আমার ছিলো তার সম্পর্কে , বয়স তার কম, বড় তাড়াতাড়ি তার খ্যাতি বাড়ছিল, এতে তার ক্ষতি না হয়। কে জানতো, তার লেখনীই এমন হঠাৎ চিরতরে থেমে যাবে।

আজ আপশোষ করছি, তার ক্ষতির মিথ্যা আশঙ্কায় প্রাণ খুলে তার প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাইনি, যক্ষ্মা হয়ে সে হাসপাতালে গেছে খবর পাওয়া পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস ঘোষণা করা স্থগিত রেখেছিলাম বলে যে, "বাঁচা গেলো, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।"

এই আপশোষের জন্যই হয়ত মানিক তার বহু রচনায় সুকান্তকে আদর্শ করে গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর 'ছন্দ পতন' উপন্যাস একজন কবির আত্মপ্রতীতির ইতিবৃত্ত। এ কবির বয়স পঁচিশ। "দু'খানা কবিতা সংকলনের নামকরা কবি। সে স্নায়ুপ্রবণ বা ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী কবি নয়, অতএব জীবন ও জগতটা তার কাছে নিছক স্বপ্নাদ্য ব্যাপার নয়। সে বস্তুবাদী কবি। তার কাছেই 'বস্তুই' সত্য, সত্যই বস্তু"। সে বলে, "আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষের জীবন দিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবন্ত জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব, চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।"

এই কবি ভালোবাসে মাটির জীবনকে। মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দেওয়ার জন্যই সে কবি। শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে এই কবির প্রতীতি গভীর। সে বলে ; "ভাত কাপড়ের চোরা কারবার যদি চলে, শিল্প সাহিত্য কখনো বাদ যায়? কবিতার জাত থাকে? এসবের মধ্যে গাঁটাছড়া বাঁধা, আপনারা ছেলেমানুষ যেমন হালকা তেমনি নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে চান সেই রসে মজে যান। কিছুদিন জাতীয় সঙ্গীত শোনালে আপনারা দেশের জন্য ক্ষেপে উঠেন। আবার কিছুদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কাঁদুনি শোনালে ভাবেন, না ঃ বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে আপনাদের এত সস্তা করে দেওয়া যেত?" ছন্দপতন উপন্যাসের কবিও পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। উপন্যাসের কবি সেই আক্রমণ থেকে বেঁচে উঠে নতুন প্রতীতি নিয়ে কবিতা লেখে। এই কবি যে সুকান্তর আদর্শে সৃষ্ট তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

১৩৬৮ সালেব শাবদীয়া স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'গ্রীষ্ম' কবিতার প্রেরণাব উৎসও সুকান্তেব 'প্রার্থী' কবিতা। এই কবিতায় সুকান্ত সূর্যের কাছে কামনা করেছেন উত্তাপ। সেই উত্তাপে আমাদের জড়তা পুড়ে যাবে এবং তার কাছ থেকে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পবিণত হব। সেজন্য কবি সূর্যের নিকট "অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।" কিন্তু মানিক কেবল সূর্যের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মধ্যে উত্তাপই দেখেননি, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সূর্যের মধ্যে এক প্রচণ্ড ঘৃণা। "দানবীব অহিংসারে দগ্ধ করে দিতে। জীবনের আলোয় উত্তাপে" তিনি চান আরও ঘৃণা ঃ

আমার ঘৃণার মত
তোমারও আদিম আলো তাপ
দিবানিশি মৃত্যু চায় জীবনের সমস্ত শত্রুর?
দাও তবে, আরও ঘৃণা দাও
আরো দগ্ধ কর
আরো আলো আরো তাপে জ্বালাও আমারে—
ঘৃণার কবিতা লিখি আমি।

"মাটির কাছে কিশোর কবি" উপন্যাসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস লেখার প্রেরণা হিসেবে সুকান্তর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই উপন্যাস সুকান্তকে অবলম্বন করে না হলেও পবোক্ষে সুকান্তই যে এ উপন্যাসের উৎস তা তিনি ভূমিকায় প্রকাশ করেছেন ঃ

"গোড়ায় তোমাদের বলে রাখাই ভালো যে এটা আমাদের নতুন যুগের কবি সুকান্তের জীবনীও নয়, তার জীবন কাহিনী ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসও নয়। এটা স্রেফ্ উপন্যাস-- চরিত্রই বলো আর কাহিনীই বলো সব আমার মগজের কারখানায় তৈরি। সুকান্ত অবশ্য এদেশে পুষে রাখা যক্ষ্মার অভিশাপে অল্প বয়সে প্রাণ দিয়েও কবি হিসাবে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। আমার উপন্যাসের কবিকে কাহিনীর শেষে কবি আর রক্ত মাংসের মানুষ দু'রকম হিসাবেই জীবন্ত দেখতে পাবে।

কিন্তু ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। সুকান্ত সম্ভব না হলেও মাটির কাছে আরও অনেক কিশোর কবি সম্ভব না হলে, তোমাদের জন্যে আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হত না। যতই রং চড়াই আর কল্পনার রসে রসাই, মাটির মানুষকে অন্ততঃ ভিত্তি হিসাবে অবলম্বন না করে আমি গল্প ফাঁদতেই পারি না, লিখব কি।"

বাংলা কবিতায় সুকান্তের অবদান সম্পর্কে মানিক যা লিখেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "সুকান্তের কবিতার সহজ সরলতা অনেককে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে, সেই সরলতার সমগ্র তাৎপর্য সকলের কাছে ধরা পড়েছিল কিনা জানি না।

জীবনে যেমন, কাব্য-সাহিত্যেও সরলতা বিশেষণটিতে রিক্ততার ইঙ্গিতটাই আমাদের কাছে বড় বেশি জোরালো। গভীরতা, ব্যাপ্তি তীব্রতা, ভাবৈশ্বর্য ইত্যাদি সবকিছুর ধারক ও বাহক হিসাবে সাদামাটা স্পষ্টভাষী সার্থক কবিতা কল্পনা করতে আমরা অপটু ছিলাম,

আমাদের অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতি গীতি কবিতা পর্যন্ত। সুকান্তর কবিতায় তাই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নবজন্মের সূচনা ছিলো।

রবীন্দ্রোত্তর বৈপ্লবিক ভাবধারাকে সমসাময়িক করে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি, নতুন চেতনা যাদের স্মৃতির প্রেরণা তাঁবাও খুঁজে পাননি আত্মপ্রকাশের পথ ও পদ্ধতি। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে পিছিয়ে পড়া কাব্য-সাহিত্যের মন্থরগতি মিলিয়ে দেখলে, আন্তরিক পরীক্ষা গবেষণাদির সীমার বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক কবিতার দৈন্য বিচার করলে আমরা এক শোচনীয় সিদ্ধান্তে আসি, কিশোর কবি সুকান্তের অকালমৃত্যু যার মর্মান্তিক বাস্তব পরিচয়। কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগকে প্রাণ দিতে আজ কবির যে অভিজ্ঞতা ও সাধনা দরকার তার পুবস্কার মৃত্যু, সুকান্ত এই ভয়ানক সত্য ও কাব্য সাহিত্যের চরম সাফল্যকে, আমাদের সমস্যাকে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে।

প্রতিভার অকালমৃত্যু বাংলায় বা জগতে এই প্রথম নয়, কিন্তু গত যুগেও কবির পক্ষে সমাজের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো একটা আপোষ করা সম্ভব ছিল যা তার কাব্য সাধনাকে ব্যাহত করতো না। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আজ কবির পক্ষে অপরিহার্য, তখন তা পরোক্ষ হলেও চলতো।

আজ সেটুকু আপোষের সুযোগও শেষ হয়ে গেছে কবির পক্ষে। কোনো জীবিকার জন্য প্রস্তুতি তার নিজেকে অপচয় করা, কোনো জীবিকা গ্রহণ তার কাব্য-সাধনার সুনিশ্চিত ব্যর্থতা।

শৈশব থেকেই কবির প্রতিভা আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন, চাষী মজুর বা ভদ্রঘরে যেখানেই তার আবির্ভাব হোক, মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা এমনি দেশে যে কোন মতে বেঁচে থাকার উপায়টুকু আয়ত্ত করতে গেলেও অন্তর্দৃষ্টিকে ঝাপসা হয়ে যেতে দিতে হবে। গদ্য সাহিত্যের সাধকও যে এ অভিশাপ থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়, কিন্তু কবির সঙ্গে তুলনায় সে অনেক ভাগ্যবান। গদ্য সাহিত্যের যেটুকু উর্বরতা দেখি, সাহিত্য-বিচারকের আসনে বসে এই নতুন প্রাণ সঞ্চারের মতো জটিল ও পরোক্ষ যে কারণই আবিষ্কার করি, মূল কারণ ওই। কাব্যসাহিত্যের অনুর্বরতাও এই জন্য যে কবিতা লেখার মজুরিতে কবি বাঁচে না। নতুন যুগের অলঙঘ্য নির্দেশে তাকে আজ দেহমনে চবিবশ ঘণ্টাব সাহচর্য বরণ করে নিতে হয়। তার উলঙ্গ ছেলেরা যে আজ বুলেট খেয়ে খেয়ে মরছে। কাব্যচর্চা আর জীবিকাচর্চার শোষণে সে ক্ষয় হয়ে যায়, নয়তো বাধ্য হয়, আপোষ করে নিজেকে গুটিয়ে এনে সীমাবদ্ধ জীবনের কল্পনা দিয়ে নতুন যুগের পরীক্ষামূলক কবিতা রচনা করতে। কতো সস্তায় মেলে কবির প্রাণ, যে প্রাণ কিনবার ক্ষমতাটুকুও কাব্যলক্ষ্মীর নেই।

সুকান্ত তা মানতে চায়নি ; আপোষ করেনি।

সে বুঝি টের পেয়েছিলো চলতি অবস্থা অব্যবস্থা উলটে দিতে কবিরও শহীদ হবার প্রয়োজন আছে।" (কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ)

এর থেকে বোঝা যায় যে মানিকবাবু সুকান্তকে কত ভালবাসতেন, তাঁর কবি প্রতিভাকে কত শ্রদ্ধা করতেন। সুকান্তের উপর মানিকবাবুর ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। সে জন্য তাঁর লেখায়, আলোচনায় যখন প্রসঙ্গ উঠেছে তখন তিনি সুকান্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বাংলা কাব্যে সুকান্তের অবদান এবং স্থান স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। মানিক নিজের এক ছেলের নামও রেখেছেন 'সুকান্ত'। সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীঅচ্যুত গোস্বামীব এক অভিযোগমূলক প্রবন্ধের তিনি যে আলোচনা কবেছেন সেখানেও তিনি সুকান্তের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। লেখক কে? এই প্রশ্নেব উত্তরে মানিকবাবু লিখেছেন ঃ

"পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচাব নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান। দেশের মানুষেব মন যোগাতে চেয়েছিলেন বলে কি আমাদেব কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এত ভালবাসে এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করাব ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।"

সুকান্তের কবি প্রতিভার এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারে?

পরিশিষ্ট

সুকান্তের গ্রন্থ পরিচিতি

সুকান্তের জীবিতকালে তাঁর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। সুকান্ত যখন যাদবপুর টি বি হাসপাতালে রোগশয্যায় তখনি তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছিল। সুকান্ত নিজেই তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশের পুরো পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন এবং নিজেই তার জন্য কবিতাগুলো বাছাই করেছিলেন। কিন্তু নামকরণটা তিনি করে যেতে পারেননি। তবু একটা নাম ঠিক করে বই ছাপানোর কাজ শুরু হোল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সুকান্তর মৃত্যুর পূর্বে ছাপার কাজ শেষ হোল না। হঠাৎ সুকান্তর মৃত্যু হওয়ায় আগের নাম বদলে গ্রন্থের প্রথম কবিতার নামানুসারে সুকান্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম হোল 'ছাড়পত্র'। 'বুকম্যান' প্রকাশনা সংস্থার তরফ থেকে চিন্মোহন সেহানবীশ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি, আষাঢ় ১৩৫৪। গ্রন্থটি শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্‌মদকে উৎসর্গ করা হয়। প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায়। বছর দেড়েকের ভিতরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ তারিখে। এই সংস্করণে 'দেশলাই কাঠি', 'সেপ্টেম্বর' '৪৬, এবং 'কাশ্মীর' সংযোজিত হয়। কাশ্মীর কবিতাটি প্রথমে ছিল পদ্যছন্দে লেখা— পদ্যছন্দে বক্তব্য জোরালো না হওয়ায় পরে কবি তা গদ্যছন্দে লেখেন। প্রথম সংস্করণে সুকান্ত পদ্যছন্দে লেখা কবিতাটি বাদ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সংস্করণ থেকে পদ্য এবং গদ্য দুটো কবিতাই মুদ্রিত হচ্ছে। পরে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তৃতীয় সংস্করণে 'কাশ্মীর' শীর্ষক ২নং কবিতাটির শেষের দিকে 'কাশ্মীর চঞ্চল — স্রোত লক্ষ' বদলিয়ে 'কাশ্মীর আজ চঞ্চল—স্রোত লক্ষ' এবং 'সেপ্টেম্বর '৪৬' কবিতার শেষের দিকে 'আজকের কলকাতার প্রার্থনা'র জায়গায় 'আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা' করা হয়েছে। তার কারণ, এই দুটি জায়গায় পড়তে গেলে আটকায়।'' সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণের প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩৭৩। এখন পর্যন্ত গ্রন্থটির পঁয়ত্রিশটি মুদ্রণ হয়েছে। এই গ্রন্থের মোট কবিতা ৩৮টি। প্রথম সংস্করণ থেকেই এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ

''ছাড়পত্রে'র কবিতাগুলি রচনার কালানুক্রমে সাজানো হয়নি। পরপর সাজানোর ব্যাপারে মোটামুটি ভাবসাম্য ও ছন্দোবৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তার ফলে প্রথম দিকে বহু নতুন ও শেষের দিকে বহু পুরনো কবিতাকে স্থান দিতে হয়েছে। 'চারাগাছ', 'প্রার্থী', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'সিঁড়ি', 'সিগারেট' প্রভৃতি কবিতা সুকান্তের রোগশয্যায় লেখা, 'ফসলের ডাক', 'কৃষকের গান', 'এই নবান্নে' 'আঠার বছর বয়স' প্রভৃতি কবিতা চার-পাঁচ বছর আগেকার লেখা,—সুকান্তর বয়স যখন পনেরো ষোল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'প্রস্তুত', 'দুরাশার মৃত্যু', সম্ভবত তারও আগের লেখা।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে'র রচনাকাল। একদিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্যদিকে জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম— জয়-পরাজয় আর উত্থান-পতনে, সুখ-দুঃখ আর আশা-নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে।

সুকান্ত নতুন যুগেব সার্থক কবি। সাধারণ মানুষেব সঙ্গে এমন একাত্মতা, সহজ কথা সোজাসুজি বলতে পারার এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা সুকান্তব সমসাময়িক আর কোন কবি দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও কবিত্ব শক্তিতে সুকান্ত ছিল অগ্রগণ্যদের একজন। ইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় দেশজোড়া এত বিরাট খ্যাতি বাংলার আর কোন কবির ভাগ্যেই বোধ হয় জোটেনি। এই বয়সেই বিদেশে সুকান্তর একাধিক কবিতার অনুবাদ হয়েছে, তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সুকান্তর কবিতা যাঁরা পড়বেন, তাঁবা এ কথা স্বীকার কববেন যে, সুকান্তর কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পবিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি। 'ছাড়পত্র' তাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে। কবিতাব বিচিত্র কলাকৌশলে, ছন্দের আশ্চর্য দক্ষতায়, শব্দ নির্বাচনের অশেষ নৈপুণ্যে এই কবি কিশোর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদেরও অভিভূত করেছে। কিন্তু আঙ্গিকের মায়ায় সুকান্ত কখনও বাঁধা পড়েনি। 'ছাড়পত্রে'র প্রথম যুগের কবিতার সঙ্গে পরের যুগেব কবিতা মিলিয়ে দেখলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'ঠিকানা' কিম্বা 'বোধনের' সঙ্গে 'প্রার্থীর তফাৎ অনেক। 'প্রার্থীতে এসে সুকান্ত সম্পূর্ণ একটা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। পদ্যছন্দ বর্জন করে সহজ নিরাভরণ গদ্যে সে যে আকুতি প্রকাশ করেছে, তা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। 'আর উত্তাপ দিও রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে' —করুণা বা অনুকম্পার কথা নয়, জ্বলন্ত বিশ্বাসের অগ্নিগর্ভ বাণী।

সুকান্তর প্রথম দিকের কবিতায় তার জীবণদর্শন একটু বেশি রকমের প্রকট মনে হ'তে পারে। হয়তো এতটা স্পষ্টবাদিতা অনেকের পছন্দ হবে না। যেখানে সমাজের শত্রুদের সে নাম ক'রে ক'রে চিনিয়ে দিয়েছে, যেখানে সে সংগ্রামের অগ্নিবর্ণ পথে পাঠকদের হাত ধ'রে ডেকেছে — সেখানে কবিতার সীমানা নিয়ে মতান্তব হতে পারে। কিন্তু সুকান্তর শেষের দিকে লেখা, যেমন, 'খবর', 'চিল', 'প্রার্থী' প্রভৃতি কোন কবিকেই মুগ্ধ না করে পারে না। শেষোক্ত কবিতাগুলি যে অনেক গভীর, অনেক বেশী মর্মস্পর্শী-- এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

ঘুম নেই সুকান্তর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। প্রচ্ছদ শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। শুরুতেই কবিতার খসড়ার হস্তলিপির ব্লক। ভূমিকা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল, চৈত্র, ১৩৫৮। এই সংস্করণে 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতাটি নতুন যুক্ত হয়েছে। ছন্দ বজায় রাখার জন্য কবিতাটির ৩৫ লাইনে 'জনতার পাশে পাশে পতাকা নিয়ে হাতে'র জায়গায় 'জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে' করা হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯) 'রৌদ্রের গান' ও 'দেওয়ালী' কবিতা দুটি সংযোজিত। সুকান্ত কবিতা দুটি বন্ধু ভূপেন ভট্টচার্যকে পত্রাকারে লেখেন। চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩৬১। এ পর্যন্ত ছাব্বিশটি মুদ্রণ হয়েছে (জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২)। এই গ্রন্থের মোট কবিতা আছে ৩৬টি। ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"ছাড়পত্রে'র পর সুকান্ত ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ঘুম নেই' প্রকাশিত হ'ল। 'ছাড়পত্রে'র কবিতা বাছাই করেছিল সুকান্ত নিজে; রোগশয্যায় শুয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেক ভাল কবিতাই তার ফলে 'ছাড়পত্র' থেকে বাদ পড়ে গেছে, তাছাড়া আগেকার লেখা বলে বহু ভাল কবিতাকে সুকান্ত ইচ্ছা ক'রেই 'ছাড়পত্রে' স্থান দেয়নি। বিশেষ ক'রে সেই সব নতুন ও পুরানো কবিতা নিয়েই 'ঘুম নেই'

প্রকাশ করা হল। 'পরিশিষ্ট', 'বৈশম্পায়ন', 'সব্যসাচী', ও 'পরিখা' ১৯৪০ সালে (সুকান্তর বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বছর) লেখা। 'প্রিয়তমাসু', 'জনরব', প্রভৃতি তার অনেক পরের রচনা।

কবিতাগুলি পরপব সাজানোর ব্যাপারে রচনার কালানুক্রম মানা হয়নি। তার কারণ, অধিকাংশ কবিতারই রচনাব তারিখ পাওয়া যায়নি। কাজেই মোটামুটি বিষয়ের মিল এবং ছন্দোবৈচিত্র্যের দিকে নজর রেখেই কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে।

রোগশয্যায় শুয়ে সুকান্ত যে সব কবিতা লিখেছিল, তার কিছু কিছু কবিতা 'ঘুম নেই'-এ না দিয়ে 'ছাড়পত্রে'র দ্বিতীয সংস্করণের জন্য রাখা হ'ল।

'ঘুম নেই' এবং 'ছাড়পত্রে'র মিল শুধু রচনাকালের দিক থেকেই নয়— কাব্যগুণের দিক থেকেও 'ঘুম নেই' ছাড়পত্রের সমকক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ঘুম নেই' সুকান্তর কাব্যের একটা নতুন দিক উম্মোচিত করবে। সুকান্ত দেশের মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছিল ঃ

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
কী হবে আর কুকুরের মত বেঁচে থাকায়?
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাতে?
... ...
তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।" (পয়লা মে-র কবিতা)

সুকান্তর সেই ডাক আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাগিয়ে তুলেছে। অগ্নিকোণের সমস্ত তল্লাট জুড়ে শৃঙ্খলিত মানুষ আজ উঠে দাঁড়িয়েছে।

"দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ। (বিদ্রোহের গান)

সুকান্তর ভবিষ্যদ্বাণী আজ পরিণত হচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর বুকে জনসাধারণের কবি সুকান্ত যে সুদিনের স্বপ্ন দেখেছিল, আজ তা সফল হতে চলেছে। সুকান্ত আজ নেই ; কিন্তু সে তার কবিতা রেখে গেছে— সেই কবিতা মুখে নিয়ে দেশের অত্যাচারিত মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের সংগ্রামে প্রাণ দেবে।"

পূর্বাভাস সুকান্তের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। প্রচ্ছদশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভূমিকা লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ। দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র, ১৩৫৮। তৃতীয় সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৬১, চতুর্থ সংস্করণ— বৈশাখ, ১৩৬৬ ; পঞ্চম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৬৯। 'মৃত পৃথিবী' ৪র্থ সংস্করণে এবং 'দুর্মর কবিতাটি পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত হয়। এ পর্যন্ত উনিশটি মুদ্রণ হয়েছে (আষাঢ়, ১৩৯৬) এই গ্রন্থে মোট কবিতা আছে ২৯টি। বিমলচন্দ্র ঘোষ ভূমিকায় লিখেছেন (২৭-৩-৫২) ঃ

'পূর্বাভাসে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি প্রকাশের জরুরি তাগিদে অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে লিখেছিলুম বলে কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। 'পূর্বাভাসে'র কবিতাগুলি এ যুগের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম কবি সুকান্তর ছেলে বয়সের রচনা। একজন বারো তের বছরের

ছেলের হাত দিয়ে এই মুক্তার মত স্বচ্ছ লাবণ্যময় কবিতাগুলি যে কেমন করে বেরুলো এ কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অকাল বিয়োগে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই যশস্বী কবি বালক বয়সেই জ্ঞানবৃদ্ধ, তা না হলে এই অতি অল্প বয়সের রচনাগুলির মধ্যে এমন বিস্ময়কর ছন্দোনৈপুণ্য, ভাষামাধুর্য ও বিষয়বস্তুর গভীরতা কেমন করে সম্ভব হ'ল? আধা ঔপনিবেশিক দাসত্ব জর্জর ভারত-মৃত্তিকায় নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও সুকান্তর জন্ম-বিপ্লবী কবিচিত্রটি নির্ধূম অগ্নিশিখার মত উর্ধ্বমুখীন ও সদাভাস্বর ছিল। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠ দেশপ্রেম, চারিত্রিক সংযম ও নিঃশব্দ নিষ্কাম সাধকের মত অতুলনীয় অধ্যবসায় সুকান্তর মধ্যে যেমনটি দেখিছি, এ যুগের আর কোনো সমসাময়িক কবির মধ্যে তা বিরল।

সুকান্তর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', ও 'মিঠে-কড়া'র কবিতাগুলির তুলনায় 'পূর্বাভাসে'র কবিতাগুলি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অপরিণত মনে হলেও কাব্যরসিক পাঠক একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশের রক্তিমাভার মত পরিণত সুকান্তর পূর্বাভাস এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। সুকান্তর স্বল্পায়ু কবিজীবনকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়; বালক সুকান্ত ও কিশোর সুকান্ত। পূর্বাভাসের বালক কবি ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত নয় সুতরাং অনভিজ্ঞতার ছাপ অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপেই কয়েকটি কবিতার মধ্যে বিদ্যমান। অথচ এই মুক্তিপিপাসু অনুসন্ধিৎসু বালক কবির বাঙ্‌ময় চিত্ত-চাঞ্চল্যের মধ্যে কোথাও আন্তরিকতার অভাব আমার নজরে নজরে পড়েনি। কোনো কোনো কবিতার মধ্যে যে লক্ষ্যহীনতা, নৈরাশ্য ও মৃত্যুচিন্তার পরিচয় আমরা পাই সেগুলি আমাদের এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের লাঞ্ছিত জীবন-যন্ত্রণার অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রকাশ। মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে প্রত্যেক ধনবাদী দেশের কবিদের মধ্যেই বালক সুকান্তকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবু যখন এই অধঃপতিত দেশের একজন কবির মুখে শুনি ঃ

ঘরে তোলো ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারি গান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ কর শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত।"

তখন মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে এই বীজের মধ্যে মহীরুহের বিপুল সম্ভাবনা সত্য সত্যই লুক্কায়িত ছিল। আবার যখন শুনি ঃ

"কঠিন, কঠোর, বিন্ধ্যাচল
অনেক ধৈর্যে আজো অটল
ভাঙো বিঘ্নকে ঃ করো শিকল
পদাহত।"

তখন ক্রূর নিষ্ঠুর ব্যাধি-দানবের আক্রমণে অকাল নিহত কবি প্রতিভাকে আমরা নমস্কার জানাই।"

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ পূর্বাভাসের কবিতাগুলোকে সুকান্তের বাব তের বয়সের রচনা বলে যে অভিহিত করেছেন তা ঠিক নয়। এই কাব্যগ্রন্থে বারো তের বছর বয়সের রচনা আছে

অল্পই। অধিকাংশই তার পরের লেখা। দুর্মর, হদিশ, ঘুম ভাঙার গান, পরাভব, অসহ্য দিন প্রভৃতি কবিতাকে ছেলে বয়সের রচনা বলে মনে হয় না। কবিতাগুলোর সঠিক রচনাকাল যখন নেই তখন সেগুলোর বিষয়বস্তু বিচার করেই রচনাকাল অনুমান করে নিতে হয়।

মিঠেকড়া (ছড়ার বই) নামটি সুকান্তর নিজের দেওয়া। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩৫৮। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় চিত্রিত কুড়িটি ছবি ও প্রচ্ছদ। দ্বাদশ মুদ্রণ ১৪০০। মোট ১৫টি ছড়া আছে এই গ্রন্থে। ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বড়োরা অবাক হয় সুকান্তর কবিতা পড়ে। এবার সুকান্তর ছড়া পড়ে অবাক হবে ছোটরা। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া নয়, একেবারে একালের টাটকা হাতে গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে রাগে, চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল টকটকে সূর্য-ওঠা দিনের কথা ভেবে। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কেউ লেখেনি।

কলকাতার রাস্তায় বিষম এক খেলা। বন্দুকের সঙ্গে শুধু হাতের লড়াই। আশ্চর্য! এমন এক সাংঘাতিক কাণ্ড-- তার মধ্যেও মজা পেয়েছে সুকান্ত। গোটা বইতে এমনি সব মিঠে রসে ভেজানো কড়া পাকের ছড়া। সুকান্তই নিজে তাই তাব বইয়ের নাম দিয়েছিলো 'মিঠেকড়া'।

'পৃথিবীর দিকে তাকাও'—এই ছড়াটি একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুসরণে লেখা। বত্রিশ পৃষ্ঠার ছবিটি (ভাল খাবার) একটি বিদেশী ছবির অবলম্বনে আঁকা। 'মিঠেকড়া'র ছবিগুলি এঁকেছেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সুকান্ত এই ছড়াগুলো লেখার পর ছবি আঁকার জন্যে তাঁরই হাতে প্রথম দেয় এবং এ বইয়ের পরিকল্পনা দুজনে মিলে করে।' দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে আশ্বিন, ১৩৬২, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮, আষাঢ়, ১৩৭১, তাবিখে। 'ভাল খাবার' ছড়াটি 'সুকান্ত সমগ্র'তে নতুন সংযোজিত হয়েছে।

অভিযান সুকান্তর দুটি নাটিকা। প্রথমটি 'অভিযান' ১৩৫০ সালে ও দ্বিতীয়টি 'সূর্য প্রণাম' ১৩৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রচিত। বইয়ের শেষে সচিত্র মঞ্চ নির্দেশনা আছে। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০। ভূমিকা— সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ, ছবি এবং মঞ্চ নির্দেশক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ— শ্রাবণ ১৩৬৫, তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৭১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ১৩৯৪। ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অভিযান ' ও 'সূর্য-প্রণাম' খুবই কম বয়সের রচনা। সমসাময়িক কাল সম্পর্কে গভীর চেতনা, ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মমতাবোধ- - এই কাব্যগ্রন্থে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।''

হরতাল গল্পের বই। এতে আছে (১) হরতাল (২) লেজের কাহিনী (৩) ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা (৪) দেবতাদের ভয় (খুব ছোট ব্যঙ্গার্থক নাটিকা)। (৫) রাখাল ছেলে। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৬৯। প্রচ্ছদ ও ছবি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, '' 'হরতাল' কথার অর্থ বিক্ষোভ প্রকাশার্থ দোকান, কাজকর্ম প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ করা— সহজ কথা ধর্মঘট। আমাদের সর্বজনপ্রিয় কবি ও নবজীবনের নব দেশাত্মবোধের উদ্বোধক কবি ও গদ্যকার সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁহার 'হরতাল' শব্দের মধ্যে ধ্বনি তুলিয়াছেন, ...বিশালবপু ইঞ্জিন হইলেন সভাপতি— মানুষেরা হরতাল করে অতএব রেলের যন্ত্রপাতি মিলিত হইল, মায় ইস্টিশনের সিগনাল পর্যন্ত। এদিকে কতকগুলি ইস্টিশনের ঘড়ি আর বাঁশী কর্মকর্তাদের দালাল হইয়া সব মাটি করিয়া দিল।

মাছির কাহিনী অতি সুন্দর একটি লোভের কাহিনী--মাছি বড় হইল না। ব্যর্থ হইল তাহার

আকাঙ্ক্ষা শেষে বুঝিতে পাবিল এই নিগূঢ় সত্য যে মানুষকে কষ্ট দিতে নাই। এইভাবে ছোট কয়টি গল্পে হরতালেব প্রকৃত মর্ম নিহিতভাবকে নিগূঢ় সত্যকে লেখক প্রকাশ কবিযাছেন। লেজের কাহিনী অভিনব সুন্দব। ষাঁড় গাধা-ছাগলের স্বাধীনতা চেষ্টায় ষাঁড গাধাব মুক্তি হইল না। ছাগলটা কখনই ফিবিয়া আসিল না। কাবণ অনেক মহাপুরুষের মত ছাগলটাবও একটু দাড়ি ছিল। উপদেশ হইল নিজের কাজের মীমাংসা করিতে অপরেব কাছে কখনো যাইতে নাই। আর রাখাল ছেলে? সে একটি স্নেহ-সঞ্চারিণী পেলবকোমল কবিতা।

ছোটগল্প, সুন্দব, সরল সাবলীল ভাষা। ছবি চমৎকার। যেমন ছবি, তেমন গল্প, পড়িতে পড়িতে ছবিও পডাব সঙ্গে কথা বলে, এমনি সুন্দর। বিদেশী গল্পেব ছাযাও এমনিভাবে রূপায়িত ও বস পরিবেশে সুশোভিত যে এই অপূর্ব শক্তিশালী লেখকের বচনাশৈলী সকলেব চিত্ত মুগ্ধ কবে,-- উদ্বোধিত কবে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও বাঁধাই সকলের চিত্ত মুগ্ধ কবিবে।"

গীতিগুচ্ছ--গানেব বই। প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭২। প্রচ্ছদ শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। গীতিগুচ্ছেব দুটো ভাগ-- গীতিগুচ্ছ এবং পরিশিষ্ট। এই গ্রন্থে ১৯টি গান আছে। ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায লিখেছেন, "গীতিগুচ্ছে'র গান সুকান্ত লিখেছিল তাব গায়ক মামা এবং বন্ধু বিমল ভট্টাচার্যের তাড়নায়। .শেষ গানটির নীচে একটি তাবিখ দেওযা আছে ৮ই ভাদ্র, '৪৯। এ থেকে বচনাকাল অনুমান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ঠের ১-৩নং গান হরতালের 'রাখাল ছেলে' থেকে ৪ ও ৫নং গান অভিযান থেকে, ৬-১২নং গান অভিযানে প্রকাশিত 'সূর্য প্রণাম' থেকে এবং ১৪নং গান 'ঘুম নেই' থেকে সংকলিত।" সেজন্য সুকান্ত সমগ্র গ্রন্থে পরিশিষ্টের গানগুলো পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়নি। পরিশিষ্টের গানগুলো ছিল (১) ও ভাই রাখাল ছেলে, (২) তোমার বাঁশির সুব যেন গো, (৩) বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু (৪) ক্ষুধিতের সেবার সব ভার, (৫) শোনো, শোনো ও বিদেশের ভাই, (৬) পূব সাগবের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে, (৭) ওগো তুমি কবি আপন ভোলা, (৮) আমাদের ডাক এসেছে, (৯) দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে, (১০) ও কে যায় চলে কথা না বলে, দিও না যেতে, (১১) ঝুলন-পূর্ণিমাতে, (১২) নমো রবি, সূর্য দেবতা, (১৩) জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ (১৪) বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?

সুকান্ত সমগ্র-- প্রথম প্রকাশ ৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৪। প্রচ্ছদ--দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা--সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাতাশ মুদ্রণ আশ্বিন, ১৪০৩। এক সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথমে তা ছিল বারো পৃষ্ঠা। বর্তমানে মুদ্রণকৌশলে তা হয়েছে নয় পৃষ্ঠা। তাতে তিনি সুকান্তের জীবন ও কাব্যের একটা সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই ভূমিকা নিয়ে পরে কিছু বিতর্ক উঠেছে। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ

"মাত্র একুশ বছর সুকান্ত পৃথিবীতে বেঁচে ছিল। আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সুকান্তকে আশ্চর্য প্রতিভা বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক বিকশিত হওয়ার মুখেই সেই আশ্চর্য প্রতিভাকে আমরা হারিয়েছি।"

"বেঁচে থাকলে সুকান্তর কিছু লেখা যে 'সুকান্ত সমগ্র'তে স্থান পেত না, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে আমি ছিলাম সুকান্তর অগ্রজ ; তার কবিমনের অনেক কথাই আমার জানা ছিল। তার কবিতা যখন নতুন মোড় নিচ্ছিল, তখনই দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাকে হারিয়েছি। সুকান্তর যে সব কবিতা পড়ে আমরা চমকাই, সুকান্তর পক্ষে সে সবই আরম্ভ মাত্র।"

"জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায় খেত-খামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।"

"কিশোর বাহিনীর আন্দোলনে সুকান্তকে টেনে এনেছিল তখনকার ছাত্র নেতা এবং আমাদের বন্ধু অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। রাজনীতিতে শুকনো ভাব তখন অনেকখানি কেটে গিয়ে নাচগান নাটক আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বেশ একটা রসকষ এসেছে। কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয়নি। সুকান্তর সাহিত্যিক গুণগুলোকে আন্দোলনের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অন্নদারও যথেষ্ট হাতযশ ছিল। সুকান্তর আগের যুগের লোক বলে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে ; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।"

"অসুখে পড়বার অল্প কিছুদিন আগে একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারেব এক মিটিঙে যাবার পথে আমার এক সংশয়ের জবাবে সুকান্ত বলেছিল ঃ আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি— কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।

সেদিন তর্কে আমি ওকে হারাতে চেষ্টা করেছিলাম। আজ আমাকে মানতেই হবে, একদিক থেকে তার কথাটা মিথ্যে নয়। গত কুড়ি বছর ধরে সুকান্তর বই বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে। ...তার পাঠককুল ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখেনি। যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল। এ কথাও ঠিক নয়, কাউকে খুশি করার জন্যে সুকান্ত লিখেছিল। তাগিদটা বাইরে থেকে আসেনি, এসেছিল তার নিজের ভেতর থেকে। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আসলে নিজেকেই সে কবিতায় ঢেলে দিয়েছিল।

কী ভাবে বলেছিল সেটাও দেখতে হবে। সুকান্তর আগে আর কেউ ওভাবে বলেনি বলেই পাঠকেরা কান খাড়া করে তার কথা শুনেছেন। বলবার উদ্দেশ্যটা যাঁদের মনের মত ছিল না, বলবার গুণে তাঁরাও না শুনে পারেন নি।"

"সুকান্তর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের তোলাতুলি বা কোলাকুলির সম্পর্ক ছিল না— এটা না বোঝার জন্যেই একজন কবির মধ্যে এক সময় রাজনীতি থেকে আশাভঙ্গজনিত পালাও-পালাও রব উঠেছিল। যে যার নিজের মধ্যে তারা পালিয়ে গেলেন। তাতেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের মুশকিলের আসান হয়নি।

ভুল হয়েছিল বুঝতে। সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে উড়েনি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও সুকান্তকে দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা।"

"সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান নিশ্চয়ই ছিল। কবিতার জাত যাবার ভয়ে শ্লোগানগুলোকে রেখে ঢেকেও সে ব্যবহার করেনি। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত যে ভাষা হাজার হাজার মানুষের মনে আবেগের তরঙ্গ তুলেছে, তাকে কবিতায় সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই সুকান্ত সার্থক কবি।"

এই ভূমিকা সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'সুকান্ত সমগ্র' গ্রন্থের প্রকাশকালে—৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৪। তারপর প্রায় প্রতি বছরে এই গ্রন্থের সংস্করণ হয়েছে। বহু পাঠক গবেষকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশক লিখেছেন ঃ

"সুকান্ত-সমগ্রর ষষ্ঠ সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০) গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে। 'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য', 'ভদ্রলোক', 'দরদী কিশোর', ও 'কিশোরের স্বপ্ন'—এই পাঁচটি গল্প এবং 'ছন্দ ও আবৃত্তি' প্রবন্ধটি এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়া সংযুক্ত হয়েছে 'ব্যর্থতা' ও 'দেবদারু গাছে রোদের ঝলক' কবিতা দুটি এবং একাধিক চিঠি। পত্রগুচ্ছ ও অপ্রচলিত রচনাসমূহ রচনার কালক্রম অনুসারে সাজানো হল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও পাওয়া গেছে সে সবই সুকান্ত-সমগ্রর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।"

অনুবাদ ঃ সুকান্তর জীবিতকালেই তাঁর কবিতা ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক যুব সঙেঘর মুখপত্রে তাঁর অনেক কবিতার অনুবাদ হয়েছিল।

১৯৫১ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রযোজনী (PROBUZENI) নামে বাংলা প্রগতিশীল কবিতার একটি চেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সুকান্তর 'বোধন' কবিতার নামেই গ্রন্থটির নামকরণ হয়। প্রযোজনীর বাংলা অর্থ বোধন।

১৯৫৩ সালে সুকান্তর নিজস্ব কবিতার একটি চেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়—ক্ষুধা ও বিদ্রোহের গান (Piscve Nladu A Revolnoc)।

অধ্যাপক শিশির চট্টোপাধ্যায় আগস্ট, ১৯৫৪ 21 Poems by Sukanta Bhattacharya নামে একটি নিজস্ব অনুবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোষণা আছে — "For private circulation only." দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "This book is not for sale ; requests for copies may be made to the Translator" লেখা ছিল। ভূমিকায় অনুবাদক বলেছেন, "He belonged to this earth. He was intimately connected with the soil".

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ আকাল— প্রথম প্রকাশ ১৩৫১। সম্পাদক সুকান্ত ভট্টাচার্য। এই গ্রন্থের সংকলিত সব কবিতাই পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষে ১৩৫০ সালে রচিত। এই গ্রন্থে সংগৃহীত কবিতাগুলো হোল—জঠর—অরুণ মিত্র ; চালের কাতারে—বিষ্ণু দে ; রবীন্দ্রনাথের প্রতি—সুকান্ত ভট্টাচার্য ; শ্রাবণ— বুদ্ধদেব বসু ; ১৩৫০— বিমলচন্দ্র ঘোষ ; ফ্যান— প্রেমেন্দ্র মিত্র ; নরক—নবেন্দু রায় ; অনুভব—মনীন্দ্র রায় ; লাল—ফারুখ আহ্মদ ; আমাদের গান—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ; মন্বন্তর—দিনেশ দাস ; স্বাগত— সুভাষ মুখোপাধ্যায় ; অন্নদাতা— অমিয় চক্রবর্তী ; অভিশাপ—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ; গৃহস্থ বিলাপ— সমর সেন ; কাহিনী—অবন্তী সান্যাল ; দ্বৈরথ—গোলাম কুদ্দুস এবং মেঘমুক্ত— কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত।

এই সংকলনের 'কথামুখ' শিরোনামে সুকান্ত লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব অনাহার পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র? তাদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত? এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি? এই জাতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে চেয়েছে এই সংকলন।

সাহিত্য যে সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া, জীবনেরই প্রতিভূ তেরোশো পঞ্চাশ সালে প্রগতিশীল

লেখকবা অংশত এই কথাই প্রমাণ করেছেন তাঁদের গল্পে উপন্যাসে কবিতায়। ইতিপূর্বে দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কবিতা এখনো কোন সংকলয়িতাব দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অবশ্য এমন কবিও আমাদেব দেশে আছেন, যাঁরা কবিতাকে দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় কণ্টকিত হতে দেখলে শিউরে ওঠেন। তাঁরা নিজেদেব না পারুন, কবিতাকে দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

'তেরোশো পঞ্চাশ' সম্বন্ধে কোন বাঙালীকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কি হতে পারে? কেন না তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসেব একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হ'য়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘর ভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মতো স্বদেশবৎসলের মতো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে ব'সে গাইলেন সূর্যোদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়। তাঁদেরই কয়েকজনের কবিতার সংগ্রহ নিয়ে এই সংকলন।

তেরোশো একান্ন সালে সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের স্বজনবিয়োগের ক্ষোভ, অক্ষমতার জ্বালাকে কত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারছি, এতো বড়ো লোকসানকে স্বীকার করতে পারছি কত সহজে। এক বছব পূর্ণ হবার বহু আগেই ভাবতে শুরু করেছি ; "এই তো সেদিন তবু সে কাহিনী হ'য়ে গেছে একান্ত প্রাচীন।" অথচ বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় গত বছরের ক্ষত এখনো শুকোয়নি। এই সংকলন যদি গত বছরের দুঃসহ স্মৃতিকে এবং বর্তমানের অনুত্তীর্ণ সংকটকে আমাদের মনে জাগিয়ে রাখার কাজে এতটুকু সহায়তা করতে পারে, তা হ'লে সংকলনের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হবে।"

একসূত্রে— ৫৫ জন কবির কবিতা সংকলন। সম্পাদনা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং গোলাম কুদ্দুস। প্রকাশক—ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৯৪২। মূল্য — এক টাকা। এর মধ্যে আছে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের কবিতা। এতে আছে সুকান্তের 'মধ্যবিত্ত ৪২'।

জনযুদ্ধের গান – প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৪২। প্রথম সংস্করণে সুকান্তের গান ছিল না। ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর '৪২। এই সংস্করণে সুকান্তের কবিতা 'জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ/ শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ' নামে জনযুদ্ধের গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ৩য় সংস্করণ মে, ১৯৪৩। প্রকাশক সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্যতম সম্পাদক, ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। অপর সম্পাদক ছিলেন বিষ্ণু দে।

ঘুম তাড়ানি ছড়া- সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। ছবি—সূর্য রায়। প্রকাশক- ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস। তিন টাকা। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯৪৭।

এই সংকলনে সুকান্তর পাঁচটি কবিতা ছিল। এদের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এই কবিতাগুলি পরে সুকান্তের 'মিঠেকড়া' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।